

বারি-বাহিনী

উপন্যাস



স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ও

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত

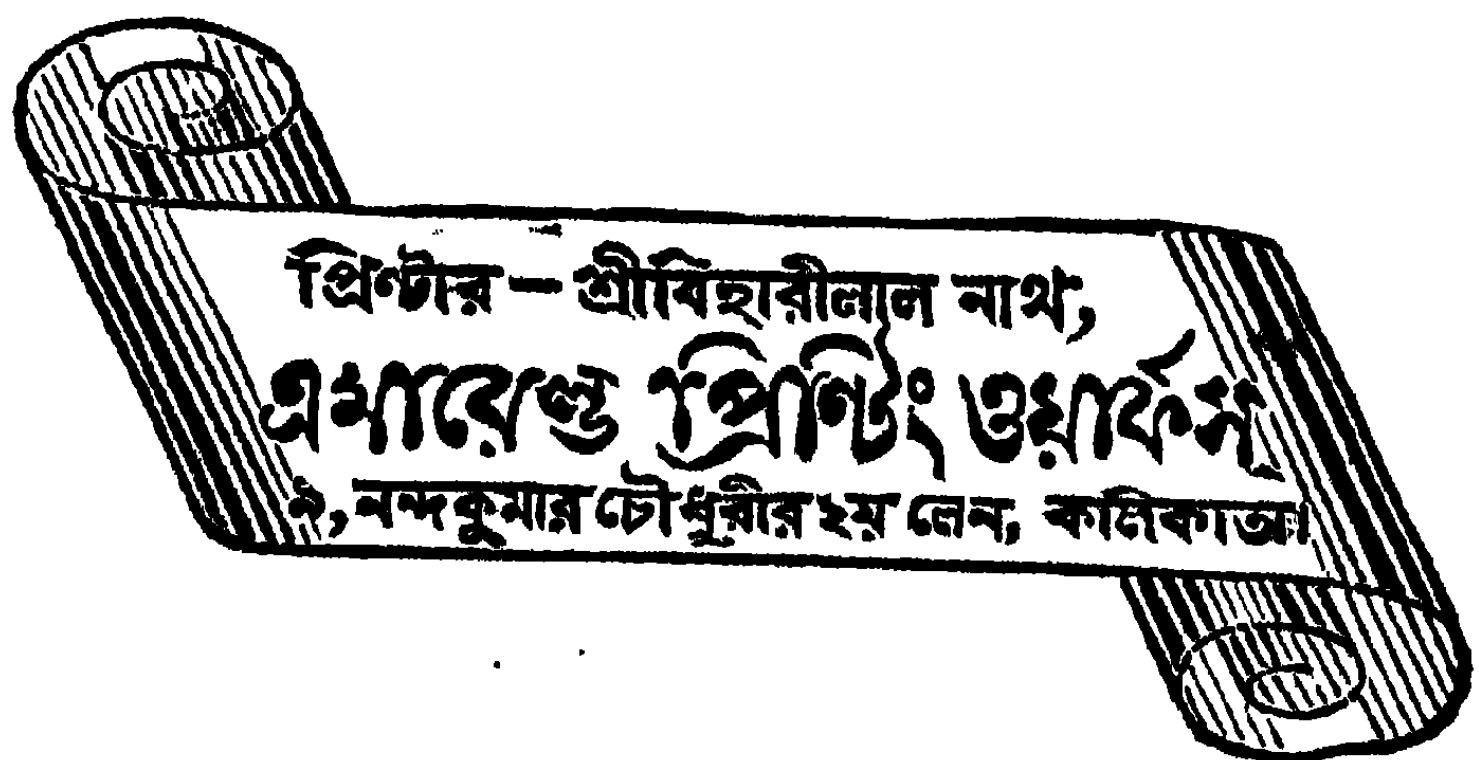
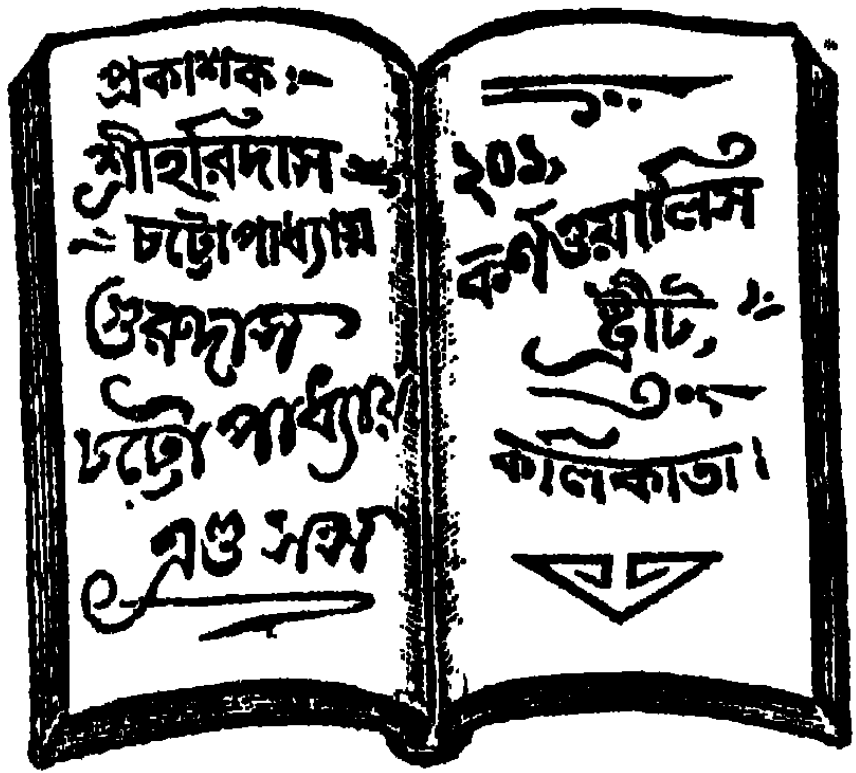


কলিকাতা,

বঙ্গাব্দ ১৩২৫, কাঙ্ক্ষন।



মূল্য দেড় টাকা।



উৎসর্গ

পরমারাধ্যা খুল্লতাত-পত্নী

শ্রীচরণকমলেষু

খুড়ী-মা,

যে অংশ কাকার লিখিত, সে অংশ তোমার কণ্ঠে চিরফুল পুষ্প-মাল্যরূপে বিরাজ করুক ; আর যে অংশ আমার লিখিত, সে অংশ তোমার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলিরূপে সার্থক হউক ।

মা, স্বামীর শেষ সম্পদ, পুত্রের হৃদয়ের পূজা গ্রহণ কর ।

প্রণত সেবক

শচীশ ।

ভূমিকা

পরমারাধ্য বঙ্কিমচন্দ্র যুত্ব্যর অনতিপূর্বে—১৩০০
বঙ্গাব্দে—এই আখ্যায়িকা লিখিতে আরম্ভ করেন ;
কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই । তাঁহার পুত্র
ও শিষ্য আজ তাহা ছাব্বিশ বৎসর পরে শেষ করিল ।

আমার এই ধৃষ্টতা অনেকের বিবেচনায় অমার্জনীয়
হইতে পারে ; কিন্তু আমি এ প্রলোভন সংবরণ করিতে
পারিলাম না । তা' ছাড়া আর একটা কথা আছে ;
যাঁহার নিকট আমি সকল বিষয়ে ঋণী, তাঁহার চরণে এ
ভাবে পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না ।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সাধারণ ভাষা পরিত্যাগ পূর্বক
এক অভিনব ভাষায় এই পুস্তকখানির রচনায় প্রবৃত্ত
হইয়াছিলেন । আমিও সাধ্যমত সেই ভাষার অনুসরণ
করিয়াছি ; তবে কৃতকার্য হইতে পারি নাই ।

বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির এক পৃষ্ঠা যথাযথ
প্রতিলিপি করিয়া সন্নিবিষ্ট করিলাম । কালপ্রভাবে
কাগজখানি ভগ্ন ও মসী মলিন হইয়া গিয়াছে । ইতি—

শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বারিবাহিনী ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।



মধুমতী নদীতীরে রাধাগঞ্জ নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে । প্রভূত ধনসম্পন্ন ভূস্বামীদিগের বসতি-স্থান বলিয়া এই গ্রাম গণগ্রামস্বরূপ গণ্য হইয়া থাকে । একদা চৈত্রের অপরাহ্নে দিনমণির তীক্ষ্ণ কিরণমালা স্নান হইয়া আসিলে হুঃসহ নৈদাঘ উত্তাপ ক্রমে শীতল হইতেছিল ; মন্দ সমীরণ বাহিত হইতে লাগিল ; তাহার মূহু হিল্লোল ক্ষেত্রমধ্যে কৃষকের ঘর্ম্মাক্ত ললাটে শ্বেদবিন্দু বিস্তৃত করিতে লাগিল, এবং সন্তুষযোথিতা গ্রাম্য রমণীদিগের শ্বেদবিজড়িত অলকপাশ বিধৃত করিতে লাগিল ।

ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কা একটি রমণী একটি সামান্য পর্ণকুটীর অভ্যন্তরে মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সমাপনান্তে গাত্রোত্থান করিয়া বেশভূষায় ব্যাপৃতা হইলেন । স্ত্রীজাতির এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদনে রমণীর কালবিলম্ব হইল না ; একটু জল, একখানি টিনেমোড়া চারি আঙ্গুল বিস্তার দর্পণ, সেইরূপ দীর্ঘকায় একখানি চিরুণির দ্বারা এ ব্যাপার সুসম্পন্ন হইল । এতদ্ব্যতিরেকে কিছু সিন্দূরের গুঁড়ায় ললাট বিশোভিত হইল । পরিশেষে

একটা তাবুলের রাগে অধর রঞ্জিত হইল। এইরূপে জগদ্বিজয়িনী রমণী জাতির একজন মহারথী সশস্ত্র হইয়া কলসীকক্ষে যাত্রা করিলেন, এবং কোনও প্রতিবাসীর বংশরচিত দ্বার সবলে উদ্বাটিত করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্টা হইলেন।

যে গৃহমধ্যে ইনি প্রবেশ করিলেন, তাহার মধ্যে চারিখানি চালা ঘর—মাটির পোতা—ঝাঁপের বেড়া। কুটারমধ্যে কোথাও দারিদ্র্যলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল না—সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চতুষ্কোণ উঠানের চারিদিকে চারিখানি ঘর। তিনখানির দ্বার উঠানের দিকে—একখানির দ্বার বাহিরের দিকে। এই ঘরখানি বৈঠকখানা—অপর তিনখানি চতুষ্পার্শ্বে আবরণ বিশিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সদর বাটীর মণ্ডপ সম্মুখে সুকর্ষিত ভূমিখণ্ডে কিছু বার্তাকু শাকাদি জন্মিয়াছিল। চারিপার্শ্বে নলের বেড়া; দ্বারে ঝাঁপের আগড়; সুতরাং অবলা অনায়াসে গৃহে প্রবেশ করিল।

বলা বাহুল্য যে, লক্ষপ্রবেশা প্রথমেই অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন। পুরবাসী বা পুরবাসিনীবর্গ মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা সমাপনান্তে স্ব স্ব কার্য্যে কে কোথায় গিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কেবলমাত্র তথায় দুই ব্যক্তি ছিল; একটা অষ্টাদশবর্ষীয়া তরুণী বস্ত্রোপরে কারুকার্য্যে ব্যাপ্তা ছিলেন, আর একটা চারি বৎসরের শিশু খেলার মগ্নচিত্ত ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পাঠশালার যাইবার সময় জানিয়া শুনিয়া মস্তাধার ভুলিয়া গিয়াছিল। শিশু সেই মসৌপাত্র দেখিতে পাইয়া অপর্য্যাপ্ত আনন্দ সহকারে সেই কালি মুখে মাখিতেছিল; পাছে দাদা আসিয়া দোয়াত কাড়িয়া লয়, বাছা যেন এই ভয়ে সকল কালিটুকু একেবারে মাখিয়া ফেলিতেছিল। অভ্যাগতা, কারুকার্য্যকারিণীর নিকট ধরাসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি করিতেছিম্ লো?”

সম্বোধিতা রমণী হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আজ যে দিদি, বড় অনুগ্রহ ; না জানি আজ কা’র মুখ দেখে উঠেছিলাম ।”

অভ্যাগতা হাসিয়া কহিল, “আর কা’র মুখ দেখে উঠবে ? রোজ যা’র মুখ দেখে উঠ, আজও তা’র মুখ দেখে উঠেছ ।”

এই কথা শুনিয়া তরুণীর মুখমণ্ডল ক্ষণেকের জন্ত মেঘাচ্ছন্ন হইল ; অপরা নারীর অধরমূলে হাস্য অর্ধপ্রকটিত রহিল । এই স্থলে উভয়ের বর্ণনা করি ।

অভ্যাগতা যে ত্রিংশৎবর্ষবয়স্কা এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি । সে শ্রামবর্ণা—কাল নয়—কিন্তু তত শ্রামও নয় । মুখকান্তি নিতান্ত সুন্দর নয়, অথচ কোন অংশ চক্ষুর অপ্রিয়কর নয় ; তন্মধ্যে ঈষৎ চঞ্চল মাধুরী ছিল, এবং নয়নের ‘হাসি হাসি’-ভাবে সেই মাধুরী আরও মধুর হইয়াছিল । দেহময় যে অলঙ্কারসকল ছিল, তাহা সংখ্যায় বড় অধিক না হইবে, কিন্তু একটা মুটের বোঝা বটে । যে শব্দাবণিক সেই বিশাল শব্দ নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বকর্ম্মার অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র সন্দেহ নাই । আভরণময়ীর স্কুলাঙ্গে একখানি মোটা শাটী ছিল ; শাটীখানি বুঝি রজকের উপর রাগ করিয়াছিল, তাই সে পথে অনেক কাল গতিবিধি করে নাই ।

অষ্টাদশবর্ষীয়ার কোমল অঙ্গে এতাদৃশ অলঙ্কার বেশী ছিল না । বস্তুতঃ তাহার বাক্যালাপে পূর্ববঙ্গীয় কোনরূপ কণ্ঠবিকৃতি সংলক্ষিত হইত না ; ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতে পারে যে, এই সর্বদাসুন্দর রমণীকুমুম মধুমতী-তীরজ নহে—ভাগীরথী-কূলে রাজধানী সন্নিহিত কোনও স্থানে জাতা ও প্রতিপালিতা হইয়া থাকিবেক । তরুণীর আরক্ত গৌরবর্ণছটা মনোহুঃখ বা প্রগাঢ় চিন্তাপ্রভাবে কিঞ্চিৎ মলিন হইয়াছিল ; তথাচ যেমন মধ্যাহ্ন রবির কিরণে স্থলপদ্মিনী অর্ধ প্রোঙ্কল, অর্ধওক

হয়, রূপসীর বর্ণজ্যোতি সেইরূপ কমনীয় ছিল। অতিবর্দ্ধিত কেশজাল অযত্নশিথিল গ্রস্থিতে স্বক্কদেশে বদ্ধ ছিল ; তথাপি অলককুন্তল সকল বন্ধন দশায় থাকিতে অসম্মত হইয়া ললাট কপোলাদি ঘিরিয়া বসিয়াছিল। প্রশস্ত পূর্ণায়ত ললাটতলে নির্দোষ বন্ধিম ভ্রুয়ুগল ব্রীড়াবিকম্পিত ; নয়নপল্লবাবরণে লোচনযুগল সচরাচর অর্দ্ধাংশমাত্র দেখা যাইত ; কিন্তু যখন সে পল্লব উর্দ্ধোখিত হইয়া কটাক্ষক্ষুরণ করিল, তখন বোধ হইত যেন নৈদাঘ মেঘমধ্যে সৌদামিনী-প্রভা প্রকটিত হইল। কিন্তু সে যৌবন-মদমত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপে চিন্তাকুলতা প্রতীত হইত ; এবং তথায় ক্ষুদ্র ওষ্ঠাধর দেখিলেই বুঝা যাইত, সে হৃদয়তলে কত সুখ দুঃখ বিরাজ করিতেছে। তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব ও নিৰ্ম্মাণ-পারিপাট্য, শারীরিক বা মানসিক ক্রেশে অনেক নষ্ট হইয়াছিল ; তথাচ পরিধেয় পরিষ্কার শাটীখণ্ডমধ্যে বাহা অর্দ্ধ দৃষ্ট হইতেছিল, তাহার অনুরূপ শিল্পকর কখনও গড়ে নাই। সেই সুঠাম অঙ্গ প্রায় নিরাভরণ, কেবলমাত্র প্রকোষ্ঠে 'চুড়ী' ও বাহুতে 'মুড়কিমাছলী' ; ইহাও বড় সুগঠন।

তরুণী হস্তস্থিত সূচ্যাদি একপার্শ্বে রাখিয়া অভ্যাগতার সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অভ্যাগতা কথোপকথনকালে নিজ গৃহযন্ত্রণা-বর্ণনে বিস্তর সম্বন্ধে প্রকাশ করিলেন ; দোষের মধ্যে এই, যে যন্ত্রণা-শুলীন বর্ণনা করিলেন, তাহা প্রায় কাল্পনিক। বক্ত্রী নিজ কর্দমময় বস্ত্রাঞ্চলের অগ্রভাগ লইয়া পুনঃ পুনঃ চক্ষে দিতে লাগিলেন ; বিধাতা তাঁহাকে যে চক্ষুয়ুগল দিয়াছিলেন সে কিছু এমত অবস্থার যোগ্য নয় ; কিন্তু কি হবে ?—অবস্থা বিশেষে শালগ্রামেরও মৃত্যু ঘটে। চক্ষুর ঘটে নাই, যতবার কাপড়খানা এসে ঠেকে ততবার চক্ষু ছুইটী কামধেনুর মত অক্ষয় অক্ষয় বর্ষণ করে। বক্ত্রী-চুড়ামণি অনেকবার অশ্রুবৃষ্টি করিয়া একবার জাঁকাইয়া কাঁদিবার উদ্যোগে ছিলেন ; কিন্তু ভাগ্যক্রমে

কথিত চক্ষু দুইটা সেই সময় সেই শিশুটির কালিময় মুখের উপর পড়িল ; শিশুটা মসীপাত্র শূন্য করিয়া অন্ধকারময় মূর্তি লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, বালকের এই অপরূপ অঙ্গরাগ দেখিয়া গৃহযজ্ঞগাবাদিনী কাঁদিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিলেন ; রসের সাগর উথলিয়া যজ্ঞগাদি ভাসাইয়া দিল ।

রোদনাদির ব্যাপার সমাপ্ত হইলে, সূর্য্যদেবকে সত্য সত্যই অস্তাচলে যাইবার উচোগী দেখিয়া বক্ত্রী তরুণীকে জল আনিতে যাইবার আমন্ত্রণ করিলেন । বস্তুতঃ এই আমন্ত্রণের জগুই এতদূর আসা । নবীনা বারি-বাহনার্থ যাইতে অস্বীকৃতা হইলেন ; কিন্তু তাঁহার সঙ্গিনী বিশেষ উত্তেজনা করিতে লাগিলেন । নবীনা কহিলেন, “মধুনতীতে বড় কুমীর, গেলে কুমীরে খাবে ।”

ইহা শুনিয়া সঙ্গিনী যে ঘোর হাস্ত করিল, নবীনা তাহাতেই বুঝিলেন,—তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য হইল না । তিনি পুনরায় কহিলেন, “যাবি কখন লা কনক, আর কি বেলা আছে ?” “এখনও দুপুর বেলা” বলিয়া কনক অঙ্গুলী নির্দেশে দেখাইলেন যে, এ পর্য্যন্ত সূর্য্যকর বৃক্ষোপরে দীপ্তিমান্ রহিয়াছে ।

নবীনা তখন কিঞ্চিৎ গাঙ্গুরীয়া সহকারে বলিলেন, “তুই জানিস্ ত কনক দিদি, আমি কখন জল আনিতে যাই না ।”

কনক কহিল, “সেই জগুই ত যাইতে কহি, তুই কেন সারাদিন পিঁজরেতে কয়েদ থাকবি ? আর বাড়ীর বউ মানুষে জল আনে না ?”

নবীনা গর্বিত বচনে কহিলেন, “জল আনা দাসীর কৰ্ম্ম ।”

“কেন, কে জল এনে দেয় লো ? দাসী চাকর কোথা ?”

“ঠাকুরঝি জল আনে ।”

“ঠাকুরঝি যদি দাসীর কৰ্ম্ম করিতে পারে, তবে বৌ পারে না ?”

তখন তরুণী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বরে কহিল, “কথায় কাজ নাই কনক !

তুমি জান আমার স্বামী আমাকে জল আনিতে বারণ করিয়াছেন । তুমি তাঁহাকে চেন ত ?”

কনকময়ী কোনও উত্তর না করিয়া সচকিত কটাফে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, যেন কেহ আসিতেছে কিনা দেখিলেন । কোথাও কেহ নাই দেখিয়া সমভিব্যাহারিণীর মুখ প্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু বলিতে বাসনা আছে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আশঙ্কা প্রযুক্ত কথনেচ্ছা দমন করিয়া অধোদৃষ্টি করতঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন । তরুণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ভাবিতেছিস্ ?”

কনক কহিল, “যদি—যদি তোর চোখ থাকত—”

নবীনা আর না শুনিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা নিবেদন করিয়া কহিল, “চুপ্ কর, চুপ্ কর—বুঝিয়াছি ।”

কনক বলিল, “বুঝিয়া থাক ত কি করিবে এখন ?”

তরুণী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, জঁষৎ অধরকম্পে এবং অল্প ললাট-রক্তিমায় প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, যুবতীর মনোমধ্যে কোন চিন্তা প্রবল । তাদৃশ জঁষৎ দেহকম্পনে আরও দেখা গেল যে, সে চিন্তায় হৃদয় অতি চঞ্চল হইতেছে । ক্ষণেক পরে কহিলেন, “চল যাই, কিন্তু ইহাতে কি পাপ আছে ?”

কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, “পাপ আছে ! আমি ভুঁড়ে ভট্টাচার্য্য নহি, শাস্ত্রের খবরও রাখি না ; কিন্তু আমার আড়াই কুড়ি মিন্‌সে থাকিলেও যাইতাম ।”

“বড় বকের পাটা” বলিয়া হাসিতে হাসিতে যুবতী কলসী আনিতে উঠিল ; “পঞ্চাশটা ! হাঁলো, এতগুলো কি তোর সাধ ?”

কনক হুঃখের হাসি হাসিয়া কহিল, “মুখে আনিতে পাপ ; কিন্তু বিধাতা যে একটা দিয়াছেন, পঞ্চাশটাও যদি তেমনি হয়, তবে কোটা

খানেকেই বা কি ক্ষতি ? কাহারও সঙ্গে যদি দেখা সাক্ষাৎ না হইল তবে আমি কোটা পুরুষের স্ত্রী হইয়াও সতী সাধবী পতিব্রতা ।”

“কুলীনে কপাল” বলিয়া তরুণী চঞ্চল পদে পাকশালা হইতে একটা ক্ষুদ্র কলসী আনয়ন করিলেন । যেমন বারিবাহিনী তেমনই কলসী । তখন উভয়ে প্রবাহিনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । কনক হাসিতে হাসিতে কহিল, “এখন এস দেখি মোর গোরবিনী, হাঁকরা গুলোকে একবার রূপের ছটাটা দেখাইয়া আনি ।”

“মর্ পোড়ার বাঁদর” বলিয়া কনকের সমভিব্যাহারিণী অবগুণ্ঠনে সলজ্জ বদন আচ্ছন্ন করিলেন ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।



অপনীত সূর্য্যকর নারিকেলাদি বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ; কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত নিশা ধরাবাসিনী হয় নাই । এমন সময় কনক ও তাহার সমভিব্যাহারিণী কলসীকক্ষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিল । পথি-পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র উদ্যান ছিল ; পূর্ব্ববঙ্গ মধ্যে তদ্রূপ উদ্যান বড় বিরল । সুশোভন লৌহ রেইলের পরিধি মধ্য হইতে অসংখ্য গোলাপ ও মল্লিকার কলি পথিকার নেত্রমোদন করিতেছিল । পূর্ব্বতন পদ্ধতিমত চতুষ্কোণ ও অষ্টাকার বহুতর চান্কার মধ্যে পরিষ্কার ইষ্টকচূর্ণ পথ সুরচিত ছিল । উদ্যান মধ্যে একটা পুষ্করিণী । তাহার তীর কোমল তৃণাবলিতে সুসজ্জিত ; একদিকে ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী । ঘাটের

সম্মুখে বৈঠকখানা । বৈঠকখানার বারাণ্ডার দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তি কথোপ-
কথন করিতেছিল ।

বয়োধিক যে ব্যক্তি, তাহার বয়স ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধ হইবে ; দীর্ঘ
শরীর, স্থলাকার পুরুষ । অতি স্থলকার বলিয়াই সুগঠন বলা যাইতে
পারিল না । বর্ণ কঠোর শ্রাম ; কাস্তি কোনও অংশে এমত নহে যে, সে
ব্যক্তিকে সুপুরুষ বলা যাইতে পারে ; বরং মুখে কিছু অমধুরতা ব্যক্ত
ছিল । বস্তুতঃ সে মুখাবয়ব অপর সাধারণের মুখাবয়ব নহে ; কিন্তু তাহার
বিশেষত্ব কি যে, তাহাও হঠাৎ নিশ্চয় করা দুর্ঘট । কটিদেশে ঢাকাই
ধূতি, লম্বা লম্বা পাকান ঢাকাই চাদরে মাথায় পাগড়ি বাঁধা । পাগড়িটির
দৌরায়ে, যে দুই এক গাছি চুল মাথায় ছিল, তাহাও দেখিতে পাওয়া
ভার । ঢাকাই মলমলের পিরহাণ গাত্রে ;—সুতরাং তদভ্যন্তরে অন্ধকারময়
অসীম দেহখানি বেশ দেখা যাইতেছিল ;—আর সঙ্গে সঙ্গে সোনার
কবচখানিও উঁকি ঝুকি মারিতেছিল । কিন্তু গলদেশে যে হেলেহার
মন্দর পর্কতে বাসুকীর গ্রায় বিরাজ করিতেছিল, সে একেবারে
পিরহাণের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল । পিরহাণে সোনার বোতাম,
তাহাতে চেন্ লাগান ; প্রায় সকল আঙ্গুলেই অঙ্গুরীয় ; হস্তে যম-
দণ্ডতুল্য পিচের লাঠী । বামন দেবের পাদপদ্মতুল্য দুই খানি পারে
ইংরাজী জুতা ।

ইহার সমভিব্যাহারী পরম সুন্দর, বয়স অনুমান বাইশ বৎসর ।
তাঁহার সুবিমল স্নিগ্ধ বর্ণ, শারীরিক ব্যায়ামের অসম্ভাবেই হউক, বা
ঐহিক সুখ সম্ভোগেই হউক, জঁষৎ বিবর্ণ হইয়াছিল । তাঁহার পরিচ্ছদ
অনতি মূল্যবান্,—একখানি ধূতি, অতি পরিপাটী একখানি চাদর, একটি
কেষিকের পিরহাণ ; আর গোরার বাটীর জুতা পায় । একটি আঙ্গুলে
একটি আংটি ; কবচ নাই, হারও নাইঃ।

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি অপরকে কহিল, “তবে মাধব, তুমি আবার কলিকাতা ধরিয়াজ্ছ ! আবার এ রোগ কেন ?”

মাধব উত্তর করিলেন, “রোগ কিসে ? মথুর দাদা, আমার কলিকাতার উপর টান যদি রোগ হয়, তবে তোমার রাধাগঞ্জের উপর টানও রোগ ।”

মথুর জিজ্ঞাসা করিল, “কিসে ?”

মাধব । নয় কিসে ? তুমি রাধাগঞ্জের আম বাগানের ছায়ার বয়স কাটাইয়াছ, তাই তুমি রাধাগঞ্জ ভালবাস ; আমি কলিকাতার দুর্গক্ষে কাল কাটাইয়াছি, আমিও তাই কলিকাতা ভালবাসি ।

মথুর । শুধু দুর্গক্ষ ! ডেরেনের শুকো দই ; তা’তে ছুটা একটা পচা ইঁহুর, পচা বেরাল উপকরণ—দেব ছল্লভ ।

মাধব হাসিয়া কহিল, “শুধু এ সকল সুখের জন্তু কলিকাতায় বাইতেছি না, আমার কাজও আছে ।”

মথুর । কাজ ত সব জানি ।—কাজের মধ্যে নূতন ঘোড়া নূতন গাড়ি—ঠক বেটাদের দোকানে টো টো করা—টাকা উড়ান—তেল পুড়ান—ইংরাজি নবিশ ইয়ার বকুশিকে মদ খাওয়ান—আর হয় ত রসের তরঙ্গে ঢলাঢল্ । ইঁা করিয়া ওদিকে কি দেখিতেছ ? তুমি কি কখন কনুকে দেখ নাই ? না ওই মদের ছুঁড়িটা আসমান থেকে পড়েছে ?—তাইত বটে ! ওর সঙ্গে ওটি কে ?

মাধব কিঞ্চিৎ রক্তিমকান্তি হইলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভাবান্তর প্রকাশ করিয়া কহিলেন, “কনকের কি স্বভাব দেখেছ ? কপালে বিধাতা এত দুঃখ লিখেছেন, তবু হে’সে হে’সে মরে ।”

মথুর । তা’ হউক—সঙ্গে কে ?

মাধব । তা' আমি কেমন করিয়া বলিব, আমার কি কাপড় ফুঁড়ে চোখ্ চলে ? ঘোমটা দেখিতেছ না ?

বস্তুতঃ কনক ও তাহার সঙ্গিনী কলসী কক্ষে প্রত্যাভর্তন করিতে ছিল । কনককে সকলেই চিনিত ; কিন্তু দ্বিতীয় কুলকামিনীর প্রতি পদসঞ্চারে যে অনির্কচনীয় লাবণ্য বিকাশ হইতেছিল, তাহার বস্তুভেদ করিয়া যে অপূর্ব অঙ্গসৌষ্ঠব দেদীপ্যমান হইতেছিল, তাহাতে প্রথমে মাধবের, পশ্চাৎ মথুরের দৃষ্টি মুগ্ধ হইল ; এবং উভয়ে সঙ্গীতধ্বনিদত্ত-চিত্ত কুরঙ্গের গায় অবহিত মনে তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

শেষ লিখিত কয়েকটি কথা যে সময়ে মাধবের মুখ হইতে নির্গত হইল, সেই সময় একবার মন্দ সমীরণ-হিল্লোল রমণীদিগের শিরোপরে বাহিত হইল ; এই সময় তরুণী স্বীয় কক্ষস্থিত কলসী অনভ্যস্ত কক্ষে উত্তমরূপে বসাইবার জন্ত অবগুষ্ঠন হইতে হস্ত লইবার সময়, দৃষ্ট সমীরণ অবগুষ্ঠনটি উড়াইয়া ফেলিল । মুখ দেখিয়া মাধব বিস্মিতের গায় ললাট আকুঞ্চিত করিলেন । মথুর কহিল, “ওই দেখ—তুমি ওকে চেন ?”

“চিনি ।”

“চেন ? তুমি চেন, আমি চিনি না ; অথচ আমি এই খানে জন্ম কাটাইলাম, আর তুমি কয়দিন ! চেন যদি, তবে কে এটি ?”

“আমার শালী ।”

“তোমার শালী ? রাজমোহনের স্ত্রী ?”

“হাঁ ।”

“রাজমোহনের স্ত্রী, অথচ আমি কখন দেখি নাই ?”

“দেখিবে কিরূপে ? উনি কখন বাটীর বাহির হয়েন না ।”

মথুর কহিল, “হয়েন না তবে আজ হইয়াছেন কেন ?”

মাধব । কি জানি ।

মথুর । মানুষ কেমন ?

মাধব । দেখিতেই পাইতেছ—বেশ সুন্দর ।

মথুর । ভবিষ্যৎকাল গণকঠাকুর এলেন আর কি ! তা বলিতেছি না—বলি, মানুষ ভাল ?

মাধব । ভাল মানুষ কাহাকে বল ?

মথুর । আঃ কীলেজে পড়িয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছ । একবার যে সেখানে গিয়া রাজামুখোর শ্রাদ্ধর মন্ত্র পড়িয়া আসে, তাহার সঙ্গে ছোটো কথা চলা ভার । বলি ওর কি—?

মাধবের বিকট ক্রভঙ্গ দৃষ্টে মথুর যে অশ্লীল উক্তি করিতে চাহিতেছিলেন তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন ।

মাধব গর্কিত বচনে কহিলেন, “আপনার এত স্পষ্টতার প্রয়োজন নাই ; ভদ্রলোকের স্ত্রী পথে যাইতেছে তাহার সম্বন্ধে আপনার এত বক্তৃতার আবশ্যক কি ?”

মথুর কহিল, “বলিয়াছি ত তু’ পাত ইংরাজি উল্টাইলে ভায়ারা সব অগ্নি-অবতার হইয়া বসেন । আর ভাই, শ্রীমদ্ভাগবত কথায় কব না ত কাহার কথা কব ? বসিয়া বসিয়া কি পিতামহীর যৌবন বর্ণনা করিব ? যাক্ চুলায় যাক্ ; মুখ খানা ভাই, সোজা কর—নইলে এখনই কাকের পাল পিছনে লাগিবে । রাজমুহনে গোবর্দ্ধন এমন পদ্মের মধু খায় ?”

মাধব কহিল, “বিবাহকে বলিয়া থাকে সুরতি খেলা ।”

এইরূপ আর কিঞ্চিৎ কথোপকথন পরে উভয়ে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।



কনকময়ী এবং তৎসঙ্গিনী নীরবে গৃহাভিমুখে চলিলেন । লোকের সম্মুখে কথা কহিতে কনকের সহচরী অতি লজ্জাকর বোধ করিতে লাগিলেন । তাঁহাকে নীরব দেখিয়া কনকও নীরব । কিন্তু এমন লোকালয় মধ্যে রসনারূপিণী প্রচণ্ডা অশ্বিনী যে নিজ প্রার্থন্যাঙ্গী গুণ দেদীপ্যমান করিতে পারিল না, কনকের ইহাতে বড় মনোদুঃখ রহিল । তাঁহারা আপনাপন গৃহ-সান্নিধ্যে আসিলেন ; তথায় লোকের গতিবিধি অধিক না থাকায় কনীয়সী কথোপকথন আরম্ভ করিলেন ; বলিলেন, “কি পোড়া কপালে বাতাস দিদি, আমাকে কি নাস্তানাবুদই করিল ।”

কনক হাসিয়া কহিল, “কেন তোমার ভগ্নীপতি কি কখন তোমার মুখ দেখে নাই ?”

কনীয়সী । আমি ত তাহার জন্ত বলিতেছি না—অন্য একজন যে কে ছিল ।

কনক । কেন, সে যে মথুর বাবু ; তাহাকে কি কখন দেখে নাই ?

কনীয়সী । কবে দেখিলাম ?—আমার ভগ্নীপতির জ্যেষ্ঠাত ভাই মথুর বাবু ?

কনক । সে না ত কে ?

কনীয়সী । কি লজ্জা বোন্ কাহারও সাক্ষাতে বলিস্ না ।

কনক । মরণ আর কি ! আমি লোকের কাছে গল্প করিতে যাইতেছি যে, তুমি জল আনিতে ঘোমটা খুলে মুখ দেখাইয়াছিলে ।

এই বলিয়া কনক মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। তরুণী সরোষে কহিল, “তুমি ভাগাড়ে পড় না কেন ? কথার রকম দেখ। এমত জানিলে কি আমি তোমার সঙ্গে আসিতাম ?”

কনক পুনরায় হাস্য করিতে লাগিল ; যুবতী কহিলেন, “তোমার ও হাসি আমার ভাল লাগে না—সর্বনাশ ! ছুর্গা যা করেন।”

এই বলিয়া নবীন গৃহাভিমুখে নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিতকলেবরা হইল। কনকময়ীও সেই দিকে নিরীক্ষণ করিয়া এই আকস্মিক ভীতির হেতু অনুভূত করিলেন। তাঁহারা প্রায় গৃহ-সামিধ্যে উপনীতা হইয়া-ছিলেন। কনক দেখিতে পাইল যে, দ্বারে অগ্নিবিচ্ছুরিত নয়নে কাল-মূর্তির গায় রাজমোহন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সঙ্গিনীর কর্ণে কর্ণে সে কহিল,—“আজ দেখিতেছি মহাপ্রলয় ; আমি তোমার সঙ্গে যাই, যদি অকূলে কাণ্ডারী হইতে পারি।”

রাজমোহনের স্ত্রী তরুণী কহিল, “না, না আমার ও সহ আছে—তুমি থাকিলে হয় ত হিতে বিপরীত হবে, তুমি বাড়ী যাও।”

ইহা শুনিয়া কনক পথান্তরে নিজ গৃহে গমন করিল। তাঁহার সহচরী যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন রাজমোহন কিছুই বলিল না। তাহার স্ত্রী জলকলসী লইয়া পাকশালায় রাখিলেন। রাজমোহন নিঃশব্দে সঙ্গে সঙ্গে পাকশালায় যাইলেন। স্ত্রী কলসীটি রাখিলে রাজমোহন কহিল, “একটু দাঁড়াও।” এই বলিয়া জলের কলসী লইয়া আঁস্তাকুড়ে জল ঢালিয়া ফেলিলেন। রাজমোহনের একটা প্রাচীনা পিসী ছিল। পাকের ভার তাঁরই প্রতি ; তিনি এইরূপ জলের অপচয় দেখিয়া রাজমোহনকে ভৎসনা করিয়া কহিলেন, “আবার জলটা অপচয় করিতেছিস্ কেন রে ? তোমার ক’গুণা দাসী আছে যে, আবার জল আনিয়া দিবে ?”

“চুপ কর মাগী হারামজাদী” বলিয়া রাজমোহন বারিশূণ্য কলসীটা বেগে দূরে নিক্ষেপ করিল; এবং স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু অথচ অন্তর্জ্বালাকর স্বরে কহিল, “তবে রাজরানী, কোথায় যাওয়া হইয়াছিল?”

রমণী অতি মৃদুস্বরে দার্ঢ্য সহকারে কহিল, “জল আনিতে গিয়াছিলাম।”

যথায় স্বামী তাঁহাকে দাঁড়াইতে বলিয়াছিল তিনি তথায় চিত্রাঙ্কিত পুস্তলিকার গায় অম্পন্দিত কায় দাঁড়াইয়াছিলেন।

রাজমোহন ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, “জল আনিতে গিয়াছিলে! কারে বলে গিছেলে ঠাকুরানি?”

“কাহারেও বলে যাই নাই।”

রাজমোহন আর ক্রোধপ্রবাহ সম্বরণ করিতে পারিল না, চিৎকার স্বরে কহিল, “কারেও বলে যাও নাই—আমি দশ হাজার বার বারণ করেছি না?”

অবলা পূর্বমত মৃদুভাবে কহিল, “করেছ।”

“তবে গেলি কেন হারামজাদি?”

রমণী অতি গর্বিত বচনে কহিল, “আমি তোমার স্ত্রী।” তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

“গেলে কোন দোষ নাই বলিয়া গিয়াছিলাম।”

অসমসাহসের কথা শুনিয়া রাজমোহন একেবারে অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন; বজ্রনাদবৎ চিৎকারে কহিলেন, “আমি তোকে হাজার বার বারণ করেছি কিনা?” এবং ব্যাঘ্রবৎ লক্ষ দিয়া চিত্রপুস্তলিসম স্থির-রূপিনী সাধবীর কোমল কর বজ্রমুঠে এক হস্তে ধরিয়া প্রহারার্থ দ্বিতীয় হস্ত উত্তোলন করিলেন।

অবলাবালা কিছু বুঝিলেন না ; প্রহারোত্ত হস্ত হইতে এক পদও সরিয়া গেলেন না, কেবল এমন কাতর চক্ষে স্ত্রী-ঘাতকের প্রতি চাহিয়া রহিলেন যে, প্রহারকের হস্ত যেন মস্তমুগ্ধ রহিল । ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিয়া রাজমোহন পত্নীর হস্তত্যাগ করিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ পূর্বমত বজ্রনির্নাদে কহিল, “তোরে লাথিয়ে খুন করব ।”

তথাপি তিরস্কৃত্য কোন উত্তর করিল না, কেবল চক্ষে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতেছিল । ঈদৃশী মানসিক যন্ত্রণা নীরবে সহ করিতে দেখিয়া নিষ্ঠুর কিঞ্চিৎ আর্দ্র হইল । সহধর্মিণীর অচলা সহিষ্ণুতা দৃষ্টে প্রহারোত্তমে বিতথপ্রযত্ন হইলেন বটে, কিন্তু রসনাল্দ্রে অবাধে বজ্রতাড়ন হইতে লাগিল । সে মধুমাথা শব্দাবলী এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া পাঠকের কর্ণ পীড়ন করা অবিধেয় । ধীরা সকলই নীরবে সহ করিল । ক্রমে রাজমোহনের প্রচণ্ডতা থর্ব হইয়া আসিল ; তখন প্রাচীনা পিসীর একটু সাহস হইল । তিনি ধীরে ধীরে ভ্রাতৃপুত্র-বধুর কর ধারণ পূর্বক তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন ; এবং যাইতে যাইতে ভ্রাতৃপুত্রকে ছই এক কথা শুনাইয়া দিলেন ; কিন্তু তাহাও সাবধানে, সাবধানে—সাবধানের মার নাই । যখন দেখিলেন যে রাজমোহনের ক্রোধ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন বর্ষায়সী একেবারে স্বীয় কর্ণকূপ হইতে প্রচণ্ড তিরস্কার-প্রবাহ ছাড়িয়া দিলেন, ভ্রাতৃপুত্র যতগুলীন কুকথা মুখনির্গত করিয়াছিল, প্রায় সকল গুলিরই উপযুক্ত মূল্যে প্রতিশোধ দিলেন । রাজমোহন তখন নিজের ক্রোধ লইয়া বাস্ত, পিসীর মুখ-নিঃসৃত ভাষা লালিত্যের বড় রসাস্বাদন করিতে পারিলেন না ; আর পূর্বে সে রস অনেক আস্বাদন করা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি এক্ষণে তাহা অপূর্ব বলিয়া বোধ করিলেন না । ছইজনে ছইদিকে গেলেন ; পিসী বধুকে সাঙ্ঘনা করিতে লাগিলেন । রাজমোহন কাহার মাথা ভাঙ্গিবেন ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।



এক্ষণে পাঠক মহাশয়ের সহিত যাঁহাদিগের পরিচয় হইল, তাঁহাদিগের পূর্ব বিবরণ কথনে প্রবৃত্ত হই ।

পূর্বাঞ্চলে কোন ধনাঢ্য ভূস্বামীর আলয়ে বংশীবাদন ঘোষ নামে এক ভৃত্য ছিল । এই ভূস্বামীর বংশ ও নাম এক্ষণে লোপ হইয়াছে, কিন্তু পূর্বে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল । বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত সন্তানের মুখাবলোকন না করিয়া শেষ বয়সে তিনি দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন । কিন্তু বিধির নির্বন্ধ কে খণ্ডাইতে পারে ? দ্বিতীয় পত্নীও সন্তানরত্ন-প্রসবিনী হইলেন না । না হউন, বার্ককো তরুণী স্ত্রী একাই এক সহস্র । সত্য বটে মধ্যে মধ্যে ছই সপত্নীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত করিতেন ; কখন কখন কর্তার নিকট আসিয়া উভয়ে চীৎকারের মহলা দিতেন ; কখন বা কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠার কাপড় টানিয়া ছিঁড়িতেন ; জ্যেষ্ঠা কনিষ্ঠার চুল টানিয়া ছিঁড়িতেন । এমনও কখন হইয়াছে যে, ছেঁড়া ছিঁড়ি নাক কাণ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে । রাজার রাজার যুদ্ধ হইলেই প্রায় উলু থাকড়ার প্রাণ বধ চইয়া থাকে,—বৃদ্ধ, সহধর্ম্মিণীদিগের সমর সময়ে নিকটে থাকিলেই লাথিটা গুঁতাটার বক্ষিত হইতেন না ; কনিষ্ঠার পদাঘাত পাইলেই মনে করিতেন,—এইবার পূর্বপুরুষেরা স্বর্গে উঠিলেন ; এমনই লাথির জোর । জ্যেষ্ঠা সর্বদা বলিতেন, “বড়র বড়, ছোটর ছোট ।” শেষে করাল কাল মধ্যস্থ হইয়া “বড়র বড়, ছোটর ছোট” বলিয়া বড়কে আগে অন্তর্হিত করিল ।

বয়োধিকা পরীক্ষার মৃত্যু দেখিয়া প্রাচীন মনে করিলেন, “ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে ; আমাকেও কোন্ দিন ডাক পড়ে এই। মরি তাতে ক্ষতি নাই, বার ভূতে বিষয়টা থাকে।”

প্রেমসী যুবতীর সাক্ষাতে মনের কথা বলিলে প্রেমসী বলিলেন, “কেন আমি আছি, আমি কি তোমার বার ভূত ?” বৃদ্ধ কৰ্ত্তা কহিলেন, “তুমি যেখানে এক বিঘা জমি স্বহস্তে দান বিক্রয় করিতে পারিবে না, সেখানে তুমি আর বিষয় ভোগ করিলে কি ?” চতুরা কহিল, “তুমি মনে করিলে সব পার ; বিষয় বিক্রয় করিয়া আমার নগদ টাকাটা দাও না।” তথাস্ত বলিয়া ভূস্বামী ভূমি বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয়ে মন দিলেন। স্ত্রীর আজ্ঞা এমনই বলবতী যে, যখন বৃদ্ধ লোকান্তরে গমন করিল, তখন তাহার বিপুল সম্পত্তি প্রায় স্বর্ণরৌপ্য রাশিতেই ছিল—ভূমি অতি অল্প ভাগ। করুণাময়ী বড় বুদ্ধিমতী ; তিনি মনে মনে ভাবিলেন, “এখন ত সকলই আমার ; ধন আছে, জন আছে, যৌবনও আছে। ধন জন যৌবন সকলই বৃথা ; যতদিন থাকে ততদিন ভোগ করিতে হয়।”

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র অবতারে যখন জানকী বিচ্ছেদে কাতর হন, তখন কি করেন, সীতার একটা স্মরণ প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া মনকে আশ্বাস দিয়াছিলেন। করুণাময়ীও সেইরূপ স্বামীর কোনও প্রতিমূর্ত্তির মুখ নিরীকণ করিয়া এ ছঃসহ বিরহ যন্ত্রণা নিবারণ না করেন কেন ? আরও ভাবিলেন, রামচন্দ্র ধাতুময় প্রতিমূর্ত্তিতে হৃদয় স্নিগ্ধ করিতেন ; নির্জীব ধাতুতে যদি মনোহঃখ নিবারণ হয়, তবে যদি একটা সজীব পতিপ্রতিনিধি করি তাহলে আরও সুখদ হইবে সন্দেহ কি ? কেননা সজীব প্রতিনিধিতে কেবল যে চক্ষুর তৃপ্তি হইবে এমন নহে, সময়ে সময়ে কার্যোদ্ধারও সম্ভাবনা। অতএব একটা উপ-স্বামী স্থির করা

আবশ্যক । পতি এমন পরম পদার্থ যে, একেবারে পতিহীন হওয়া অপেক্ষা একটা উপপতি রাখাও ভাল ; বিশেষ শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন তাহাতে কি আর কিছু আছে ?

এইরূপ বিবেচনা করিয়া করুণাময়ী স্বামীর সজীব প্রতিমূর্ত্তিতে কাহাকে বরণ করিবে ভাবিতে ভাবিতে বংশীবদন ঘোষ খানসামার উপর নজর পড়িল ; বংশীবদনকে আর কে পায় ? ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ লইয়া সংসার, তাহার মধ্যে ধর্ম্ম আদৌ, কাম মোক্ষ—পশ্চাৎ । এই তিনকে যদি করুণাময়ী ভৃত্যের শ্রীচরণে সমর্পণ করিতে পারিল, রহিল অর্থ । অর্থ আর কয়দিন থাকি থাকে ? খানসামা বাবু অতি শীঘ্র সদর নায়েব হইয়া বসিলেন । কালে সকলের লয়,—কালে প্রণয়ের লয়—কালে প্রণয়ীর লয়,—প্রণয়ময়ী অতি শীঘ্রই খানসামাকে ত্যাগ করিয়া প্রেমাম্পদ মৃত স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন ।

প্রথমে করুণাময়ীর অতি সামান্য জ্বর হয় ; জ্বরটা অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায় । লোকে বংশীবদনের নানামত নিন্দা করিতে লাগিল ; কেহ কেহ এমনও কহিল যে, সে ধনসম্পত্তি আত্মসাৎ করণাশায় করুণাময়ীকে বিবপান করাইয়াছিল । যাহাই হউক করুণাময়ী প্রাণত্যাগ করিলেন ।

বংশীবদন প্রণয়িনী বিয়োগের মনোহুঃখেই হউক, অথবা “যঃ পলায়তি স জীবতি” বলিয়াই হউক, তৎকরণাৎ চাকরী স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাটা আসিলেন ।

করুণাময়ীর বিপুল অর্থরাশি যে তাহার সঙ্গে আসিল, তাহা বলা বাহুল্য । অপরিপাট ধনের অধিপতি হইয়াও বংশীবদন, পাছে অসম্ভব ব্যয় ভূষণ করিলে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় এই আশঙ্কায় অতি সাবধানে কালযাপন করিতে লাগিলেন । তিনি পরলোক গমন করিলে তাহার

পুলেরা তাদৃশ সাবধানতা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না ; এবং দীর্ঘকাল গতে নিশ্চিত হইয়া ভূসম্পত্তি ক্রয় করিলেন, অট্টালিকা ও ক্রীড়া-হর্ম্যাদি নির্মাণ করিলেন, এবং পৈতৃক ধনরাশির উপযুক্ত ঐশ্বর্য বিস্তার করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন ।

জ্যেষ্ঠ রামকান্ত অতি বিষয়কার্য্য দক্ষ ছিলেন । তাঁহার দক্ষতার ফলে তাঁহার অংশ দ্বিগুণাধিক সম্বদ্ধিত হইল ।—রামকান্ত এই সম্বদ্ধিত সম্পত্তি নিজ দক্ষতর পুত্র মথুরমোহনের হস্তে সমর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন ।

রামকান্তের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ইংরাজি স্কুল ইত্যাদি যে সকল স্থান বিদ্যাভ্যাস জন্য অধুনা সংস্থাপন হইতেছিল, তৎসমুদায়ই কেবল খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের জন্য জাল বিস্তার মাত্র ;—সুতরাং মথুরমোহনের কখন ইংরাজি বিদ্যালয় দর্শন করা হয় নাই । বাল্যাবধি বিষয়কার্য্য সম্পাদনে পিতৃ সহযোগী হইয়া তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিয়াছিল ; প্রজাপীড়ন, তঞ্চকতা ও অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি বিদ্যাতে বিশেষ নিপুণতা অর্জিত হইয়াছিল ।

বংশীবদনের দ্বিতীয় পুত্র রামকানাই অগ্রপথাবলম্বী হইল । তিনি স্বভাবতঃ সাতিশয় ব্যয়শীল ছিলেন ; এজন্য অল্প কালেই অতুল ঐশ্বর্য্য বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল । মধ্যম বাবুর যেমন বাটী, মধ্যম বাবুর যেমন বাগান, মধ্যম বাবুর যেমন আসবাব, এমন কোন বাবুরই নয় । কিন্তু মধ্যম বাবুর জমিদারীও সর্কাপেক্ষা লাভশূন্য ; এবং মধ্যম বাবুর ধনাগারও তদ্রূপ অপদার্থ । শেষে কতিপয় শঠ চাটুকার তাঁহাকে কোন বাণিজ্যাদি ব্যাপারে সংলিপ্ত করিল । কলিকাতার থাকিয়া ব্যবসায় ঈদৃশ অপরিমিত অর্থলাভের সঙ্কল্প করিতে লাগিল যে, সরল-চিত্ত ভূস্বামী-পুত্র দুঃশাশ্রু হইয়া কলিকাতায় গেলেন ; এবং বাণিজ্যো-

পলকে ধূর্ত চাটুকারদিগের করে পতিত হইয়া ছতসর্কর হইলেন ।
পরিশেষে ঋণ পরিশোধার্থ তাবৎ ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল ।

রামকানাই বাণিজ্য উপলক্ষে কলিকাতায় আসায় এক উপকার
হইয়াছিল,—রাজধানীবাসীদিগের পদ্ধতি অনুসারে নিজ পুত্র মাধবকে
দেশীয় ও বিদেশীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়াছিলেন । আরও মনুষ্যজন্মের
সাধ মিটাইয়া উপযুক্ত পাত্রীর সহিত মাধবের পরিণয় ঘটাইয়াছিলেন ।—
কলিকাতার নিকটবর্তী কোনও গ্রামে এক দরিদ্র কায়স্থ বাস করিত ।
জগদীশ্বর যেমন কাহাকে সর্বাংশে সুখী করেন না, তেমনই কাহাকেও
সর্বাংশে দুঃখী করেন না । কায়স্থের দুস্তার দুঃখসাগরতলে অমূল্য দুই
রত্ন জন্মিয়াছিল,—ঠাঁহার দুই কন্যাতুল্যা অনিন্দিত সর্বাঙ্গসুন্দরী অথবা
অকলুষিত চরিত্রা আর কোন কামিনী তৎপ্রদেশে ছিল না । কিন্তু রূপেই
বা কি করে, চরিত্রেই বা কি করে,—ললাটলিপি দোষে হউক বা যে
কারণেই হউক, সচরাচর দেখা যায়, বঙ্গদেশসম্বৃত কত রমণীরত্ন
শূকরদন্তে দলিত হয়,—কায়স্থের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাতঙ্গিনীর অদৃষ্টেও তদ্রূপ
হইল—নীচস্বভাব রাজমোহন ঠাঁহার স্বামী হইল ।

রাজমোহন কস্মঠ, কোনও উপায়ে সংসার প্রতিপালন করিয়া থাকে ;
তাহার বাটীও নিকটে । এজন্ত কন্যাকর্তার ও কন্যাকর্তীর পাত্র বড়
মনোনীত হইল,—রাজসিংহাসনের যোগ্যা কন্যা মাতঙ্গিনী দুষ্টের দাসী
হইলেন । কনিষ্ঠা হেমাজিনীর প্রতি বিধাতা প্রসন্ন,—মাধবের সহিত
ঠাঁহার পরিণয় হইল ।

মাধবের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইবার কিছু পূর্বে রামকানাই লোকান্তরে
গমন করিলেন । মাধব পিতৃপরলোকের পর প্রায় দারিদ্র্যগ্রস্ত
হইতেন, কিন্তু অদৃষ্ট প্রসন্ন । বংশীবদন ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র রামগোপাল,
জ্যেষ্ঠের স্ত্রায় ধনসম্পত্তিশালী না হইলেও দ্বিতীয়ের স্ত্রায় হতভাগা

ছিলেন না। রামগোপাল, রামকানাইয়ের পরই পীড়াগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার সম্ভানসম্বন্ধি ছিল না। তিনি এই মর্মে উইল করিলেন যে, মাধব তাঁহার তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেক, বিধবা স্ত্রী যতদিন মাধবের ঘরে বাস করিবেন ততদিন তাঁহার নিকট গ্রাসাচ্ছাদন পাইবেন মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।



পিতৃবিয়োগের পরেও মাধব বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাঁহার কার্য্যকারকেরা বিষয় রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে হেমাঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া রাধাগঞ্জে গমনোত্তম হইয়া শ্বশুরালয়ে আগমন করিলেন।

মাতঙ্গিনী তৎকালে পিত্রালয়ে ছিলেন, এবং রাজমোহনও তথায় উপস্থিত ছিলেন। রাজমোহন সময়ের সুযোগ বুঝিয়া মাধবের নিকট নিজের দুঃখকাহিনী প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, “পূর্বে কোনরূপে দিন যাপন করিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে কাজ কর্ম্ম প্রায় রহিত হইয়াছে; আমাদের সহায় মুকুন্দের মহাশয় ব্যতীত আর কেহ নাই। মহাশয় কুবেরতুল্য ব্যক্তি, অনুগ্রহ করিলে অনেকের কাছে বলিয়া দিতে পারেন।”

মাধব জানিতেন যে, রাজমোহন অতি দুর্নীতস্বভাব, কিন্তু সরলা মাতঙ্গিনী তাহার গৃহিণী হইয়া যে গ্রাসাচ্ছাদনের ক্রেশ পাইতেছিলেন,

ইহাতে মাধবের অন্তঃকরণে রাজমোহনের উপর মমতা জন্মাইল। তিনি বলিলেন, “আমার পূর্কবধি মানস যে, কোন বিশ্বস্ত আত্মীয় ব্যক্তির হস্তে বিষয়কর্মের কিয়দংশ ভার গ্ৰহণ করিয়া আপনি কতকটা বঙ্গাট এড়াই, তা মহাশয় যদি এ ভার গ্রহণ করেন তবে ত উত্তমই হয়।”

রাজমোহন মনে মনে বিবেচনা করিল যে, মাধব যে প্রস্তাব করিতেছিলেন তাহাতে রাজমোহনের আশার অতিশ্রিক্ত ফল হইতেছে; কেন না, সে যদি মাধবের জমিদারীর একজন প্রধান কর্মকারক হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার উপার্জনের সীমা থাকিবে না। কিন্তু এক দোষ যে, দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। রাজমোহন উত্তর করিল, “আমার প্রতি মহাশয়ের দয়া যথেষ্ট; কিন্তু যদি মহাশয়ের সহিত যাইতে হয়, তা’হলে পরিবার কাহার কাছে রাখিয়া যাই ?”

মাধব বলিলেন, “সে চিন্তায় প্রয়োজন কি ? একই সংসারে দুই ভগিনী একত্র থাকিবেন, মহাশয়ও আমার বাটীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনই ভাবে থাকিবেন।”

এই শুনিয়া রাজমোহন ক্রভঙ্গ করিয়া মাধবের প্রতি চাহিয়া সক্রোধে বলিল,—“না মহাশয়, প্রাণ থাকিতে এমন কখনও পারিব না।”

এই বলিয়া রাজমোহন তদুত্তরেই শ্বশুরালয় হইতে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতে রাজমোহন প্রত্যগমন করিল, এবং মাধবকে পুনরায় কহিল, “মহাশয়, সপরিবারে দূরদেশে যাওয়া আমি পারৎপক্ষে স্বীকার নহি, কিন্তু কি করি, আমার নিতান্ত দুর্দশা উপস্থিত, সুতরাং আমাকে যাইতেই হইতেছে; কিন্তু একটা পৃথক ঘর দ্বারের বন্দোবস্ত না হইলে যাওয়া হয় না।”

যাচকের যাচ্চার ভঙ্গী পৃথক্, নিয়মকর্তার ভঙ্গী পৃথক্। মাধব দেখিলেন, রাজমোহন যাচক হইয়া নিয়মকর্তার গায় কথাবার্তা কহিতে-

ছেন ; কিন্তু মাধব তাহাতে রুষ্ট না হইয়া বলিলেন, “তাহার আশ্চর্য্য কি ? মহাশয় যাইবার পর পক্ষমধ্যে প্রস্তুত বাটী পাইবেন ।”

রাজমোহন সন্মত হইল ; এবং মাতঙ্গিনীর সহিত মাধবের পশ্চাতে রাধাগঞ্জে যাত্রা করিল ।

রাজমোহনের এইরূপ অভিপ্রায় পরিবর্তনের তাৎপর্য্য কি, তাহা প্রকাশ নাই । ফলতঃ এমত অনেকের বোধ হইয়াছিল যে, রাজমোহন এক্ষণে বাটী থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক হইয়াছিল ; অনিচ্ছার কারণ কি, তাহাও প্রকাশ নাই ।

রাধাগঞ্জে উপস্থিত হইয়া মাধব রাজমোহনকে কার্য্যের নামমাত্র ভার দিয়া অতি সুন্দর বেতন নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন ; গৃহ নির্মাণ করিতে নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন, এবং নির্মাণ প্রয়োজনীয় তাবৎ সামগ্রী আহরণ করিয়া দিলেন ।

রাজমোহন বিনা নিজ ব্যয়ে নিজোপযুক্ত পরিপাটী গৃহ স্বল্পকাল মধ্যে নির্মাণ করিলেন । সেই গৃহের মধ্যেই এই আধ্যাত্মিক সূত্রপাত ।

রাজমোহন যদিও উচ্চ বেতন-ভোগী হইলেন, কিন্তু মাধব সন্দেহ করিয়া কোনও গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন না ।—প্রতিপালনার্থ বেতন দিতেন মাত্র । রাজমোহনের কালক্ষেপণের উপায়্যভাব প্রযুক্ত মাধব তাহাকে কৃষকের দ্বারা কর্ষণার্থ বহু ভূমি দান করিলেন ; রাজমোহন প্রায় এই কার্য্যেই ব্যাপ্ত থাকিতেন ।

এইরূপে মাধবের নিকট শোধনাভীত উপকার প্রাপ্ত হইয়া রাজমোহন কোন অংশে কখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন না । রাধাগঞ্জে আসা অবধি রাজমোহন, মাধবের প্রতি অপ্রীতিসূচক এবং অপ্রীতিজনক ব্যবহার করিতে লাগিলেন ; উভয়ে সাক্ষাৎ সম্ভাবনাদি অতি কদাচিৎ সংঘটন হইত । এইরূপ আচরণে মাধব কখন দৃকপাত করিতেন

না—দৃকপাত করিলেও তদ্বিত্ত বিরক্তি বা বদান্ততার লাঘব জন্মাইত না । কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, মাতঙ্গিনী ও হেমাজিনী পরস্পর প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন, তথাপি তাঁহাদের প্রায় সাক্ষাৎ হইত না । হেমাজিনী কখন কখন স্বামীকে অনুরোধ করিয়া অগ্রজা সন্নিকানে শিবিকা প্রেরণ করিতেন ; কিন্তু রাজমোহন প্রায় মাতঙ্গিনীকে ভগিনী-গৃহে গমন করিতে দিতেন না । হেমাজিনী মাধবের স্ত্রী হইয়াই বা কিরূপে রাজমোহনের বাটীতে আসেন ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।



এক্ষণে আধ্যাত্মিকার সূত্র পুনঃগ্রহণ করা যাইতেছে । পুষ্পোত্তান হইতে মাধব বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে একজন পত্র-বাহক তাঁহার হস্তে একখানি লিপি প্রদান করিল । লিপির শিরোনামার স্থলে “জরুরি” এই শব্দ দৃষ্টে মাধব ব্যস্ত হইয়া পত্রপাঠে নিযুক্ত হইলেন । সদর মোকামে যে ব্যক্তি তাঁহার মোক্তার নিযুক্ত ছিল, সেই ব্যক্তি এই পত্র প্রেরণ করিয়াছিল । পত্রের মর্ম্ম নিয়ে উদ্ধত হইল :—

“মহিমার্গবেষু—

অধীন এ মোকামে থাকিয়া হজুরের মোকদ্দমা জাতের তদ্বিধে নিযুক্ত আছে, এবং তাহাতে যেমত যেমত আবশ্যক তাহা সাধ্যমত আমলে আনিতেছে । ভরসা করি সর্বত্র মঙ্গল ঘটনা হইবেক । সম্প্রতি অকস্মাৎ যে এক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা হজুরের গোচরে নিবেদন করিতে অধীনের সাহসাত্যাব । হজুরের শ্রীমতী খুড়ী ঠাকুরাণীর উকিল

হজুরের নামে অথ এ মোকামের প্রধান সদর আপিল আদালতে এই দাবিতে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন যে, রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের উইলনামা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও তঞ্চক,—হজুর কর্তৃক জাল উইল প্রস্তুত হইয়া বিষয়াদি হইতে তেঁহ বেদস্ত হইয়াছেন । অতএব সমেৎ ওয়াশিলাত তাবৎ বিষয়ে দখল পাওয়ার ও উইল রদের দাবি ইত্যাদি ।”

পত্নী মাধবের হস্তস্বাক্ষরিত হইয়া ভূপতিত হইল । মনে যে তাঁহার কিরূপ ক্রোধাবির্ভাব হইল তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর । বহুক্ষণ চিন্তার পর পত্নী মৃত্তিকা হইতে উত্তোলন করিলেন, এবং ললাটের স্বেদস্রুতি করদ্বারা বিলুপ্ত করিয়া পুনঃপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন । যথা—

“ইহঁার ছলাদার কে, তাহা অধীন এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই; কিন্তু অধীন অনেক অনুসন্ধান করিতেছে ও করিবেক । ফলে এমত বোধ হয় না যে, বিনা ছলা স্ত্রীলোক এরূপ নালিশ উত্থাপন করিবেন । অধীন অথ পরম্পরায় শ্রুত হইল যে, কোনও অতি প্রধান ব্যক্তির কুপরামর্শমতে এ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে ।”

মাধব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, এমত ব্যক্তি কে, যে কুপরামর্শ দিয়াছে? মাধব অনেক ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না । কখন একজন প্রতিযোগী প্রতিবাসীর প্রতি সন্দেহ, কখনও বা অপরের প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও সন্দেহ সমূলক বলিয়া বোধ হইল না ।

পত্রপাঠে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন :—

“অধীনের বিবেচনার হজুরের কোনও শঙ্কা নাই, কেন না, ‘যতো ধর্ম্যঃ ততো জয়’ । কিন্তু ঘেরূপ বিপক্ষের সহায় দেখা যাইতেছে, তাহাতে সতর্কতার আবশ্যক ।—বাবুদিগের এক্ষণে ওকালতনামা দেওয়া আবশ্যক—পশ্চাৎ সময়ে সময়ে সদর হইতে উকীল কোজিলী আনান

কর্তব্য হইবেক । তৎপক্ষে ছজুরের যেমন মর্জি । আজ্ঞাধীন প্রাণপণে
ছজুরের কার্যে নিযুক্ত রহিল—সাধ্যানুসারে ক্রটি করিবেক না । ইতি
তারিখ—

আজ্ঞানুবর্তী শ্রীহরিদাস রায় ।”

“পুনশ্চ নিং—

আপাততঃ মোকদ্দমার খরচ প্রায় হাজার টাকার আবশ্যক হইবেক ।
যে রূপে ছজুর বুঝিবেন সেইরূপ করিবেন ।”

পত্রপাঠ সমাপন মাত্র মাধব, খুল্লতাত-পত্নীর অনুসন্ধান পুরমধ্যে
চলিলেন । ক্রোধে কলেবর কম্পিত হইতেছিল, অতি তরল পদবিক্ষেপে
গমন করিতে লাগিলেন ;—তাঁহাকে খুল্লতাত-পত্নী কোন্ মুখে জাল
সাজ বলিয়া বিচারাগারে ব্যক্ত করিয়াছেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করিবেন,
এবং তৎক্ষণাৎ খুড়ীকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিবেন স্থির করিলেন ।

পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, সন্ধ্যাকাল পাইয়া অন্তঃপুর-
বাসিনীরা যে হট্টগোল উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কৰ্ণপাত করাই
কষ্ট, কথার উত্তর পাওয়া দূরে থাকুক । কোথাও কোন রূপসী—একে
স্থলাকার তাহাতে মেঘের বর্ণ—নানামত চীৎকার করিয়া এটা ওটা সেটা
চাহিতেছে, এবং নানামত মুখভঙ্গী অঙ্গভঙ্গী করিতেছে,—যেন একটা
ক্ষুদ্র হস্তিনী কেলি করিতেছে । কোথাও একটা পরিচারিকা তদ্রূপ
বিশাল দেহ-পৰ্বত লইয়া ব্যস্ত—প্রায় বিবসনা—গৃহ মার্জন করিতেছে ;
এবং যেমন ত্রিশূলহস্তে অসুরবিজয়িনী প্রমথেশ্বরী প্রতিবার শূলাঘাতে
অসুরদল দলিত করিয়াছিলেন, পরিচারিকাও করাল সম্মার্জনী হস্তে
রাশি রাশি জঞ্জাল, ওজলা, তরকারির খোসা প্রভৃতি দলিত করিতে-
ছিল, এবং যে আঁটকুড়ীরা এত জঞ্জাল করিয়াছিল তাহাদিগের পতিপুত্রের
মাথা মহাস্থখে থাইতেছিল । কোথাও অপরা কিঙ্করী আঁস্তাকুড়ে বসিয়া

ঘোররবে বাসন বাজিতেছিল,—পাচিকার অপরাধ, সে কেন কড়া বশুনার্য পাক করিয়াছিল?—তাই কিঙ্করীর এ গুরুতর কর্মভোগ ; যেমন মার্জন-কার্যে তাহার বিপুল করযুগল ঘর্ ঘর্ শব্দে চলিতেছিল, রসনাখানিও তদ্রূপ দ্রুতবেগে পাচিকার চতুর্দশ পুরুষকে বিষ্ঠাদি ভোজন করাইতেছিল । পাচিকা স্বয়ং তখন স্থানান্তরে, গৃহিণীর সহিত ঘৃত লইয়া মহা গোলযোগ করিতেছিলেন, আঁস্তাকুড়ে যে তাঁহার পূর্ব-পুরুষের আহারাদির পক্ষে এমন অগ্রায় ব্যবস্থা হইতেছিল, তাহা কিছুমাত্র জানিলেন না—ঘৃতের বিষয়ে একেবারে উন্মত্তা । গৃহিণী পাকার্থ যতটুকু ঘৃত প্রয়োজন ততটুকু দিয়াছেন, কিন্তু পাচিকা তাহাতে সন্তুষ্টা নহেন । তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে যতটুকু পাকার্থ আবশ্যক তাহার দ্বিগুণ ঘৃত কোন সুযোগে লওয়াই যুক্তি ; কারণ, অর্ধেক পাক হইবে, অর্ধেক আত্মসেবার জন্ত থাকিবে ।

কোথাও বা দারুণ বাঁটার আঘাতে মৎস্যকুল ছিন্ন শীর্ষ হইয়া ভূমিতে লুটাইতেছিল, কোথাও বা বালক-বালিকার দল মহানন্দে ক্রীড়া করিতেছিল । পুরস্কন্দরীরা কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রদীপ-হস্তে যাতায়াত করিতেছিলেন ; মলের শব্দ কোথাও বগাৎ বগাৎ, কোথাও রুণ্ রুণ্, কোথাও বা ঠুণ্ ঠুণ্ ; যা'র যেমন বয়স তা'র মলও তেমনই বাজিতেছিল । কখন বা বামাসুরে রামী বামী শ্রামীর ডাক পড়িতেছিল । পাড়ার গোটা দুই অধঃপাতে ছেলে নিজ নিজ পৌরুষ প্রকাশের উপযুক্ত সময় পাইয়া মল্লযুদ্ধ উপলক্ষে উঠানে চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করিতেছিল । কতকগুলীন বালিকা কলরব করিয়া আগডুম বাগডুম খেলিতেছিল ।

মাধব এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া হতাশ হইলেন ; এ ঘোর কলরবের মধ্যে যে, কেহ তাহার কথা শুনিতে পাইবে, এমন ভরসা রহিল না । তিনি অষ্টমে উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, “বলি, মাগীরা একটু

থাম্‌বি ।* এই বলিয়া উঠানে গিয়া মল্লযোদ্ধা-বালকদ্বয়ের মধ্যে একজনকে কেশাকর্ষণ করিয়া দুই-চারি চপেটাঘাত করিলেন ।

একেবারে আগুনে জল পড়িল ;—ঘোরতর কোলাহল পলকমধ্যে আর নাই, যেন ভোজবাজিতে সকলই তিরোহিত হইল । যে স্কুলাঙ্গিনী আকাশকে সম্বোধন করিয়া বিবিধ চীৎকার ও মুখভঙ্গি করিতেছিলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে অর্ধনির্গত চীৎকার অমনি কণ্ঠেই রহিয়া গেল, হস্তিনীর গায় আকারখানি কোথায় যে লুক্কায়িত হইল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া গেল না ; সম্মার্জ্জনীহস্তে যিনি বিবসনে বিষম ব্যাপার করিতেছিলেন, তিনি অমনি করস্থ ভীম প্রহরণ দূরে নিক্ষেপ করতঃ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন আরম্ভ করিলেন, কিন্তু প্রায়-বসনহীন মাংসরাশি কোথায় লুকাইবেন স্থান না পাওয়ায় এ কোণ ও কোণ করিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে মেজেতে কে জল ফেলিয়াছিল—পরিচারিকা দ্রুতপদে বিবসন শরীর লইয়া যেমন পলাইবেন, অমনি পা পিছলাইয়া চীৎপাত হইয়া ভূ-শায়িনী হইলেন ; যিনি পাত্ৰাদি মার্জ্জনে হাত মুখ দুই ঘুরাইতে ঘুরাইতে পাচিকার পিতৃপুরুষের পিণ্ডাদির ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তাঁহার একটা লম্বা গালির ছড়া আধখানা বই বলা হইল না—হাত ঘুরিতে ঘুরিতে যেমন উঁচু হইয়াছিল তেমনই উঁচু রহিয়া গেল ; মৎস্যদল-দলনী বারেক নিস্তক হইলেন, পশ্চাৎ কার্য্যারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু আর তাদৃশ ঘটাই রহিল না ; রন্ধনশালার কর্ত্তী যে ঘৃতের কারণ বক্রতা আরম্ভ করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া পলায়নতৎপর হইলেন—অন্যমনস্কপ্রযুক্তই হউক, আর তাড়াতাড়িতে বিবেচনার অভাববশতই হউক, পাচিকা পলায়ন কালে পূর্ণভাণ্ড ঘৃত লইয়া চলিয়া গেল—পাচিকা ইতিপূর্বে কেবল অর্ধভাণ্ড মাত্র ঘৃতের প্রার্থিতা ছিলেন ; যে পুর-সুন্দরীরা প্রদীপহস্তে

কক্ষে কক্ষে গমনাগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে ত্রস্তে পলাইয়া লুকায়িত হইলেন, পলায়নকালে মলগুলি একেবারে ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল—হস্তের দীপসকল নিবিয়া গেল ।

যে শিশু মল্লযোদ্ধাটি মাধবের চপেটাঘাত খাইয়াছিলেন, তিনি বীরস্বের এমত নূতনতর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থলী হইতে বেগে প্রস্থান করিয়াছিলেন—দ্বিতীয় যোদ্ধাও সময়ের গতিক তাদৃশ সুবিধাজনক নয় বুঝিয়া রণে ভঙ্গ দিলেন, কিন্তু যেমন ঘটোৎকচ মৃত্যুকালেও পিতৃবৈরী নষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিও তেমনই পলায়ন-কালে বিপক্ষের উরুদেশে একটা পদাঘাত করিয়া গেলেন । যে বালিকাগণ কলরব-সহকারে খেলিতেছিল, তাহারা খেলা ত্যাগ করিয়া পলায়নতৎপর বীরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল—ভয় হইয়াছে, কিন্তু হাসিটা একেবারে থামিল না । যে অস্ত্রপুত্র এতক্ষণ অতি ঘোর কোলাহল পরিপূর্ণ ছিল, তাহা এক্ষণে একেবারে নীরব । কেবল মাত্র গৃহিণী—অবিকৃত কান্তিমতী হইয়া—বাবুর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন ।

মাধব তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “কি মাসী, আমার বাড়ীতে বাজার !”

মাসী মূহূহাস্ত করিয়া কহিলেন, “বাছা, মেয়ে মানুষের স্বভাব বকা ।”

মাধব কহিলেন, “খুড়ী কোথা, মাসী ?”

উত্তর—“আমিও তাই ভাবিতেছিলাম, আজ সকাল বেলা হ’তে কেহই তাঁহাকে দেখে নাই ।”

মাধব বিস্ময়াগন্ন হইয়া কহিলেন, “সকাল অবধি নাই ! তবে সকলই সত্য !”

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সত্য বাপু ?”

মাধব । কিছু না—পশ্চাৎ বলিব । খুড়ী তবে কোথায় ? কাহারও সঙ্গে কি তাঁহার আজও দেখা হয় নাই ?

গৃহিণী ডাকিয়া কহিলেন, “অম্বিকা, শ্রীমতী ! তোরা কেহ দেখেছিস ?”

তাহারা সকলে সমস্বরে উত্তর করিল, “না” ।

মাধব কহিলেন, “বড়ই আশ্চর্যের কথা ।”

পরে অপুরাল হইতে একজন স্ত্রীলোক মৃদুস্বরে কহিল, “আমি নাবার বেলা বড় বাড়ীতে তাঁকে দেখেছিলাম ।”

মাধব অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন, “বড় বাড়ীতে ? মথুর দাদার ওখানে !”

তাঁহার মনোমধ্যে এক নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল । ভাবিলেন, “তবে কি মথুর দাদার কর্ম ? না, না, তা’ হ’তে পারে না—আমি অগ্রায় দোষ দিতেছি ।” পরে প্রকাশ্যে কহিলেন, “করুণা, তুই বড় বাড়ীতে যা,—খুড়ীকে ডেকে আন ; যদি না আসেন, তবে কেন আসবেন না, জিজ্ঞাসা করিস্ ।”

সপ্তম পরিচ্ছেদ ।

এদিকে মাতঙ্গিনী স্বামীকৃত তিরস্কারের পর স্বশ্রমসা কর্তৃক নিজ শয়নকক্ষে আনীত হইলে কক্ষের দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া মনের দুঃখে শয্যাবলম্বন করিলেন । রাত্রে পাকাদি সমাপন হইলে স্বশ্রমসা তাঁহাকে আহারার্থে ডাকিলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনী শয্যাভ্যাগ করিলেন না । ননন্দা কিশোরী আসিয়া পিতৃস্বপ্নার সংযোগে অনেক অনুন্নয় সাধনাদি করিলেন ; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না । অবশেষে তাঁহারা নিরস্ত হইলেন,— মাতঙ্গিনী অনশনা রহিলেন ।

মাতঙ্গিনী শয্যায় শুইয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন । মাতঙ্গিনীর প্রতি রুচি হইলে রাজমোহন প্রায় শয়নাগারে আসিত না, সুতরাং অল্প রাত্রে যে আসিবে না, ইহা মাতঙ্গিনী উত্তমরূপে জানিতেন ।

ক্রমে রজনী গভীরা হইল । একে একে গৃহস্থ সকলে নিদ্রামগ্ন হইলেন । সর্বত্র নীরব হইল । মাতঙ্গিনীর শয়নকক্ষে প্রদীপ ছিল না । গবাক্ষরক্ষের আচ্ছাদনীর পার্শ্ব হইতে চন্দ্রালোক আসিয়া কক্ষতলে পড়িয়াছিল ; তদ্বৎ কক্ষের অংশবিশেষ ঈষৎ আলোকিত হইয়াছিল । তদ্ব্যতীত সর্বত্র অন্ধকার ।

প্রকৃত অপরাধে অপমানের যন্ত্রণা সততই এত ভীক্ণ যে, ষতক্ষণ না তৎসম্বন্ধীয় বিষময়ী স্মৃতি বিলেপিতা হয়, ততক্ষণ মানবদেহে নিদ্রা অনুভূত হইতে পারে না । গ্রীষ্মাতিশয্যাপ্রযুক্ত বক্ষঃস্থল হইতে অঞ্চল

পদতলে প্রক্ষিপ্ত করিয়া উপাধান-গুস্ত বাম ভূজোপরে শিরঃ সংস্থাপন করিয়া মাতঙ্গিনী অশ্রুপূর্ণ লোচনে গৃহতলশোভিনী চন্দ্রপাদরেখা প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন। কেন ? সে অমৃত শীতল কিরণ দৃষ্টে কত যে পূর্বসুখ স্মৃতিপথগামী হইল, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে ? কৈশোরে কতদিন প্রদোষকালে হেমাঙ্গিনীর সহিত গৃহ-প্রাঙ্গণে এক শয্যায় শায়িনী হইয়া শিশু-মনোরঞ্জিনী উপকথা কখন বা শ্রবণ করিতে করিতে নীলাম্বর-বিহারী এই নিশানাথ প্রতি চাহিতে থাকিতেন, তাহা মনে পড়িল। নীলাম্বর হইতে এই মৃদুল জ্যোতিঃ বর্ষিত হইয়া কত যে হৃদয়-তৃপ্তি জন্মাইত, এক বৃন্তোৎপন্ন কুমুমযুগলবৎ কণ্ঠলগ্না দুই সহোদরা তখন কত যে আন্তরিক সুখে উচ্চহাস্য হাসিতেন, তাহা স্মরণপথে পড়িতে লাগিল।

সেই এক দশা, আর এই এক দশা। সে উচ্চহাস্য আর কাহার কণ্ঠে ? সেই সকল প্রিয়জনই বা কোথায় ? আর কি তাঁহাদের মুখ দেখিতে পাইবেন ? আর কি তাঁহাদের সেই স্নেহপূর্ণ সম্বোধন কণ্ঠকুহরে সুধাবর্ষণ করিবে ? মনঃপীড়াপ্রদান-পটু স্বামীর হস্তজ্বালিত কালাগ্নি অন্তর্দাহ ব্যতীত আর কিছু কি অদৃষ্টে আছে ?

এই সকল দুঃখ চিন্তার মধ্যে একটি গূঢ় বৃত্তান্ত জাগিতেছিল। সে চিন্তা অমৃতাপময়ী হইয়াও পরম সুখকরী। মাতঙ্গিনী এ চিন্তাকে হৃদয়-বহিষ্কৃত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। এই গূঢ় ব্যাপার কি, তাহা কনক ব্যতীত আর কেহ জানিত না।

দুঃখ-সাগর মনোমধ্যে মগ্নন করিয়া তৎ-স্মৃতিলাভে মাতঙ্গিনী কখন মনে করিতেন, রত্ন পাইলাম ; কখন বা ভাবিতেন, হলাহল উঠিল। রত্নই হউক, আর গরলই হউক, মাতঙ্গিনী ভাবিয়া দেখিলেন, তাঁহার কপালে কোন সুখই ঘটতে পারে না। চক্ষুর্ধর বারিপ্লাবিত হইল।

ক্রমে গ্রীষ্মাতিশযা দুঃসহ হইয়া উঠিল ; মাতঙ্গিনী গবাক্ষ-রন্ধ্র মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে শয্যাভ্যাগ করিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন । মুক্ত করেন, এমত সময়ে যেন কেহ শনৈঃ পদসঞ্চারে সেই দিকে অতি সাবধানে আসিতেছিল—এমত লঘু শব্দ তাঁহার কর্ণপ্রবিষ্ট হইল ।

জানেলাটি যেমত সচরাচর এরূপ গৃহে ক্ষুদ্র হয়, তদ্রূপই ছিল,— দুই হস্ত মাত্র দৈর্ঘ্য, সার্দ্ধেক হস্ত মাত্র বিস্তার । এ প্রদেশে চালাঘরে মৃত্তিকার প্রাচীর থাকে না, দরমার বেষ্টনীই সর্বত্র প্রথা । রাজমোহনের গৃহেও সেইরূপ ছিল ; এবং জানেলার বাঁপ ব্যতীত কাঠের আবরণী ছিল না ।

পার্শ্বে যে ছিদ্র দিয়া গৃহমধ্যে জ্যোৎস্না প্রবেশ করিয়াছিল, পদসঞ্চার শ্রবণে ভীতা হইয়া মাতঙ্গিনী সেই ছিদ্র দিয়া বহির্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে যত্ন করিলেন, কিন্তু নীলাম্বরম্পর্শী বৃক্ষশ্রেণীর শিরোভাগ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না ।

মাতঙ্গিনী জানিতেন, যে দিক্ হইতে পদসঞ্চার শব্দ তাঁহার কর্ণগত হইল, সে দিক্ দিয়া মনুষ্য যাতায়াতের কোন পথ নাই ; সুতরাং আশঙ্কা জন্মান বিচিত্র কি ? মাতঙ্গিনী নিম্পন্দ শরীরে কর্ণোত্তোলন করিয়া তথায় দণ্ডায়মানা রহিলেন ।

ক্রমশঃ পদক্ষেপণ শব্দ আরও নিকটাগত হইল ; পরক্ষণেই দুইজন কর্ণে কর্ণে কথোপকথন করিতেছে শুনিতে পাইলেন । দুই-চারি কথায় মাতঙ্গিনী নিজ স্বামীর কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিলেন ; তাঁহার ভ্রাস ও কোতুহল দুই সম্বন্ধিত হইল । যথায় মাতঙ্গিনী গৃহমধ্যে দণ্ডায়মানা ছিলেন, আর যথায় আগন্তুক ব্যক্তির বিয়লে কথোপকথন করিতেছিল, তন্মধ্যে দরমার বেষ্টনীমাত্র ব্যবধান ছিল । সুতরাং মাতঙ্গিনী তৎ

কথোপকথনের অনেক শুনতে পাইলেন ; আর যাহা শুনতে পাইলেন না, তাহার মর্মার্থ অনুভবে বুঝিতে পারিলেন ।

এক ব্যক্তি কহিতেছিল, “অত বড় বড় করিয়া কথা কহ নেক ? তোমার বাড়ীর লোকে যে শুনতে পাইবে ।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিল, “এত রাত্রে কে জাগিয়া থাকিবে ?”

মাতঙ্গিনী কণ্ঠস্বরে বুঝিলেন, এ কথা রাজমোহন কহিল ।

প্রথম বক্তা কহিল, “কি জানি যদি কেহ জাগিয়া থাকে, আমাদের একটু সরিয়া দাঁড়াইলে ভাল হয় ।”

রাজমোহন উত্তর করিল, “বেশ আছি ; যদি কেহ জাগিয়াই থাকে, তবে এ ছেঁচের ছায়ার মধ্যে কেহ আমাদের ঠাণ্ডর পাবে না, বরং সরিয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পাবে ।”

প্রথম বক্তা জিজ্ঞাসা করিল, “এ ঘরে কে থাকে ?”

দ্বিতীয় বক্তা রাজমোহন উত্তর করিল, “সে কথায় দরকার কি ?”

প্র, ব । বলিতেই বা ক্ষতি কি ?

দ্বি, ব । এ আমার ঘর, আমার স্ত্রী ভিন্ন আর কেহ এখানে থাকেন না ।

প্র, ব । তুমি ঠিক জান ত, তোমার স্ত্রী ঘুমাইয়াছে ?

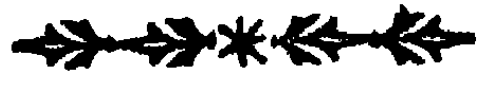
দ্বি, ব । বোধ করি ঘুমাইয়াছে, কিন্তু সেটা ভাল করিয়া জানিয়া আসিতেছি, তুমি এখানে ক্ষণেক দাঁড়াও ।

মাতঙ্গিনী পুনরায় পদক্ষেপণ শব্দ শুনতে পাইলেন ; বুঝিলেন, রাজমোহন বাটার ভিতর আসিতেছে । মাতঙ্গিনী নিঃশব্দে গবাক্ষ সন্নিধান হইতে সরিয়া শয্যায় আসিলেন ; এবং এমত সাবধানে তছপরি আরোহণ করিলেন যে, কিঞ্চিৎমাত্র পদশব্দ হইল না । তথায় নিম্নীলিত নেত্রে শয়ন করিয়া একান্ত নিদ্রাভিভূতার স্থায় রহিলেন ।

রাজমোহন আসিয়া দ্বারে মূহু মূহু করাঘাত করিল । পত্নী আসিয়া দ্বারোদঘাটন করিল না । তখন রাজমোহন মূহুস্বরে মাতঙ্গিনীকে ডাকিতে লাগিল ; তথাপি দ্বারোন্মোচিত হইল না । রাজমোহন বিবেচনা করিল, মাতঙ্গিনী নিদ্রিতা । তথাপি কি জানি যদি এমনই হয় যে, মাতঙ্গিনী সন্ধ্যাকালের ব্যাপারে অভিমানিনী হইয়া নীরব আছেন, এই সন্দেহে রাজমোহন কৌশলে কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যত্ন করিল । পাকশালার গমন করিয়া তথাকার প্রদীপ জালিয়া আনিল ; দ্বারের নিকট প্রদীপ রাখিয়া এক হস্তে একখানা কপাট টানিয়া রাখিয়া এক পদে দ্বিতীয় কবাট ঠেলিয়া ধরিল ;—এইরূপে দুই কবাটমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশের সম্ভাবনা হইলে, দ্বিতীয় হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, মাতঙ্গিনী, রাজমোহন স্বেচ্ছামত শয়নাগারে প্রবেশ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে কেবলমাত্র কাঠের “খিল” দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন । রাজমোহন অনায়াসে “খিল” বাহির হইতে উদঘাটন করিল, এবং প্রদীপহস্তে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল ।

রাজমোহন দেখিল যে, মাতঙ্গিনীর মুখকান্তি যথার্থ সুবুষ্টি-সুস্থিরের আয় রহিয়াছে । বার কয়েক তাঁহাকে ডাকিল ; কোন উত্তর পাইল না । যদি পত্নী অভিমানে নিরুত্তরা থাকে তবে অভিমান ভঙ্গনার্থ দুই চারিটা মিষ্ট কথা কহিল ; তথাপি মাতঙ্গিনী নিঃশব্দ রহিয়াছেন, ও ঘন ঘন গভীর শ্বাস বহিতেছে দেখিয়া মনে নিশ্চিত বিবেচনা করিল, মাতঙ্গিনী নিদ্রিতা । সে নিদ্রার ছল করিবে কেন ? অতঃপর নিঃসন্দেহমনে পূর্ব কৌশলে দ্বার বন্ধ করিয়া অগ্র কক্ষদ্বারে গমন করিল । দ্বারে দ্বারে সকলকে মূহুস্বরে ডাকিল, কেহই উত্তর দিল না ; সুতরাং সকলেই নিদ্রামগ্ন বিবেচনার রাজমোহন প্রদীপ নিক্ষেপিত করিয়া আগন্তুক ব্যক্তির নিকট গমন করিল ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ ।



মাতঙ্গিনী পুনর্বার নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শয্যা ত্যাগ করিয়া গবাক্ষ সান্নিধ্যে গমন করিলেন ; এবং নিম্নোক্ত মত কথোপকথন শ্রবণ করিলেন ।

সকলেই নিদ্রিত, এ সংবাদ রাজমোহন প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আগন্তুক কহিল, “তুমি আমাদের এ উপকার করিতে তবে স্বীকার আছ ?”

রাজমোহন কহিল, “বড় নহি—আমি কিন্তু তা’ বলিয়া ভাল মানুষির বড়াই করিতেছি না ; তবু নেমকহারামি ; আমি লোকটাকে ছ’চক্ষে দেখিতে পারি না বটে, কিন্তু আমার উপকার অনেক করিয়াছে ।”

অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, “উপকার করিয়াছে, তবে দেখিতে পার না কেন ?”

রাজ । উপকার করেছে, কিন্তু মন্দও করেছে । আমার ভাল কর, কর—না কর, না কর,—সে তোমার ইচ্ছা ; কিন্তু আমার যে ছঃখ দেয়, সে শত উপকার করিলেও তার মাপ নাই ।

অপরিচিত । তবে আর নেমকহারামি—কি ? আমাদের কাজে লাগিবে ?

রাজ । লাগি, যদি যা’ চাই, তাই দাও । আমার ইচ্ছা এখানকার বাস উঠাই—ওর কাছে না থাকিতে হয় । কিন্তু যাই কি নিয়ে—হাত খালি ; দেশে গেলে বাঁচি কি মরি । তাই আমি এমন এক হাত

মারিতে চাই যে, সেই টাকায় অন্তত আমার কিছুকাল গুজরাণ হয় ।
যদি তোমাদের এ কন্ঠে এমন হাত মারিতে পারি, তা' হলে লাগিব না
কেন ? লাগিব ।

অপ । আচ্ছা, কি নেবে বল ?

রাজ । তুমি আগে বল দেখি আমার কি করিতে হইবে ?

অপ । যাহা বরান্নর করেছ তাহাই করিবে ; মাল বই করিয়া
দিবে । এইবার মনে করিতেছি যে, নগদ ছাড়া যা কিছু পাইব তা
তোমার কাছে রেখে যাব ।

রাজ । বুঝেছি, আমি নইলে তোমার কাজ চলিবে না । তোমরা
বেশ বুঝেছ যে, এত বড় বাড়ীতে একটা কন্ঠ হইলে এ দিকেও বড়
গোলযোগ হইয়া উঠিবে ; রাঁড়ী বালুতির বাড়ী নয় যে, নারোগা বাবু
কিছু প্রণামী লইয়া স্বচ্ছন্দে দেখনহাসির বাড়ীতে বসিয়া ইয়ারকী
মারিবে । একটা তল্লাস তাগাদার বড় রকম সকমই হইয়া উঠিবে ;
তাহা হইলে সোণা কোলে করিয়া বসিয়া থাকিলে ত হইবে না । তাই
তোমরা চাও যে, যতদিন না লেঠাটা মিটে ততদিন আমার কাছে
সব থাকে । তা' বড় মন্দ মতলব নয় ; আর আমারও এমত যুত
বরাত আছে যে, কোন শালা খড়্কে গাছটিও টের পাবে না । বিশেষ
আমি ভায়রা ভাই, আমাকে কোন্ শালা শোবে করবে ? অতএব
আমার দ্বারা যে কাজ হবে, আর কাহারও দ্বারা তেমনটি হবে না ।
কিন্তু আমার সঙ্গে বনিয়া উঠা ভার ।

অপ । যদি ভাই এতই বুঝিতেছ, তবে কেন বনাইয়া লও না ।

রাজ । আমি দশ কথা পাঁচ কথার মানুষ নই ; প্রাণ চায় দাও—
না হয়, আপনার কন্ঠ আপনি কর,—সিকিভাগ চাই ।

দস্যু ভালরূপ জানিত যে, রাজমোহনের এ বিষয়ে কাজে কথায় এক,

অপহৃত দ্রব্যের চতুর্থাংশের নূন সে সহায়তা করিতে স্বীকার হইবে না ; অতএব বাক্যব্যয় বৃথা । কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিল, “আমি সম্মত হইলাম । তাদের একবার জিজ্ঞাসার আবশ্যক ; তা’ তারা কিছু আমার মত ছাড়া হবে না ।”

রাজমোহন উত্তর করিল, “তা’তে সন্দেহ কি ? কিন্তু আর একটা কথা আছে । যা’ আমার কাছে থাকিবে, তার আমরা একটা মোটা-মোটি দাম ধরিব ; ইহারই সিকি তোমরা আমাকে নগদ দিয়া যাবে ; তারপর মহাজনে কম দেয় আমি কন্মতির সিকি ফেরৎ দিব, আর বেশী দেয় তোমরা আমাকে বেশীটা দেবে ।”

দস্যু । তাই হ’বে ; কিন্তু আমারও আর একটা কথা আছে । তোমাকে আর একটা কাজ করিতে হইবে ।

রাজ । আর এক মুঠো টাকা ।

দস্যু । তা’ত বটেই । আমরা মাধব ঘোষের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠিব, সে কেবল আমাদের আপনাদেরই জগ্ন ; কিন্তু পরের একটা কাজ আছে ।

রাজমোহন কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি কাজ ?”

দস্যু । তাহার খুড়ার উইলখানা চাই ।

রাজমোহন কিছু চমকিয়া কহিল, “হঁ ।”

দস্যু কহিল “হঁ, কিন্তু উইলখানা কোথায় আছে আমরা তা’ জানি না । আমরা ত সমস্ত রাত্রি কেবল কাগজ উটকাইয়া বেড়াইতে পারব না । কোথায় আছে সে খবরটা তুমি অবশ্য জান ।

রাজ । জানি ; কিন্তু কাহার জগ্ন উইল চাই ?

দস্যু । তাহা কেন বলিব ?

রাজ । কেন, আমাকেও বলিবে না ?—আমার কাছে লুকাইবার আবশ্যক ?

দস্যু : তোমাকেও বলিতে বারণ ।

রাজ । মথুর ঘোষ ?

দস্যু । যেই হউক—আমাদের বাদশার মুখ নিয়ে কাজ । যেই হউক, কিছু মজুরি দেবে, আমরা কাজ তুলে দেব ।

রাজ । আমারও ঐ কথা ।

দস্যু । উইল পার কোথায় ?

রাজ । আমার কি দিবে বল ?

দস্যু । তুমিই বল না ।

রাজ । পাঁচ শত খানি দিও ; তোমরা পাবে ঢের দিলেই বা ।

দস্যু । এটা বড় জিয়াদা হইতেছে ; আমরা মোটে দুই হাজার দক্ষিণা পাইব, তার মধ্যে সিকি দিই কেমন করে ।

রাজ । তোমাদের ইচ্ছা ।

দস্যু পুনর্বার চিন্তা করিয়া কহিল, “আচ্ছা, তাই সই ; আমার ঢের কাজ আছে, আমি কাগজ হাঁটকিয়া বেড়াইলে চলিবে না । নয়ত কোনও ছোঁড়া ফোঁড়ার হাতে পড়িবে, আর পুড়াইয়া ফেলিবে—পাঁচ-শতই দেব ।”

রাজ । মাধবের শুইবার খাটের শিয়রে একটা নূতন দেরাজ আলমারি আছে ; তাহার সব নীচের দেরাজের ভিতর একটা বিলিতি টিনের ছোট বাক্সতে উইল, কবালা, খত ইত্যাদি রাখিয়া থাকে ; আমার গোপন খবর জানা আছে ।

দস্যু । ভাল কথা ; যদি এ লেঠা চুকিল, তবে চল জুটি গিয়া । কন্স হইয়া গেলে যেখানে আসিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিব, তাহা সকলে থেকে স্থির করা যাইবে । এস, আর দেরি করে কাজ নেই ; টান্দি ডুবিলে কন্স হবে—এখনকার রাত্ ছোট ।

এই কহিয়া উভয়ে ধীরে ধীরে গৃহের ছায়াবরণ হইতে বনের দিকে
প্রস্থান করিল। মাতঙ্গিনী বিস্মিতা ও ভীতি-বিহ্বলা হইয়া ভূতলে বসিয়া
পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ ।



মাতঙ্গিনী অস্তুরালে থাকিয়া তাবৎ গুনিয়াছিলেন। এই বিষম
কু-সঙ্কল্পকারিদিগের মুখ-নির্গত যত গুলিন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে
প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ততগুলিন বজ্রাঘাত তাঁহার বোধ হইয়াছে। যতক্ষণ
না কথোপকথন সমাপ্ত হইয়াছিল, ততক্ষণ বসন্ত-বাতাহত অশ্বখ পত্রের
শ্রায় তাঁহার ভীতি-কম্পিত তনু কোন মতে দণ্ডায়মান ছিল ; কিন্তু কথা
সমাপ্তি হইবামাত্র মাতঙ্গিনী আত্ম-বিবশা হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ ত্রাস ও উৎকট মানসিক যন্ত্রণার আধিক্য প্রযুক্ত
বিমূঢ়া হইয়া রহিলেন ; ক্রমে মনঃস্থির হইলে দৈব প্রকাশিত এই বিষম
ব্যাপার মনোমধ্যে পরিচালনা করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি
নিজ ভর্তাকে সম্পূর্ণরূপে চিনিতেন না ; আজ তাঁহার চক্ষুরশীলিত
হইল। চক্ষুরশীলনে যে করাল মূর্তি দেখিলেন, তাহাতে মাতঙ্গিনীর
শরীর রোমাঞ্চিত হইল। এ পর্য্যন্ত মনে ভাবিতেন যে, বিধাতা তাঁহাকে
ক্রোধ-পরবশ হর্গীত ব্যক্তির পাণিগৃহীতী করিয়াছেন ; আজ জানিলেন
যে, তিনি দস্যুপত্নী—দস্যু তাঁহার হৃদয়-বিহারী।

জানিয়াই বা কি ? দস্যু-স্পর্শ হইতে পলাইবার উপায় আছে কি ?

স্ত্রী-জাতি—পতিসেবা পরায়ণা দাসী—পতিত্যাগের শক্তি কোথায় ? চিরদিন দস্যুপদে দেহ-রত্ন অর্পিত হইবে—গরলোদগীর্ণমান বিষধর হৃদয়-পথে আসীন থাকিবে, পাছে সে আন্দোলনে আসনচ্যুত হয় বলিয়া কখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে পারিবে না । ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ঙ্কর ললাট-লিপি বিধাতার লেখনী হইতে নির্গত হইতে পারে ?

মাতঙ্গিনী ক্ষণেককাল এইরূপ চিন্তা করিলেন ; পরক্ষণেই যে দস্যু-দল-সঙ্কলিত দারুণ-প্রমাদ ঘটনা হইবে তাহাই মনোমধ্যে প্রথর তেজে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল । আর কাহারই বা এই সর্বনাশ ঘটনা হইবে ? হেমাঙ্গিনীর সর্বনাশ, মাধবের সর্বনাশ ! মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চ কণ্টকিত,—শোণিত শীতল হইতে লাগিল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল । যখন ভাবিলেন যে, যে প্রিয় সহোদরা এক্ষণে এই নির্জ্বল নিশীথে হৃদয়-বল্লভের কণ্ঠলগ্না হইয়া নিশ্চিন্ত মনে সুষুপ্তি সুখানুভব করিতেছে, সে মনেও জানে না যে, দারিদ্র্য-রাক্ষসী তাহার পশ্চাতে মুখব্যাদন করিয়া রহিয়াছে, এখনই গ্রাস করিবে ; হয়ত ধন হানির সঙ্গে মানহানি, প্রাণহানি পর্য্যন্ত হইবে, তখনই মাতঙ্গিনীর নিজ সম্বন্ধীয় মর্ষব্যথক ভূত ভবিষ্যৎ চিন্তা অন্তর্হিত হইল । মনে মনে স্থির বুঝিলেন যে, আমি না বাঁচাইলে হেমাঙ্গিনী ও মাধবের রক্ষা নাই, যদি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহাদের রক্ষা করিতে পারি, তবে তাহাও করিব ।

মাতঙ্গিনী প্রথমোক্তমে মনে করিলেন, গৃহস্থ সকলকে জাগরিত করিয়া সকল ঘটনা বিবৃত করেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব অন্তর্হিত হইল ; ভাবিলেন, তাহাতে কোন উপকার হইবে না । কেন না, রাজমোহনের আত্মপরিবার এমত অশ্রুতপূর্ব সংবাদ বিশ্বাস করিবেক না ; বিশ্বাস করিলেও মাধবের উপকারার্থ রাজমোহনের বিরুদ্ধাচারী হইবেক না ।

বরং লাভের মধ্যে তাহারা রাজমোহনের নিকট মাতঙ্গিনীকে এত-
দ্বিষয়ের সংবাদ-দাত্রী বলিয়া পরিচিত করিলে মাতঙ্গিনীর মহাবিপদ
সম্ভাবনা ।

পশ্চাৎ বিবেচনা করিলেন যে, কেবল কনককে জাগ্রত করিয়া
তাহাকে সকল সংবাদ অবগত করান ; এবং যাহা উচিত হয় পরামর্শ
করেন । তদভিপ্রায়ে মাতঙ্গিনী শয্যাভ্যাগ করিয়া বাটীর বাহিরে
আসিলেন । কনকের গৃহ সন্নিকট । মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে কনকের
গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।

চন্দ্রালোকে পৃথিবী প্রফুল্লিতা । মাতঙ্গিনী কনকের গৃহ-দ্বারে
উপনীতা হইয়া ধীরে ধীরে দ্বারে করাঘাত করিলেন । কনকের নিদ্রাভঙ্গ
হইতে না হইতে কনকের মাতা কহিল, “কে, রে ?”

সর্বনাশ ! কনকের মাতা অতিশয় মুথরা, মাতঙ্গিনীর এ কথা
স্মরণই ছিল না । মাতঙ্গিনী ভয়ে নিঃশব্দ রহিলেন । কনকের মাতা
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে রে ?” “কে রে ?”

মাতঙ্গিনী সাহস করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, “আমি গো ।”

কনকের মাতা কোপযুক্ত স্বরে কহিল, “কে ?—রাজুর বৌ বুঝি,
এত রাত্রে তুমি এখানে কেন গা ?”

মাতঙ্গিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, “কনককে একটা কথা বলিব ।”

কনকের মাতা বলিল, “রাত্রে কথা কি আবার একটা ? সারাদিন
কথা করে কি আশ মেটে না ? ভালমানুষের মেয়েছেলে রাত্রে এ-বাড়ী
ও-বাড়ী কি গা ? বউ-মানুষ, এখনই এ সব ধরেছ ?—চল দেখি তোমার
পিশেসের কাছে ।”

মাতার তর্জন গর্জনে কনকের নিদ্রাভঙ্গ হইল ; বৃত্তান্ত বুঝিয়া কনক
কহিল, “মা, ছয়টি খুলে দাও, শুনিই না কি বলে ।”

বিকারী জনো অবনা, নবোদয়নী; বাল্যাললাবধি ভেটাবি

চৈদ্যামাশ্রবনে সূক্ষ্মমৰী ভৌতিকীতি বিষয় ১১ পথ

অতি বনায় (গৃহভে আধকর দক্ষদল কোটা চাখমারি

বনমৰী লুটলী লুটিকা আলে, যদি গাভৰুৰ ধৰ্মস্বালিত

শূন্যৰে ~~ভুক্তক~~ পূৰ্ণক ^{মুখিম্বু} মাতাজনীৰ মৰেৰ কোমারিক

পূৰ্ণক। যদি দক্ষদলমৰী মাতাজনী কামৰ দ্বিষ্টপথে গতি

গেল। এই মাতাজনী পুন পুন কোমারিক ২২০০ লালিক

লেন। ৫ মাকিয়া ৩

উদাত্ত মাতাজনীৰ ^{সময়} অতি অতিমৰ মাতৃ মাতৃ
মাতৃ মাতৃ ন মাতৃ মাতৃ, মাতৃ মাতৃ: কৰে মাতৃ
মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ

মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ

পুন মাতাজনীৰ ^{সময়} অতি অতিমৰ মাতৃ মাতৃ

ও ^{সময়} অতি অতিমৰ মাতৃ মাতৃ, মাতৃ মাতৃ: কৰে মাতৃ

মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ

মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ

মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ

মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ মাতৃ

কনকের মাতা গর্জন করিয়া বলিল, “দেখ কনকি, এমন মুড়া ঝাঁটা তোর কপালে আছে ।”

কনক নিষ্পন্দ ও নির্ঝাক্ হইল । মাতঙ্গিনী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং পুনরায় গভীর চিন্তায় অভিভূত হইলেন । ভাবিলেন, “কি করি ? কেমন করে তাদের রক্ষা হয় ? কে সংবাদ দিবে ?—কে এ রাত্রে যাইবে ? আমি আপনিই যাই, এ ছাড়া অন্য উপায় নাই ।” পরক্ষণে ভাবিলেন,—“কেমন করিয়া যাইব ? লোকে কি বলিবে ? মাধব কি মনে করিবে ? শুধু তাহাই নহে, স্বামী জানিতে পারিলে প্রমাদ ঘটবে । তাহা হউক—লোকে যাই বলুক—মাধব যাহা হয় মনে করুক—স্বামী যাহা করে করুক, তজ্জন্তু মাতঙ্গিনী ভীতা নহে ।”

কিন্তু মাতঙ্গিনী যাইতে সাহস করিলেন না । এ গভীর নিশীথকালে, এই নিস্তরু বনান্তঃ পথ, তাহাতে আবার একাকিনী অবলা, নবীন বয়সী, বাল্যকালাবধি ভৌতিক উপন্যাস শ্রবণে হৃদয় মধ্যে ভৌতিক-ভীতি বিষম প্রবলা । পথ অতি দুর্গম । তাহাতে আবার দস্যুদল কোথায় জটলা করিয়া আছে ; যদি তাহাদের করকবলিত হইলেন ? এই কথা স্মৃতিমাত্র ভয়ে মাতঙ্গিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল । যদি দস্যুদলমধ্যে মাতঙ্গিনী স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিতা হইলেন ? এই ভয়ে মাতঙ্গিনী পুনঃ পুনঃ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিলেন ।

স্বভাবতঃ মাতঙ্গিনীর হৃদয় সাহস-সম্পন্ন । যে অন্তঃকরণে স্নেহ আছে, প্রায় সে অন্তঃকরণে সাহস বিরাজ করে । প্রিয়তমা স্ত্রীদেহা ও তৎপতির মঙ্গলার্থ মাতঙ্গিনী প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে উন্মত্ত হইলেন । যেমন উপস্থিত বিপত্তির বিকট মূর্তি পুনঃ পুনঃ মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে লাগিল, অমনি মাতঙ্গিনীরও হৃদয়গ্রন্থি দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল—

তখন অগাধ প্রণয়-সলিলে ভাসমান হইয়া বলিলেন, “এ ছার জীবন আর কি জন্তু ? যদি এ সঙ্কল্পে প্রাণ রক্ষা না হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি ? এ গুরুভার বহন করা আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়াছে । কাজেই এ দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে । যাহারা প্রাণাধিক তাহাদের মঙ্গল সাধনে এ প্রাণ ত্যাগ না করি কেন ? আমার ভয় কি ? প্রাণনাশাধিক বিপদও ঘটিতে পারে ; জগদীশ্বর রক্ষাকর্তা ।”

কিন্তু মাধবের বাটীতে এ নিশীথে একাকিনী কি প্রকারেই যান ? মাতঙ্গিনীর চিন্তাকুলতা সহনাতীত হইল ।

কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া চিন্তাসম্বন্ধিত গ্রীষ্মাতিশযোর প্রতীকার হেতু জালরন্ধু সন্নিধানে গিয়া জালাবরনী উত্তোলন করিলেন । দেখিলেন যে, বিটপী শ্রেণীর ছায়া এক্ষণে দীর্ঘাকৃত হইয়াছে—অস্তাচলাভিমুখী নিশাললাটরত্ন প্রায়-দিগন্ত-ব্যাপী বৃক্ষ শিরোরাজির উপরে আসিয়া নির্ঝাণোন্মুখ আলোক বর্ষণ করিতেছেন । আর দুই চারি দণ্ড পরে সে আলোক একেবারে নির্ঝাপিত হইবে, তখন আর হেমাঙ্গিনীকে রক্ষা করিবার সময় থাকিবে না । বিপদ একেবারে সন্মুখে দেখিয়া মাতঙ্গিনী আর বিলম্ব করিলেন না ।

মাতঙ্গিনী বাটীতে একথণ্ড শয্যোত্তরচ্ছদে আপাদমস্তক দেহ আবরিত করিলেন, এবং কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যে কৌশলপ্রভাবে ক্ষণপূর্বে রাজমোহন বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিলেন, মাতঙ্গিনীও তদ্রূপ করিলেন ।

গৃহের বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া যখন মাতঙ্গিনী উর্দ্ধে অসীম নীলাশ্বর, চতুর্দিকে বিজন বন-বৃক্ষের নিঃশব্দ নিষ্পন্দ শিরঃশ্রেণী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন পুনর্বার সাহস দ্রবীভূত হইয়া গেল—হৃদয় শঙ্কাকম্পিত হইল—চরণ অচল হইল । মাতঙ্গিনী অঞ্জলিবদ্ধ করে

ইষ্টদেবের স্তব করিলেন । হৃদয়ে আবার সাহস আসিল ; তিনি দ্রুতপাদ-বিক্ষেপে পথ বহিয়া চলিলেন ।

বনময় পথ দিয়া যাইতে প্রভাত বাতাহত পদ্যের গায় মাতঙ্গিনীর শরীর কম্পিত হইতে লাগিল । সর্বত্র নিঃশব্দ ; মাতঙ্গিনীর পাদবিক্ষেপ শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল ; স্থানে স্থানে নিবিড় ছায়াকারে অন্তঃকরণ শিহরিতে লাগিল । যত বৃক্ষের গুঁড়ী ছিল প্রত্যেককে করালবদন পৈশাচ মূর্তি বলিয়া ভ্রম হইতে লাগিল । বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায়, পত্রে পত্রে নরঘ্নপ্রেত লুক্কায়িতভাবে মাতঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিতেছে তাহা তাঁহার প্রতীতি হইতে লাগিল । যে যে স্থলে তমসা নিবিড়তর, সেই সেই স্থানে ছুরন্ত ভূতযোনি বা দস্যুর প্রচ্ছন্ন শরীরের ছায়া মাতঙ্গিনীর চক্ষুর্জ্বালা উৎপাদন করিতে লাগিল । বাল্যকালে যত ভৌতিক উপাশাস শ্রুত হইয়াছিল, নিশীথ পাহের গহন মধ্যে বিকট পৈশাচ দংষ্ট্র ভঙ্গী সন্দর্শনে ভীতি-বিহ্বল হইয়া প্রাণত্যাগ করার যে সকল উপকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, সকলই একেবারে তাঁহার স্মরণপথে আসিতে লাগিল ।

যদি কোথাও শাখাচ্যুত শুষ্কপত্র-পতন শব্দ হইল, যদি কোনও শাখারূঢ় নৈশ বিহঙ্গ পক্ষস্পন্দ করিল, যদি কোথাও শুষ্কপত্র মধ্যে কোন কীট দেহ সঞ্চালন করিল, অমনি মাতঙ্গিনী ভয়ে চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন ; তথাপি দৃঢ় সঙ্কল্প-বিবদ্ধা সাহসিকা তরুণী, কখন বা ইষ্টদেব নামজপ কখন বা প্রিয়জনগণের বিপত্তি চিন্তা করিতে করিতে চঞ্চলপদে উদ্দিষ্ট স্থানাভিমুখে চলিলেন ।

ভয়সঙ্কুল নিবিড় তমসাচ্ছন্ন পথের একপার্শ্বে বৃহৎ আশ্রয় কানন, অপর পার্শ্বে এক দীর্ঘিকার পাহাড় । বন্য উচ্চভূমিখণ্ড মধ্যে পথ অতি সঙ্কীর্ণ ; তদুপরি দীর্ঘিকার উপর প্রকাণ্ডাকার কতিপয় বটবৃক্ষের ছায়ায়

চন্দ্রালোকের গতি নিরুদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং এইস্থানে পথান্ধকার নিবিড়তর। দীর্ঘিকার পাহাড়ের বটবৃক্ষতল বহুতর লতাগুল্ম কণ্টক বৃক্ষাদিতে সমাচ্ছন্ন।

মাতঙ্গিনী ভীতি-চকিতনেত্রে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আত্ম-কাননের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আলোক প্রদীপ্ত হইতেছিল, এবং অক্ষুটস্থরে বহুব্যক্তির কথোপকথনের শব্দও মাতঙ্গিনীর কর্ণগোচর হইল।

মাতঙ্গিনী বুঝিলেন, যাহা ভয় করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। এই আত্ম-কাননের মধ্যে দস্যুদল জটলা করিতেছে। দুঃসময়ে বিপদ একপ্রকারে কেবল উপস্থিত হয় না ;—পথিমধ্যে একটা কুকুর শয়ন করিয়াছিল, নিশাকালে পথিক দেখিয়া উচ্চরব করিতে লাগিল। আত্ম-কাননের কথোপকথন তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইল। মাতঙ্গিনী বুঝিতে পারিলেন যে, কুকুর-শব্দে দুরাআরা লোক-সমাগম অনুভূত করিয়াছে ; অতএব শীঘ্রই তাহারা কাছে আসিবে। আসন্নকালে মাতঙ্গিনী নিঃশব্দ গমনে দীর্ঘিকার জলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। আত্ম-কানন বা পথ হইতে তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্তু যদি দস্যুরা দীর্ঘিকার তটরোহণ করিয়া পথিকের অন্বেষণ করে, তাহা হইলে মাতঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ দৃষ্টিপথে পতিত হইবেন। নিকটে এমনত কোন ক্ষুদ্র বৃক্ষলতাদি ছিল না যে, তদন্তরালে লুকায়িত হইতে পারেন। কিন্তু আসন্ন বিপদে মাতঙ্গিনীর ধৈর্য্য ও কর্তব্যতৎপরতা বিশেষ ক্ষুণ্ণিত হইয়া উঠিল।

ক্ষণমধ্যে মাতঙ্গিনী জলতীরস্থ একধণ্ড গুরুভার আর্দ্র মৃৎধণ্ড উত্তোলন করিয়া অঙ্গস্থ শয্যোত্তরচ্ছদের মধ্যে রাখিয়া গ্রন্থিবন্ধন করিলেন। অনায়াস-গোপনযোগ্য পরিধেয় শাটীমাত্র অঙ্গে রাখিয়া কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। এক্ষণে পুষ্করিণীর পাহাড়ের অপরদিকে

মনুষ্য কর্তৃক স্পষ্ট শ্রুতিগোচর হইল ; এবং মনুষ্য পদসঞ্চালন শব্দও নিঃসন্দেহে শ্রুত হইল । মাতঙ্গিনী ঈদৃশ সাবধানতার সহিত শব্দোত্তরচ্ছদ জলমগ্ন করিলেন যে, জলশব্দ না হয় । বস্ত্রখণ্ড মৃৎখণ্ডের গুরুভারে তলস্পর্শ করিয়া অদৃশ হইল । মাতঙ্গিনী এক্ষণে ধীরে ধীরে জলমধ্যে অবতরণ করিয়া অন্ধকারবর্ণ স্বচ্ছ সরোবর-বক্ষে যথায় কথিত বটবিটপীর ছায়ায় প্রগাঢ়তর অন্ধকার হইয়াছিল, তথায় অধর পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া রহিলেন । তাঁহার মুখমণ্ডল ব্যতীত আর কিছু জলের উপর জাগিতেছিল না । তথাপি কি জানি, যদি সেই মুখমণ্ডলের উজ্জ্বলবর্ণ সে নিবিড় অন্ধকার মধ্যে কেহ লক্ষ্য করে, এই আশঙ্কায় মাতঙ্গিনী নিজ কবরী-বন্ধনী উন্মোচন করিয়া কোমলাকৃষ্ণিত কুন্তলজাল মুখের উপর লম্বিত করিয়া দিলেন । অতঃপর সেই ঘনান্ধকারবর্ণ সরসী জলের উপরে, ঘনতর বৃক্ষ-ছায়াভ্যন্তরে যে নিবিড় কেশদাম ভাসিতেছিল, তাহা মনুষ্য কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব । পরক্ষণেই কথোপকথনকারীরা দীর্ঘিকা-তট অবতরণ করিয়া অর্দ্ধপথ আসিল । মাতঙ্গিনী তাহাদের কেবলমাত্র কর্তৃক ও পদশব্দ শুনিতে পাইলেন । তাহাদের পানে যে চাহিয়া দেখিবেন, এমত সাহস হইল না ।

আগন্তুকদের মধ্যে একজন অর্দ্ধফুট বাক্যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কহিল, “এত বড় তাজ্জব ! আমি সঠিক বলিতেছি, আমি বেশ দেখিয়াছিলাম, এই পথের উপর একটা মানুষ চাদর মুড়ি দিয়া যাইতেছিল ; বাগানের বেড়ার ফাঁক দিয়া আমি দেখিয়াছিলাম ।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিল, “গাছপালা দেখে তোর ধাঁ ধাঁ লেগে থাকবে ; অপদেবতা টেবতাই বা দেখে থাকবি । এত গরমিতে মানুষে কাপড় মুড়ি দিয়া বেড়াবে কেন ?”

“হবে” বলিয়া পুনশ্চ উভয়ে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল ;

আশঙ্কার মূল কারণ যে ভীতিবিহ্বলা অবলা, তাঁহাকে তাহারা দেখিতে পাইল না ।

দস্যুরা কিছু দেখিতে না পাইয়া চলিয়া গেল । যতক্ষণ তাহাদের প্রত্যাবর্তন-শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল ততক্ষণ মাতঙ্গিনী জলমধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন । যখন বিবেচনা হইল যে, আর তাহাদের দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন জল হইতে উঠিয়া গমনোচ্ছোগিনী হইলেন ।

মাতঙ্গিনী যে পথে গমন কালীন এক্রপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, শঙ্কাক্রমে এবার সে পথ ত্যাগ করিলেন । পুষ্করিণীর তীর পরিবেষ্টন করিয়া অপর দিকে আর একপথে উঠিলেন । মধুমতী যাইতে মাতঙ্গিনীর নিষেধ ছিল বটে, কিন্তু পুষ্করিণী নিষিদ্ধ ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে আঙ্গিক স্নানাদি ক্রিয়ার্থ এই জলে আসিতেন । সুতরাং এ স্থানের লকল পথ উত্তমরূপে চিনিতেন । পুষ্করিণীর অন্ত এক পাহাড়ে উঠিয়া অন্ত এক পথ অবলম্বন করিলে যে পূর্বাवलম্বিত পথে পড়িতে হয়, অথচ আত্র-কাননের ধারে যাইতে হয় না, ইহা এই সময়ে মাতঙ্গিনীর স্মরণ হইল । বৃক্ষলতা কণ্টকাদির প্রাচুর্য্যবশতঃ এই পথ অতি দুর্গম, কিন্তু মাতঙ্গিনীর পক্ষে কণ্টকাদির বিঘ্ন, তুচ্ছ বিঘ্ন । অলঙ্কর পরিবর্তে কণ্টক-বেধ-বাহিত রক্তধারা চরণদ্বয় রঞ্জিত করিতে লাগিল । একদিকে গুরুতর সঙ্কল্প সিদ্ধির জন্ত উৎকণ্ঠা, অপরদিকে দস্যু-হস্ত হইতে পরিত্রাণের জন্ত ব্যগ্রতা ; এই উভয় কারণে মাতঙ্গিনী তিলাঙ্ক বিলম্ব না করিয়া কণ্টকলতাদি পদদলিত করিয়া চলিলেন । কিন্তু এক নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইবার উপক্রম হইল ;—মাতঙ্গিনী রাধাগঞ্জ আসিয়া অবধি ছই তিনবার মাত্র সহোদরাবল্লভ মাধবের আলয়ে আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পদব্রজে একবারও গমন করেন নাই । সুতরাং

এদিকের পথ তাঁহার ভেমন জানা ছিল না । এক্ষণে মাতঙ্গিনী চতুর্দিক-বাহী পথ-সন্নিধানে উপনীতা হইয়া কোন্ পথে যাইবেন, তাহা অবধারণে অক্ষম হইলেন । মাতঙ্গিনী পাগলিনীর গায় ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিলেন । ভাগ্যক্রমে মাধবের অট্টালিকার সম্মুখ-রোপিত দেবদারু-শ্রেণীর শিরোমালা নয়নগোচর হইল । দৃষ্টিমাত্র হর্ষিতচিত্তে তদভিমুখে চলিলেন ; এবং সত্বর অট্টালিকার সমীপবর্তিনী হইয়া খিড়কির দ্বারে উপস্থিত হইলেন । তথাপি মাতঙ্গিনীর ক্লেশের চূড়ান্ত হইল না । এ নিশীথে বাটীর সকলেই নিদ্রিত, কে দ্বার খুলিয়া দিবে ? অনেকবার করাঘাত করিয়া মাতঙ্গিনী পুরু-কিঙ্করী করুণাকে নিদ্রোথিতা করিলেন । নিদ্রাভঙ্গে করুণা অপ্রসন্ন হইয়া ভীষণ গর্জন করিয়া কহিল, “এত বেতে কে রে দোর ঠেঙ্গায় ?”

মাতঙ্গিনী উৎকণ্ঠা-ভীত স্বরে কহিলেন, “শীঘ্র—শীঘ্র—করুণা, দ্বার খোল ।” নিদ্রাভঙ্গকরণ-অপরাধ অতি গুরুতর ; এমন সহজে ক্ষমা সম্ভাবনা কি ? করুণার ক্রোধোপশম হইল না, পূর্ববৎ পুরুষ বচনে কহিল, “তুই কে যে তোকে আমি তিন পর বেতে দোর খুলে দেব ?”

মাতঙ্গিনী সম্পৃষ্টে আপন নাম ডাকিয়া কহিতে পারেন না, অথচ শীঘ্র গৃহ-প্রবেশ জন্ত বাস্ত হইয়াছেন ; অতএব পুনরায় সবিনয়ে কহিলেন, “তুমি এস, শীঘ্র এস গো, এলেই দেখতে পাবে ।”

করুণা সম্বন্ধিত রোষে কহিল, “তুই কে বল না, আ মরণ !”

মাতঙ্গিনী কহিলেন, “ওগো বাছা, আমি চোর ছ্যাঁচড় নই, মেয়ে মানুষ ।”

তখন করুণার স্থল বুদ্ধিতেও একটু একটু আভাস হইল যে, চোর ছ্যাঁচড়ের কণ্ঠস্বর এত সুমধুর প্রায় দেখা যায় না । অতএব আর গণ্ডগোল না করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল । এবং মাতঙ্গিনীকে দেখিবামাত্র সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, “এ কি ! তুমি ! -তুমি ঠাকুরাণী !”

মাতঙ্গিনী কহিলেন, “আমি একবার হেমের সঙ্গে দেখা করিব—
বড় দরকার ; শীঘ্র আমাকে হেমের কাছে লইয়া চল ।”

দশম পরিচ্ছেদ ।

করুণার নিদ্রালয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল । সে বুঝিয়া দেখিল,
ব্যাপারটা রহস্যময় । তাহার কোতূহল সাতিশয় উদীপ্ত হইয়াছিল ; কিন্তু
তচ্ছরিতার্থতার আপাততঃ কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া গৃহকর্ত্রীর নিকট
মাতঙ্গিনীকে লইয়া যাওয়া স্থির করিল । তত্ক্ষণে দ্বার পুনরায় অর্গলবদ্ধ
করিল ; এবং কয়েকটা দ্বার ও প্রশস্ত প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া মাতঙ্গিনীসহ
দ্বিতলে হেমের শয়নগৃহদ্বারে অচিরে সমুপস্থিত হইল । হেমাতঙ্গিনী তখন
নির্ভয়ে পতিঅঙ্কে শায়িতা হইয়া সুখময় স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন । মাতঙ্গিনী
দ্বারেমুছ করাঘাত করিলেন ; কিন্তু তাহাতে হেমাতঙ্গিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল
না । তত্ক্ষণে মাতঙ্গিনী একটু অধৈর্য হইয়া হেমাতঙ্গিনীর নাম ধরিয়া
ডাকিতে লাগিলেন ; সঙ্গে সঙ্গে সবল করাঘাতও চলিতে লাগিল । তাহাতে
মাধবের নিদ্রাভঙ্গ হইল ; তিনি ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ?”

মাতঙ্গিনী আর উত্তর করিতে পারিলেন না ; তাঁহার বুকের ভিতর
কাঁপিয়া উঠিল । তাঁহাকে নিরুত্তরে অবস্থান করিতে দেখিয়া করুণা উত্তর
করিল, “ও-বাড়ীর ঠাকরুণ এসেছেন ।”

মাধবের নিদ্রার ঘোর তখনও সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই ; তিনি
শয্যায় শুইয়া নিমীলিত নেত্রে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে মাতু—
মাতঙ্গিনী ?”

“হাঁ ।”

নিদ্রাদেবী তখন মাধবকে পরিত্যাগ করিয়া সবেগে প্রস্থান করিলেন । দেবীর কবলমুক্ত হইয়া মাধব ঝটিতি শয্যাভ্যাগ করিলেন ; এবং বসন সংযত করিয়া লইয়া দ্বারোদঘাটন করিলেন । করুণার হস্তে একটা টিনের ডিবা জ্বলিতেছিল । গবাক্ষপথ মুক্ত চন্দ্রালোক কক্ষদ্বার-সামুদেহ আলোকিত করিতেছিল । মাধব বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাতঙ্গিনী শিশিরসিক্তা অরবিন্দতুল্যা দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । তিনি সাতিশয় বিষয় সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কি দিদি ! তুমি এ সময়—এ অবস্থায় !”

তৎকালে হেমের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল । তিনি বসনদ্বারা দেহ মস্তক উত্তমরূপে সমাচ্ছাদিত করিয়া লইয়া শয্যাপার্শ্বস্থিত মোমবাতি জ্বালিলেন ; এবং আত্মগোপন করিবার মানসে গৃহ-কোণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । কেননা, তিনি যে ভক্তার শয্যা-বিহারিণী ছিলেন, একথা জ্যেষ্ঠাগ্রজা ভগিনীর নিকট হইতে গোপন রাখা বিশেষ প্রয়োজন । কিন্তু মাতঙ্গিনী ইতিপূর্বে কনিয়সীর পবিত্র মন্দির, পবিত্র শয্যা দেখিয়া লইয়াছিলেন । মাধব, মাতঙ্গিনীর নিকট হইতে কোন সহজতর না পাইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “দিদি, এ সময়, এ অবস্থায় কেন ?”

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, “সন্মুখে বড় বিপদ একদল দস্যু তোমার গৃহ-আক্রমণ করিতে আসিতেছে—অপহরণ তাহাদের উদ্দেশ্য—”

মাধব চমকিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, “তুমি কিরূপে জানিলে ?”

মাতঙ্গিনী সে প্রশ্নের কোনরূপ উত্তর না করিয়া অধোবদনে নীরব রহিলেন । মাধব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এখানে এসেছ রাজমোহনবাবু তাহা অবগত আছেন ?”

“না ।”

“তিনি কোথায় ?”

“জানি না ।”

“তুমি এ সংবাদ কোথায় পাইলে ?”

“আমি গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়াছি ।”

গৃহস্বামী বিস্মিত হইয়া ক্রকুঞ্চিত করিলেন, এবং মৃদুস্বরে কহিলেন,
“সে কি ?”

সন্ধেশবাহিকার মস্তক আরও অবনত হইয়া পড়িল । তিনি ক্ষণকাল
নীরবে অবস্থান করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, “চন্দ্রাস্ত হইলেই দস্যুর
আসিবে ।”

বাতায়ন-পথ-দৃষ্ট অস্তপ্রায় নীলাশ্বরবিহারী শশাঙ্কের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া মাধব কহিলেন, “তাহা হইলে আর বেশী বিলম্ব নাই ।”

“আর—”

“আর কি ?”

“উইলখানা সাবধানে রাখিবে ।”

মাধবের ক্রম্বয় পুনরায় কুঞ্চিত হইল ; মুখমণ্ডল আরও গম্ভীর হইল
শরদিন্দুনিভাননা মাতঙ্গিনী দেখিলেন, মাধবের বদনচন্দ্র মেঘাস্তরাণে
লুকাইত হইল । আর সেই মেঘাস্তরালবস্থিত বদন হইতে বজ্রনির্ঘোষ তুলস
মৃদু অথচ গম্ভীর ধ্বনি নিঃসৃত হইল—“ছ” ।

তৎপরে তিনি কক্ষমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া দুইটা বিলাতী লণ্ঠা
জালিলেন । তাহার একটা হেমাঙ্গিনীর হাতে দিয়া কহিলেন, “তুমি
দিদিকে লইয়া মাসীমার ঘরে যাও—এ ঘরে আজ আসিও না ।”

ভগিনীদ্বয় প্রস্থান করিলেন । অতঃপর মাধব কক্ষণকে কহিলেন
“তুমি কাহাকেও কিছু না বলিয়া সনাতনকে সত্বর ডাকিয়া লইয়া
আইস ।”

সনাতন মাধবের প্রিয়ভৃত্য ও অনুচর । অনেক দিন হইতে সনাতন

এই সংসারে চাকুরী করিয়া এক্ষণে পরামর্শদাতার পদ অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মাধবের বাসনামুসারে করুণা কম্পিতদেহে ভীতিবিহ্বল-স্থলিত চরণে সনাতনকে ডাকিতে চলিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, প্রত্যেক অন্ধকারস্তূপের মধ্যে দম্বা মুখ ব্যাদন করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। পূর্বে সে কখন সজীব দম্বা দর্শন করে নাই। অনেক দিন হইতে তদর্শনে তাহার বাসনা বদ্ধবতী ছিল। এক্ষণে তাহার আশু সম্ভাবনার করুণার পদনথর হইতে অবত্ন বিগ্ৰহ কবরীচূড়া পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল।

এ দিকে মাধব আলমারি খুলিয়া একটা ক্ষুদ্রকার টিনের বাস্ব বাহির করিয়া লইলেন; এবং বিশেষ কৌশল অবলম্বন করিয়া গৃহ প্রাচীর অভ্যন্তরস্থ গুপ্ত গহ্বর-দ্বার উন্মোচন করিলেন। গহ্বর হইতে একটা পিস্তল ও টোটা বাহির করিয়া লইয়া তদস্থানে ক্ষুদ্র বাস্বটি রক্ষা করিলেন। অতঃপর গহ্বরদ্বার পূর্ব্ববৎ কৌশল সহকারে রুদ্ধ করিয়া দিয়া কক্ষ বাহিরে আগমন করিলেন।

ক্ষণমধ্যে সনাতন আসিয়া উপস্থিত হইল। করুণাও তাহার পশ্চাতে ছিল। তাহাকে মাসী-মার কাছে প্রেরণ করিয়া মাধব, সনাতনের সহিত কর্ণে কর্ণে কিঞ্চিৎ পরামর্শ করিলেন। সনাতন বহির্কীর্টীতে স্থরিতপদে প্রস্থান করিল। মাধব পিস্তলে ছয়টা টোটা ভরিয়া লণ্ঠন-হস্তে নীচে নামিয়া আসিলেন। খিড়কীর দ্বারে যে কয়টা অর্গল ছিল, তাহা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিলেন; আরও দুইটা দ্বারে অর্গলবদ্ধ করিয়া মাধব পুনরায় দ্বিতলে আসিলেন। শয়নকক্ষদ্বারক্রোড়ে প্রশস্ত বারান্দা। বারান্দার যে অংশ উত্তানের দিকে, সেই অংশে দুইটা বড় বড় জানালা ছিল। এই বাতায়ন-পথে কাহারও আসিবার সাধ্য ছিল না; কেন না, মোটা লোহার গরredায় জানালা সুরক্ষিত। বাতায়নে দাঁড়াইয়া মাধব

কিছুই দেখিতে পাইলেন না ; কেন না, তখন চন্দ্রাস্ত হইয়াছে । মাধব গবাক্ষ দুইটা বন্ধ করিয়া দিয়া বহির্কাটাতে আসিলেন । তথায় দ্বারবান ও ভৃত্যবর্গ যষ্টি ও কুঠারহস্তে সনাতনের আদেশমত দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তাহাদের সংখ্যা বড় বেশী নহে । দ্বারবান দোবে মহাশয় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে আশ্বাস দিয়া বলিতেছিলেন যে, তাঁহার হাতে লাঠি থাকিতে দেশশুদ্ধ লোক বিপক্ষ হইলেও ভয়ের কোনও কারণ নাই । কিন্তু লাঠি কতক্ষণ থাকিবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না । তচ্ছবণে অনেকে আশ্বস্ত হইয়া দোবের গুণানুকীৰ্ত্তন করিতে লাগিল—কিন্তু মৃদুস্বরে ; কেন না, কণ্ঠ বিশুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল । পাণ্ডে ও তেওয়ারি বংশদণ্ড মস্তকোপরি বিঘূর্ণিত করিতে করিতে দস্যুবংশকে ‘স্বপুত্র’ প্রভৃতি উপায়ে নামে আখ্যাত করিতেছিলেন । সনাতন শুধু নীরব ও রিক্তহস্ত ; সে মৃত্তিকা প্রতি নয়ন স্থাপন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিল ।

দেউড়ীতে ফানুসে ঢাকা একটা বড় আলো জ্বলিতেছিল । প্রত্যহ সমস্ত রাত্রিই সেটা জ্বলে ; কিন্তু আজ তাহা মসৌময় হইয়া মিটিমিটি জ্বলিতেছিল । মাধব একজন ভৃত্যকে ফানুসটা পরিষ্কার করিতে অনুজ্ঞা দিলেন । ভৃত্যের হস্তপদাদি এতই কম্পিত হইতেছিল যে, ফানুসটা তাহার হস্তস্থলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পথের উপর সশব্দে পড়িয়া গেল । তদর্শনে একজন বৃদ্ধ গোমস্তা রোষ-পরবশ হইয়া ভৃত্যের গণ্ডে চপেটাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে হস্তোত্তলন করিলেন ; কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার পূর্বেই অন্তর-মহল হইতে এক ভীষণ কলরব উখিত হইল । এই কলরব নারীকণ্ঠ সমুদ্ভূত বলিয়া অনুমিত হইল । কোলাহল শ্রবণমাত্র সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয়স্তর স্তব্ধ হইল । বৃদ্ধ গোমস্তা শূন্যোখিত হস্তটা নামাইয়া লইয়া অতিশয় ক্ষিপ্ততার সহিত অন্ধকার মধ্যে অদৃশ্য হইলেন । মাধব,

সনাতনকে সঙ্গে লইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে অন্তঃপুরাভিমুখে ধাবিত হইলেন ।

সনাতনের একটু পরিচয় প্রয়োজন । সে প্রথম জীবনে একটা দস্যুদলের নায়ক ছিল । একবার কোনও গণ্ডগ্রামে দস্যুতা করিতে গিয়া তাহার দলস্থ জনৈক ব্যক্তি ধৃত হয় । সে তখন পুলিশের শক্তি-প্রভাবে কাতর হইয়া পড়িয়া আত্মদোষ স্বীকার করে এবং তাহার দলপতির নামও ব্যক্ত করে । তৎক্ষণাৎ সনাতনকে ধরিতে পুলিশের সৈন্য সামন্ত ছুটিল । সনাতনের হৃদয়ে তখন তাহার শিশুপুত্রের মুখখানি জাগিতেছিল । পুত্র ও স্ত্রীকে ছাড়িয়া সরকার বাহাদুরের আতিথ্যগ্রহণ করিতে সনাতন অসম্মত হইল ; এবং অন্তোপায় হইয়া তাহার জমীদার মাধবের পিতা রামকানাইবাবুর শরণাপন্ন হইল । জমীদার তাহাকে আশ্রয় দান করিলেন, এবং সাধারণ উপায়ে পুলিশের কবল হইতে মুক্ত করিলেন । সে আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বেকার কথা । মাধব তখন দুই বৎসরের শিশু । সনাতন তদবধি রামকানাই এবং তদপুত্র মাধবের আশ্রয়ে নিরুপদ্রবে বাস করিতেছে । যষ্টি বা বংশধণ্ড হস্তে 'আর গ্রহণ করে নাই ।

সনাতনের বয়স পঞ্চাশৎ বৎসর হইতে পারে ; কিন্তু আজিও তাহার দেহে অমুর শক্তি । যষ্টি চালনার তাহার মত সুদক্ষ ব্যক্তি এতদঞ্চলে পূর্বে আর দৃষ্ট হইত না । কিন্তু সনাতন শপথ করিয়া যষ্টি পরিত্যাগ করিয়াছে । প্রতিজ্ঞা এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার পরীক্ষা সমুপস্থিত । সনাতন জানিত যে, বংশধণ্ডের এমনই মোহিনী শক্তি, যে তদস্পর্শে জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়—মনুষ্য মস্তকের যে কোনও মূল্য আছে তাহা সে সময় স্মরণ থাকে না । তাই সনাতন আজ এই ঘোর পরীক্ষা সম্মুখে চিন্তাবিষ্ট ।

মাধব, সনাতনকে লইয়া অন্ধরমহলে প্রবেশ করিবার পূর্বেই সদর-
 দ্বারে ভীষণ শব্দ হইল। উভয়ে থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং উৎকর্ণ হইয়া
 শুনিলেন। উভয়ে বুঝিলেন, দস্যুরা স্থূল লগুড় বা কাঠখণ্ড দ্বারা
 দ্বারে আঘাত করিতেছে। মাধব একটু অধৈর্য্য, একটু অস্থির হইয়া
 পড়িলেন। ভয়প্রযুক্ত তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কিঞ্চিৎ কম্পিত হইতে-
 ছিল, ইহা সনাতন অনুমান করিল; সনাতন তাঁহার হস্তধারণপূর্বক
 দ্রুতপদে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিল। তখন কোলাহল চতুর্দিকে। সেই
 কোলাহল মধ্যে রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত ভীতিব্যঞ্জক চীৎকার ধ্বনি অতি
 স্পষ্ট শ্রুত হইতেছিল। মাধব ও সনাতন অন্তঃপুরে আসিয়া দেখিলেন,
 দস্যুদল তথায় প্রবেশ করিয়াছে। মাধব বুঝিলেন না, দস্যুরা তথায়
 কিরূপে প্রবেশলাভ করিল; কিন্তু সনাতন তাহা বুঝিল। সে বুঝিল
 যে, দুই একজন দস্যু পাকশালার ছাদের উপর উঠিয়া ভিতরে লক্ষ্যত্যাগে
 পড়িয়াছে এবং খিড়কীর দ্বার খুলিয়া দিয়া সহচরদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া
 আনিয়াছে। খিড়কীর দ্বারে দস্যুরা সংখ্যায় বেশী ছিল; সদরদ্বারে
 কয়েকজন মাত্র থাকিয়া দ্বারবানদের বিনিবৃত্ত রাখিয়াছিল। দস্যুদের
 হাতে বড় বড় লাঠি; কাহারও হাতে বা মশাল; দুই একজন কুঠারও
 আনিয়াছিল।

দ্বিতলে উঠিয়া মাধব দেখিলেন, দুইজন দস্যু তাঁহার শয়নকক্ষে
 প্রবেশ করিয়াছে; এবং আলমারি ভাঙ্গিয়া দ্রব্যাদি চতুর্দিকে নিক্ষেপ
 করিতেছে। সনাতন, মাধবের পার্শ্বেই ছিল; সে যখন দেখিল, মাধবের
 পবিত্র শয়নাগারে দস্যু প্রবেশ করিয়াছে, তখন সে আর স্থির থাকিতে
 পারিল না,—গৃহমধ্যে ক্ষিপ্ৰপদে প্রবেশ করিয়া একজন দস্যুর গলদেশ
 চাপিয়া ধরিল। দস্যু সহসা আক্রান্ত হইয়া স্পন্দরহিত হইল এবং
 সাহায্যলাভাশায় কাতরনয়নে তাহার সহচরের মুখপ্রতি চাহিল। এই

সহচরই দলপতি ; তিনি তখন কাগজাদি অশেষে ব্যস্ত ছিলেন । সন্নীর বিপদ দৃষ্টে দলপতি ক্ষিপ্রহস্তে ষষ্টি উঠাইয়া লইয়া সনাতনকে আক্রমণ করিলেন । সনাতন সময়মত সরিয়া দাঁড়াইয়া আক্রমণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিল ; এবং দস্যুপতিকে পুনঃ আক্রমণ করিতে অবসর না দিয়া নিজেই তাহাকে আক্রমণ করিল । কিন্তু দস্যুরাজ সহজে পরাভব স্বীকার করিলেন না—তিনি আক্রান্ত হইয়াও আক্রমণ করিলেন । ফলাফল কিরূপ দাঁড়াইত বলা যায় না ; কেন না, উভয়ই তুল্য বলশালী । যখন উভয়ের মধ্যে লড়াইটা পূর্ণবেগে চলিতেছে, তখন সহসা পিস্তলের আওয়াজ শ্রুত হইল । দস্যুপতি চমকিয়া উঠিল ; সনাতন এবংবিধ সুযোগ পরিত্যাগ না করিয়া দস্যুপতিকে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করিল এবং তাহাকে ভূপৃষ্ঠে পাতিত করিয়া অশেষ-ভাবে নির্যাতন করিল । তৎপরে ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কক্ষ বাহিরে আসিল এবং দ্বারের শিকল বাহির হইতে টানিয়া দিল ।

এদিকে মাধব যখন শুনিলেন, তাঁহার মাসীমাতার কক্ষদ্বারে দস্যুরা উপস্থাপরি আঘাত করিতেছে, তখন তিনি স্থির থাকিতে না পারিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন । নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, দুইব্যক্তি কুঠার দ্বারা দ্বারে আঘাত করিতেছে ; দ্বার ভগ্নোন্মুখ । মাধব আর মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া পিস্তল উঠাইলেন । গুলি ছুটিল, কিন্তু কেহই আহত হইল না ; প্রাচীর-গাত্রে গুলি প্রবিষ্ট হইল । মাধবের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হইলেও দস্যুদ্বয় ভীত হইয়া পলায়নতৎপর হইল । দ্বিতলে তখন দস্যুরা কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতেছিল ; পিস্তলের শব্দ শুনিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল । তন্মধ্যে এক সূচতুর ব্যক্তি বারান্দা ঘুরিয়া চুপি চুপি মাধবের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং

তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া যষ্টি উঠাইল । যষ্টি পতিত হইবার পূর্বেই সনাতন ছুটিয়া আসিয়া তাহা ধরিয়া ফেলিল । দস্যু ফিরিয়া দেখিল, কালান্তক যমসদৃশ বিপুল বলশালী এক ব্যক্তি তাহার যষ্টি ধরিয়াছে । মাধব বুঝিলেন, সনাতন তাঁহার জীবনরক্ষা করিয়াছে । কিন্তু তখন বাক্যবিনিময়ের অবসর নাই ; কতিপয় দস্যু যষ্টি ও কুঠার লইয়া পিস্তলধারীকে আক্রমণোদ্ভূত হইয়াছে । তাহারা ভাবিয়াছিল, পিস্তলে যে গুলিটা ছিল তাহা বাহির হইয়া গিয়াছে ; আর যে তাহাতে গুলি থাকিতে পারে, তাহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই । কেন না, এতদ্দেশে সে সময় পিস্তল বা রিভলভার আসে নাই । মাধব কলিকাতা হইতে বহুব্যয়ে একটা ক্রয় করিয়া আনিয়া যত্নসহকারে গুপ্তস্থানে রক্ষা করিয়াছিলেন । এমন কি রাজমোহন বা মথুরাবাবু কখন মাধবের গৃহে পিস্তল দেখেন নাই । সম্ভবতঃ তাঁহারা পিস্তলনামা ক্ষুদ্র বন্দুকের অস্তিত্বও অবগত ছিলেন না ।

সনাতন যখন দেখিল, দস্যুরা দুইদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাধবকে আক্রমণোদ্ভূত হইয়াছে, তখন তাহার প্রতিজ্ঞা ধৈর্য্য সকলই ভাসিয়া গেল । যে সূচতুর দস্যু ইতিমধ্যে চুপি চুপি মাধবকে মারিতে আসিয়াছিল, তাহার হস্ত হইতে বলপূর্বক যষ্টি ছিনাইয়া লইয়া সনাতন দণ্ডপাণি কৃতান্তের গ্রাম দাঁড়াইল । তাহার যষ্টি চালনার ভঙ্গী ও কৌশল দেখিয়া দস্যুরা বুঝিল, শত্রু বড়ই প্রবল । তিন চারিজন একত্র হইয়া সনাতনকে আক্রমণ করিল । কিন্তু স্থানের অপ্রশস্ততা হেতু বহুলোকের একত্র আক্রমণের সুবিধা হইল না । দস্যুরা সেটা উপলব্ধি করিবার পূর্বেই এক ব্যক্তি সনাতনের লগুড়াঘাতে ভগ্নহস্ত হইল । এমন সময় ভয়ানক শব্দসহকারে সদরদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল । মাধবের বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল—দস্যুরা প্রোৎসাহিত হইয়া গৃহস্থামীকে আক্রমণ করিল ।

মাধব দ্বিতীয়বার পিস্তল উঠাইলেন । এবারেও তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন । মাধব পিস্তল ক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু শিক্ষালাভ করেন নাই । তৃতীয় উত্তম ঘটনাক্রমে সফল হইল—একজন দস্যু বাহুমূলে আহত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল । মাধব যখন চতুর্থবার পিস্তল উঠাইলেন, তখন তাহার সম্মুখে একজন দস্যুও তিষ্ঠিল না—সকলেই পলায়মান হইল ।

মাধব পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, সনাতনের লগুড়াঘাতে দুই ব্যক্তি ধরাশায়ী হইয়াছে—অবশিষ্ট পলায়নোত্তম । কিন্তু সনাতন দস্যুসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া উত্তম যষ্টিহস্তে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিয়া চলিয়াছে । মাধব দেখিলেন, স্বল্পকাল মধ্যে অস্তঃপুর দস্যুশূন্য হইল । কেবল দুই ব্যক্তি যাহারা সনাতনের লগুড়ম্পর্শ-সুখানুভব করিয়াছিল তাহারা বম্বুধা আলিঙ্গন করিয়া পড়িয়া রহিল । মাধব তাহাদের দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, তাহারা হতচৈতন্য হইয়াছে—প্রাণশূন্য হয় নাই ।

এদিকে সনাতন দস্যুদিগকে তাড়না করিয়া বহির্বাটীতে আনিল । তথায় দেখিল, পাঁড়ে তেওয়ারী যাত্রাদলের খর দূষণের গায় ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন । খর দূষণ যেমন মরিয়া গিয়াও মিটি মিটি চাহিয়া এ-দিক্ ও-দিক্ দেখিতে থাকেন আসরের কে কোথায় তামাকু সেবন করিতেছে, তেমনই পাঁড়ে ও তেওয়ারি মৃত্যুর ভাগ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া অর্কনিমীলিত নেত্রে সমরাজ্ঞের সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন । মহাবীর দোবে ভগ্নপদ হইয়া দস্যুদের ‘স্বপুত্র’ প্রভৃতি নানাপ্রকার মিষ্ট সম্ভাষণে অভিহিত করিতেছিলেন । ভৃত্যদের সকলেই পলাতক । দস্যুদের বাধা দিতে বড় একটা কেহ দণ্ডায়মান্ নাই । কেবল এক অপরিচিত ব্যক্তি লাঠি ঘুরাইয়া দস্যুদের সম্মুখে লক্ষ্মে বক্ষ্মে বিচরণ

করিতেছিল। দস্যুরা তখন লুণ্ঠনে ব্যস্ত—যষ্টিধারীর সহিত বলপূর্ণ-
 ক্ষয় কালক্ষেপ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তি ছিল না। দুই তিনজন
 দস্যু ধঞ্জবৎ চলিতেছিল; ফানুসের কাচ ভাঙ্গিয়া পথের উপর
 পড়িয়াছিল; তদ্বারা তাহাদের পদতল কর্তিত হইয়া বিষম পীড়া
 দিতেছিল।

সনাতন ক্ষণমধ্যে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া লইয়া দস্যুদের পুনরপি
 তাড়না করিল। তাহাদের তাড়াইয়া আনিতেছিল, তাহারা অস্বাভাবিক-
 রূপে চীৎকার করিয়া কহিল, “মাছি লাগিছে।” তচ্ছবণে দস্যুরা
 যে যেখানে ছিল, পলায়নপর হইল। মুহূর্তমধ্যে বিশাল পুরী দস্যুশূণ্ড
 হইল। তখন পাঁড়ে ও তেওয়ারী ভূষণা পরিত্যাগপূর্বক মহাদস্তে
 যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান হইলেন। ভূত্যবর্গ যে যেখানে লুক্কায়িত ছিল, সে
 সেখান হইতে নিম্নুক্ত চক্রেয় গ্নায় প্রকাশমান হইয়া ‘মার’ ‘মার’ শব্দে
 আসরে অবতীর্ণ হইল। চক্রে যেমন কলঙ্ক আছে—নীল আকাশঅঙ্গে
 মেঘ যেমন বিদ্যমান, তেমনই চীৎকারপটু বীরবর্গের কাহারও মস্তকে
 উর্নাত,—কাহারও মুখে মসী, কাহারও অঙ্গে অপরিপূর্ণ আবর্জনা।
 যিনি যেখানে সুবিধা পাইয়াছিলেন, তিনি সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া-
 ছিলেন এবং তীর্থযাত্রীর গ্নায় সেই সেই স্থানের স্মৃতিচিহ্ন অঙ্গে বহন
 করিয়া আনিয়াছিলেন।

সনাতন এই সকল যোদ্ধবর্গের বীরত্বব্যঞ্জক চীৎকারে কর্ণপাত না
 করিয়া যষ্টির উপর দেহভার রক্ষা করতঃ ক্ষণকাল কি ভাবিল; তৎপরে
 পুলিশে সংবাদ দিতে দুইজন ভৃত্যকে পাঠাইল।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।



যে সময়ে মাধবের গৃহে দস্যুদল প্রবেশ করিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে আর একদল দস্যু রাজমোহনের গৃহ আক্রমণ করিয়াছিল। উভয় দলেই এক ব্যক্তির আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতেছিল। এ দ্বিতীয় দলে দস্যু, সংখ্যায় ছয় জন মাত্র। তাহারা স্বল্প আয়াসে রাজমোহনের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের দ্বার ভাঙ্গিল। মাতঙ্গিনী গৃহত্যাগকালে বাহির হইতে ভিতরের অর্গল বন্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে দস্যু পদাঘাতে দুর্বল কাষ্ঠকীলক ভাঙ্গিয়া পড়িল। দস্যুরা কক্ষস্থ দ্রব্যনিচয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া শয্যা ও শয্যাতল অন্বেষণ করিতে লাগিল। যাহা খুঁজিতেছিল তাহা না পাইয়া কক্ষান্তরের দ্বার ভাঙ্গিল। পুরমহিলা প্রভৃতি ইতিমধ্যে জাগরিত হইয়া নিশ্বাসাদি রোধ করতঃ উৎকর্ণ ও উদ্গ্রীব অবস্থায় শায়িতা ছিলেন। যখন তাঁহাদের গৃহদ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন তাঁহারা কলরব ছাড়া আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। রাজমোহন গৃহে ছিলেন না ; তিনি তখন মাধবের গৃহের অনতিদূরে নিভৃতস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া উৎকর্ণ অবস্থায় ভীতচিত্তে পিণ্ডলের আওয়াজ শুনিতেছিলেন। সুতরাং তিনি এই অযাচিত অতিথিবর্গের আগমন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। দস্যুরা কোন দ্রব্য অপহরণ করিল না, কাহাকেও কিছু বলিল না ; কেবল পাতিপাতি করিয়া চারিদিকে একটা মানুষ বা দ্রব্য খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। যখন তাহা পাইল না, তখন ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিল।

দ্বারভঙ্গ শব্দে কনক ও তাহার মাতার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল । তাহারা নীরবে উৎকর্ণ হইয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল । জ্বীলোকের কণ্ঠনিঃসৃত কাতরধ্বনিও মধ্যো মধ্যো তাহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছিল । যে বালক দিবাভাগে জ্যেষ্ঠাগ্রজের মস্তাধার শূন্য করিয়া মসীময় হইয়াছিল, তাহার ক্রন্দনধ্বনিও শ্রুত হইতেছিল । দস্যুরা কোনরূপ চীৎকার করে নাই বটে, কিন্তু তাহাদের পদধ্বনি ও দ্বারভঙ্গের শব্দে প্রতিবেশীদের মধ্যে অনেকেই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটয়াছিল ; অনেকেই কনক ও তাহার মাতার শ্রাব্য পার্শ্বপরিবর্তনাদির দ্বারা শয্যায় কোনরূপ শব্দ না করিয়া নিঃশ্বাসাদি রোধ করতঃ নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া রহিল । কনকের মাতা যখন দেখিল, চতুর্দিক নিস্তব্ধ হইয়াছে—ঝিল্লীরব ছাড়া বড় একটা আর কিছুই শ্রুত হইতেছে না, তখন কণ্ঠ চাপিয়া অতি মৃদুস্বরে ডাকিল, “হ্যাঁ রে, কনকি ?”

কনক তদ্বৎ চাপা কণ্ঠে কহিল, “মা জেগেছ ?”

“ময়, আমি ঘুমলুম কখন ?”

“মা, ব্যাপার কি ?”

“চুপ্ কর ।”

“তুমি গিয়ে একবার দেখে এস না ।”

“মরণ আর কি, আমি গিয়ে হাঙ্গামায় পড়ি ।”

“এখন ত সব চুপ হয়েছে—একবার যাও না-।”

“তোমার যেমন কথা ; গোল হ’তে কতক্ষণ !”

ঝঙ্ককণ্ঠে বাক্যালাপ করিয়া কনকের কণ্ঠটা একটু কাতর হইয়া পড়িয়াছিল । তাহাকে একটু বিশ্রাম দিয়া কনক জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপারটা কি বুঝেছ ?”

কনকের জননী সাতিশয় কোপাঘ্নিতা হইয়া উত্তর করিলেন, “আমি

কি চোখের মাথা খেয়েছি যে, ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি।—তুই যেমন আবাগী কুলীনে পড়েছিস্ ।”

কনক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, তাহার মাতা কিরূপে এই অন্ধকার-ময় গৃহে শয্যা শয়িতা থাকিয়া দূরবর্তী ঘটনাটা চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করিল ; আর সেই বা কুলীনে পড়িয়াছে বলিয়া কিরূপে উক্ত কার্যে অসমর্থ হইল । জিজ্ঞাসা করিল, “কি বুঝেছ মা ?”

প্রসূতি উত্তর করিলেন, “তোমার যেমন পোড়া কপাল ! কথাটা বুঝতে পারিলি নি ? রাজুর বউ কেলেঙ্কারি করেছে—ধরা পড়েছে—এখন রাজুর হাতে তার শ্রদ্ধ হছে ।”

কণ্ঠটা যে রোধ করিতে হইবে ইহা বিস্মৃত হইয়া কনক সহজ গলায় কহিল, “ও মা, কি ঘেন্নার কথা ! তা’র পেটে এত বিড়ে ? না, না, তা’ হ’তে পারে না—তুমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝ নি ।”

“দেখ কনক, তোমার মুখ ঝাঁটিয়ে দেব ; আমার কথার উপর আবার কথা ।”

কনক নিরুত্তর হইল । তাহার মাতা ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া যখন দেখিল, কনক আর কথা কয় না, বাহিরেও আর কোনরূপ গোলমাল শ্রুত হয় না, তখন সে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল । এবং দ্বারসান্নিধ্যে আসিয়া কপাটের পৃষ্ঠে কৰ্ণসংযুক্ত করিয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিল । তৎপরে কহিল, “হঁয়ারে কনক, একবার দেখে আস্ব ?”

কন্যা বুঝিল, জননীর কোতূহল-প্রবৃত্তিটা সাতিশয় বলবতী হইয়া ভয় নামক পদার্থকে বিনাশোত্ত হইয়াছে । কন্যা উত্তর করিল, “তোমার ইচ্ছে ।”

“আমার ইচ্ছে নয়ত কি তোমার ইচ্ছে ? বলি, একবার গিয়ে দেখুক বউটা বেঁচে আছে কি না ?”

“আমি জানি নে ।”

“আমার যেমন পোড়া কপাল, তাই তোমার মত মেয়ে পেটে ধরেছিলুম ।”

কন্যা বাঙনিপ্পত্তি করিল না ; জননী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দ্বারপার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন । এমন সময় গৃহকোণে তৈজস-পত্রাদির মধ্যে মূঢ় শব্দ হইল । কন্যা “ওই, মা” শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল ; জননী দ্বিক্রান্তি না করিয়া স্থলিত-বসনে সশব্দে ধরাশায়ী হইলেন । ক্ষণপরে উভয়ে বুঝিল, এ শব্দের জন্ত মুষিক বা তৈলপায়ী দায়ী । তখন জননী অশেষ সাহস পূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্থলিত বসন সংযত করিয়া লইয়া কন্যাকে কহিলেন, “আ মর্, ভয় দেখো ! তোমার জালায় কি আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্ব ?”

কন্যা বাঙনিপ্পত্তি করিল না । জননী দ্বারপার্শ্বে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া কন্যাকে বিবিধ মিষ্ট সম্ভাষণে অভিহিত করিতে লাগিলেন এবং নিজ অদৃষ্টকে বহু ধিকার দিতে লাগিলেন । কন্যা অবশেষে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি আমাকে গিয়ে দেখতে বলছ ?”

অন্ধকারের ভিতর হস্তমুখের নানারূপ অভিনয় করিতে করিতে জননী উত্তর করিলেন, “হাঁ, তুমি গিয়ে আবার একটা কেলেঙ্কারি কর গে ; হাত পা শুড়্ শুড়্ করছে, না ? মর্, মর্, পোড়াকপালি মেয়ে ! আমি না জানি কত পাপ করে এসেছিলুম, তাই এ জন্মে তোমার মত মেয়ে পেটে ধরেছিলুম—পোড়া পেটে আগুন জ্বলে দি ।”

অগ্নিকার্য্যাদি ব্যাপারে কিছুমাত্র লিপ্ত না থাকিয়া অদৃষ্টবাদিনী স্বীয় কর্মফল মানিতে মানিতে অতি সন্তর্পণে দ্বারোদ্বাটন করিলেন । বাহিরে নিবিড় অন্ধকার, কিছুই দৃষ্ট হইল না । তিনি ঘর ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দাবায় নামিলেন এবং সতর্কনয়নে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে ছই

এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন । রাজমোহনের গৃহ সন্নিকটবর্তী হইতে না হইতে তিনি পরিচিতা প্রতিবেশিনীগণের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন । তখন দুর্জয় সাহস তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল । তিনি দ্রুতপাদবিক্ষেপে রাজমোহনের গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন ।

তথায় প্রতিবাসী নরনারী অনেকেই সমবেত হইয়াছিল । তবে রমণীর সংখ্যাই বেশী । সেই সভাক্ষেত্রের প্রধান বক্তৃতা রাজমোহনের পিসী । তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি নানারূপে আন্দোলন করিতে করিতে সেই সভ্যমণ্ডলীর নিকট পরিচয় দিতেছিলেন, দস্যুরা কিরূপে দ্বার ভাঙ্গিয়া তাঁহার পেটরাবদ্ধ অলঙ্কারাদি অপহরণ মানসে আসিয়াছিল এবং কিরূপে তাঁহার গালি খাইয়া পেটরা পরিত্যাগ পূর্বক ভয়বিহ্বল চিত্তে পলায়ন করিয়াছে । তিনি দস্যুদের কি কি বলিয়াছিলেন, তাহারও একটু পরিচয় দিলেন ; এবং তিনি আজ পুরুষ মানুষ হইলে কিরূপ বীভৎস ব্যাপার তাঁহার দ্বারা সংঘটিত হইত, তাহারও একটা কাল্পনিক দৃশ্য অঙ্কিত করিতে বিরত হইলেন না । তাঁহার সদ্বক্তৃত্ব প্রভাবে সমগ্র জনমণ্ডলী মুগ্ধ ও রোমাঞ্চিত হইল । রাজমোহনের বিধবা ভগিনী কিশোরী পুত্র দুইটীকে অন্ধমধ্যে লইয়া কম্পিত দেহে সন্নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন । তাঁহার কণ্ঠ এতই শুষ্ক হইয়াছিল যে, তিনি বীরত্বব্যঞ্জক কোনরূপ বক্তৃতার অবতারণা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন । এবং তদ্ব্যতীত বড়ই মনঃপীড়া পাইতেছিলেন ।

পিসীমার নিকটে মৃন্ময় পাত্রে এক দীপ জলিতেছিল । ঝটিকাঘাতে অকস্মাৎ তাহা নির্কাপিত হইল । অন্ধকার নিকটেই ছিল—ছুটিয়া আসিয়া গৃহ প্রাঙ্গণ অধিকার করিল । তখন তাবৎ জনমণ্ডলী অক্ষুট ভীতিব্যঞ্জক ধ্বনি করিয়া পরস্পরের অঙ্গ জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন । তাঁহারা পলায়ন পূর্বক আত্মরক্ষা করিবেন এরূপ সামর্থ্যও তাঁহাদের

রহিল না । অন্ধকার-স্তূপের মধ্যে তাঁহারা দস্যুবদন প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে দেখাইতে লাগিলেন । পিসী-ঠাকুরাণীর বক্তৃতা-শ্রোত সহসা রুদ্ধ হইল ; তিনি পুরুষ হইলে কি করিতেন তাহাও বিস্মৃত হইলেন । আড়ষ্ট হইয়া ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন ; অবশেষে তাঁহার দাঁড়াইবার শক্তি বিলুপ্ত হইল । তিনি ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িয়া কিশোরীকে শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, “আলোটা জেলে নিয়ে আয় ।”

কিশোরীর কণ্ঠ শুষ্কতর হইয়াছিল । আলোক-সম্মুখে তাঁহার যে শক্তিটুকু ছিল, আলোকের তিরোধানে তাহা লয়প্রাপ্ত হইল । ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর ঞ্চায় তাঁহার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল ; এবং স্বেদোদগমে তাঁহার বক্তৃতা সিক্ত হইল । তিনি পুত্রহইটাকে অঙ্কোপরি টানিয়া লইয়া স্তিমিত নেত্রে উপবিষ্টা রহিলেন ।

এমন সময় তথায় রাজমোহনের আবির্ভাব হইল । কিন্তু কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না । দেখিতে পাইলে একটা বিভ্রাট বাধিয়া যাইত ; কেন না, তখন সকলেই দস্যু-আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । অসিতবর্ণ বিপুলকার রাজমোহনকে সেই অস্পষ্ট অন্ধকারের ভিতর দর্শন করিলে সকলেই তাহাকে দস্যু বলিয়া মানিয়া লইতেন ; রাজমোহন আত্ম-পরিচয় দিলেও কেহ তাহা বিশ্বাস করিতেন না । ভগবৎ কৃপায় রাজমোহনকে কেহ দেখিতে পাইল না ।

রাজমোহন কিছু পূর্বে আত্মকাননপ্রাপ্তে কতিপয় পলায়মান দস্যুর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন । তাহাদের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলেন, দস্যুরা মাধবের গৃহে কিরূপে লাক্ষিত হইয়াছিল । দলপতি প্রভৃতি কয়েকজন ধৃত ও আবদ্ধ হইয়াছে, ইহাও তিনি তাহাদের নিকট অবগত হইয়াছিলেন । এবিধ সংবাদ রাজমোহনের নিকট শুভ বলিয়া একেবারেই মনে হইল না । তিনি মানস নগনে দেখিলেন, ধৃত দস্যুরা পুলিশের

প্রহার-প্রভাবে অপরাধ স্বীকার করিতেছে এবং রাজমোহনকেও এ ব্যাপারে লিপ্ত করিতেছে । রাজমোহনের সমস্ত দেহ কম্পিত হইল—স্বেন্দোদগমের প্রাচুর্য্যে কিছু বিব্রত হইয়া পড়িলেন । কাননের অন্ধকার মধ্যে একাকী দণ্ডায়মান থাকিয়া নিজের অবস্থা পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । ভাবিলেন—“পলায়ন পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করি । কিন্তু পলায়ন করলেই কি রক্ষা পাব ? চেষ্টা দেখলে ক্ষতি কি ? শুনেছি—পৃথিবীটা বড়—আমার জন্তে কি কেথোও একটু স্থান হবে না ? এখানে থাকলেত সম্ভবই শ্রীঘর অথবা দ্বীপান্তরবাসী হ’তে হ’বে । আপাততঃ দেশেই যাই ; কিন্তু একাকী । পিসীকে বলে যাওয়া কর্তব্য ; নইলে মাগী দেশ মাথায় করবে । তা’ ছাড়া একটা কাজ তাদের দিবে হাসিল করতে হবে—মাগী গুলোকে শিথিরে দেব, আমি আজ তিন চার দিন দেশে চলে গেছি । দেখি কি হয় । জেলখানায় সহজে যাব না ; শুনেছি জেলখানাটা বড় গরম—আমিত হাঁকিরে মারা যাব—তবে কেউ যদি বাতাস করে, তা’হলে না হয় ছ’চারদিন থাকা যায়—তা’ বেটাদের ত দয়া ধর্ম্ম নাই ।”

• রাজমোহন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।

তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, অন্ধকারময় প্রান্তরে বহু মনুষ্য-মূর্ত্তি দণ্ডায়মান রহিয়াছে । দাবাতেও যেন কেহ কেহ অবস্থান করিতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হইল । রাজমোহন স্থির করিলেন, তাহারা পুলিশের লোক—তাঁহারই অনুসন্ধান আসিয়া বাড়ী ঘিরিয়াছে । নতুবা এত রাত্রিতে এত লোক তাঁহার গৃহে কেন ? রাজমোহন আর কালবিলম্ব না করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ।



পরদিন প্রভাতে গ্রামের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া গেল। রাস্তা ঘাটে বৃক্ষতলে নরনারী সমবেত হইয়া জমীদার-বাটীর ডাকাতি কথা নানাভাবে ও ভঙ্গীতে আলোচনা করিতে লাগিল। যাহারা জমীদার-গৃহ পর্য্যন্ত যাইতে সাহস পাইয়াছিল, তাহারা তথা হইতে কিছু কিছু সংবাদ আহরণ পূর্ব্বক টীকা টিপ্পনীসহ গ্রামময় প্রচার করিতে লাগিল। ইহা সত্ত্বর রাষ্ট্র হইল যে, মহাবীর দোবে একপঞ্চাশৎ দস্যুর সহিত একাকী লড়াই করিয়া অবশেষে ভগ্নোক্ত দুর্ঘ্যোধনের শ্রায় রণাঙ্গনে গড়াগড়ি দিতেছেন। পাঁড়ে ও তেওয়ারির বীরত্বব্যঞ্জক নানাকথাও চারিদিকে শ্রুত হইল; তাঁহাদের ডাকাইতরা সভয়ে অগ্রেই বাধিয়া ফেলিয়াছিল, নতুবা তাঁহারা দস্যুবংশ নির্মূল করিয়া ছাড়িতেন, এরূপও শ্রুত হইল। সনাতন নিতান্ত কাপুরুষ, যষ্টিগাছটাও হস্তে গ্রহণ করে নাই। এক অপরিচিত ব্যক্তি শূন্যমার্গ হইতে লক্ষপ্রদান পূর্ব্বক যষ্টিহস্তে প্রাক্গণে পড়িয়া সাতাইশ জন ডাকাইতের মস্তক দেহচ্যুত করিয়াছে এবং উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়াই আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে। ছোটবাবু—মাধব—কামান ও বন্দুক দাগিয়া একশত উনত্রিশ জন দস্যুকে ভস্মে পরিণত করিয়াছেন।—এবংবিধ নানা কথা গ্রাম্যমধ্যে মুহূর্ত্তে প্রচারিত হইল। একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিত ভবিষ্যতে ইতিহাস লিখিবার আশায় এই সকল সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন।

এ দিকে জমীদার-বাটীর ভগ্নস্থার সান্নিদেশে দারোগাবাবু যখন হাটকোট পরিধৃত হইয়া অথ হইতে সদর্পে অবতরণ করিলেন, তখন

গ্রামের যাবতীয় পুরুষ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রমণীবৃন্দ স্থানে স্থানে কমিটি করা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না । তবে বর্ষিয়সীরা কতকটা অগ্রসর হইয়া দারোগাবাবুর ঘোড়া ও লাল পাগুড়ীওয়ালী দুই চারিজন সিপাহী দেখিয়া লইলেন ; এবং তাহারই ইতিহাস নানারূপ কণ্ঠ ও চক্ষুভঙ্গীতে নবীনাদিগের মধ্যে প্রচার করিতে লাগিলেন । কোনও কোনও প্রাচীনা দুই চারিটা ডাকাইতির উপাখ্যানও এতদসঙ্গে বিবৃত করিতে লাগিলেন । যাহারা এতদ্বিষয়ে অসমর্থ হইলেন, তাহারা উপন্যাস-লেখকদিগের গ্রন্থ কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিলেন ; এবং অলীকতর ঘটনার প্রত্যেক নব সংস্করণ পরিপুষ্ট করিতে লাগিলেন ।

এ দিকে প্রবলপ্রতাপ দারোগাবাবু, জমীদারবাবুর বৈঠকখানায় মধ্যাহ্ন ভাস্করতুল্য দীপ্যমান হইতে লাগিলেন । তথায় গ্রামের অনেক ভদ্রলোকই উপস্থিত ছিলেন । অনেকেই ছিলেন, কিন্তু বড়বাবু—মথুর—ও রাজমোহন ছিলেন না । দারোগাবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া রাজমোহনের অশ্বেষণার্থে জনৈক সিপাহীকে প্রেরণ করিলেন । সিপাহী স্বল্পকাল মধ্যে কিরিয়া আসিয়া কহিল, রাজমোহনবাবু পূর্বরাত্রি হইতে বাড়ী আইসেন নাই । দারোগাবাবু গাঙ্গীর্য্য অবলম্বন পূর্বক ক্রকুঞ্চিত করিলেন । দেখাদেখি অনেকেই গাঙ্গীর হইলেন এবং ক্রকুঞ্চে মনোযোগ প্রদান করিলেন ।

চারিজন দস্যু ধৃত হইয়াছিল । নীচের একটা ছোট ঘরে তাহারা আবদ্ধ ছিল । দারোগাবাবু ধূমপানাদি সমাপন করিয়া দেহ উত্তোলন পূর্বক তাহাদের দর্শন করিতে চলিলেন । কতিপয় গ্রহাদিও তাহার অনুগমন করিল ।

যে দুইজন দস্যু, সনাতনের লগুড়ের আশ্বাদন পাইয়াছিল, তাহারা

শয়ান ছিল। অপর দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন দলপতি, অন্যজন তাহার সহচর। শেষোক্ত দুই ব্যক্তির হস্তপদ স্থল রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ এবং কটিদেশেও মেথলারূপে রজ্জু শোভা পাইতেছিল। যে দুই ব্যক্তি শয়ান ছিল, তাহাদের বন্ধনের কোনও প্রয়োজন ছিল না; কেন না, তাহারা উত্থানশক্তি বিরহিত।

দারোগামহাশয় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দস্যুপতিকে তীক্ষ্ণনয়নে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে স্মৃতিশক্তিকে মার্জিত করিবার অভিপ্রায়ে বস্ত্রমধ্য হইতে একখানি পুস্তিকা বাহির করিলেন। পুস্তিকার পত্র উল্টাইতে উল্টাইতে একস্থানে আসিয়া থামিলেন। পুস্তিকায় যে বিবরণ লিখিত ছিল, তাহা হইতে সম্ভবত দস্যুপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন; তিনি সোল্লাসে কহিলেন, “আজ আমার সুপ্রভাত রঘুনাথ! বহুদিন হইতে তোমার সন্ধান চলিতেছে, কেহ তোমাকে পায় নাই।”

দস্যুপতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, “পেয়েছ বটে, কিন্তু ধরে রাখতে পারবে কি?”

“তা’ দেখা যাবে।” বলিয়া দারোগা মহাশয় তদন্তে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রমাণের কোন অভাবই ছিল না। করুণা, সনাতন প্রভৃতি অনেকেই সাক্ষ্য দিল। দারোগাবাবু তাহাদের একে একে নিভৃতে আহ্বান করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে লাগিলেন। মাধব বলিলেন, “তাঁহার খুল্লাতাতেই উইল অপহরণই দস্যুদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।” দারোগাবাবু তচ্ছবণে একটু কোতূহলী হইলেন; কিন্তু তৎকালে তিনি কোতূহল প্রকাশ করিলেন না।

দারোগাবাবু লোকটী নিতান্ত মন্দ নহে এবং কর্মচারী হিসাবেও তিনি অনেক ভাল। মকদ্দমার ‘কিনারা’ বা ‘আস্কারা’ করিতে অথবা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে তিনি কখন অস্বস্তি করিতেন না;

এবং তদ্ব্যতীত বে-আইনি কিছু করিবার প্রয়োজন হইলে তাহাতেও তিনি পশ্চাদ্দপদ হইতেন না । জিদ নামক জিনিষটা তাঁহার কিছু বেশী মাত্রায় ছিল । বর্তমান মকর্দমায় এই জিদ অতি প্রবলভাবে দেখা দিল । তিনি বিপুল উৎসাহের সহিত মাধবকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “আপনি নিশ্চিত থাকিবেন ছোটবাবু, আমি মূল আসামীদিগকে ধরিব ।”

এবস্থিধ প্রবোধবচনে ছোটবাবু আশ্বাসিত হইয়া দারোগাবাবুর সংকারে মনোনিবেশ করিলেন । দেখিলেন, সনাতন সকল ব্যবস্থাই করিয়াছে । মৎস্য, ঘৃত, দুগ্ধ অপৰ্যাপ্ত পরিমাণে আহৃত হইয়াছে । দারোগাবাবু সদলবলে আহারাঙ্গি সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মাধবের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, দেওয়াল-আলমারীর সব নীচের দেওয়ালটা ভগ্ন ও তন্মধ্যস্থিত দ্রব্যাদি চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত । চতুর্দিক তীক্ষ্ণদর্শনে দর্শন করিতে করিতে তিনি দেখিলেন, গৃহ-বাতায়নের লৌহগরেদার প্রতি নিফল বল প্রযুক্ত হইয়াছে । বাতায়নের একটা স্থল লৌহকীলক ভগ্নাবস্থায় সন্নিকটে পতিত রহিয়াছে ; এবং বাতায়নের সেই উন্মুক্তস্থানে মনুষ্যদেহ প্রবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া দারোগা বাবু অনুমান করিলেন । অনুমানটা মিথ্যা নহে ; কেন না, সেই উন্মুক্ত স্থানের ভিতর দিয়া পলায়নের যে একটা বিপুল চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহার নিদর্শন পার্শ্ববর্তী কীলকগাত্রে রক্তাকারে লিখিত রহিয়াছে ।

সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দারোগাবাবু এক নির্জন কক্ষে আসিয়া মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার খুড়ার উইলখানি সম্ভবত নীচের দেওয়ালে ছিল ?”

মাধব উত্তর করিলেন “হাঁ ।”

দারোগা । অপরে তাহা জানিত কি ?

মাধব । তাহা আমি ঠিক জানি না ।

দারোগা । রাজমোহনবাবু জানিতেন কি ?

মাধব । সম্ভবত জানিতেন ।

দারোগা । আপনি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবেন না ; গোপন করিলে ফল সুবিধাজনক হইবে না । উইলখানি চুরি গিয়াছে কি ?

মাধব । না ।

দারোগা । কিরূপে রক্ষা পাইল ?

মাধব । আমি পূর্বাঙ্কে সংবাদ পাইয়া উহা স্থানান্তরিত করিয়াছি ।

দারোগা । কে আপনাকে সংবাদ দিল ?

মাধব । ক্ষমা করিবেন—তাহার পরিচয় আপনাকে দিতে পারিব না ।

দারোগা বাবু ক্রুদ্ধিত করিয়া ক্ষণকাল মৌনী হইয়া রহিলেন ; তৎপরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার খুড়ী কোথায় ?”

মাধব । কাল প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমার গৃহে ছিলেন ।

দারোগা । এখন কোথায় ?

মাধব । শুনেছি বড় বাড়ীতে ।

দারোগা । হুঁ—আপনাকে বলে গেছেন কি ?

মাধব । না ।

দারোগা । উইল নিয়ে আপনার খুড়ী কোনও গোলযোগ বাধাবার অভিপ্রায় করেছেন বলে আপনার মনে হয় ?

মাধব । তিনি সম্প্রতি আমার বিরুদ্ধে মকদ্দমা স্থাপন করে বলেছেন, উইল জাল ।

দারোগাবাবুর বদনচন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । তিনি পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার শালী কোথায় ?”

মাধব চমকিয়া উঠিলেন ; একটু বিবেচনা করিয়া উত্তর করিলেন,
“আপনার তাহাতে প্রয়োজন ?”

দারোগা । একটু প্রয়োজন আছে, পরে তাহা উপলব্ধি করিবেন ।

মাধব । তিনি আমার গৃহে আছেন ।

দারোগা । তিনি কি আপনার গৃহে থাকেন ?

মাধব । না ।

দারোগা । গত রাত্রিতে সম্ভবত আসিয়া থাকিবেন ?

মাধব । সেটা ঠিক বলিতে পারি না ।

দারোগা । আপনি আমার নিকট কথা গোপন করিতেছেন । এটা আপনার পক্ষে অনুচিত হইতেছে ; কেন না, আপনার চতুর্দিকে যে চক্রান্তজাল বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা ছিন্ন করিতে আমি উদ্যত হইয়াছি ।

মাধব । তজ্জগৎ আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ । কিন্তু আমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করি না, অথবা সঠিক জানি না, তাহা কিরূপে কহিব ?

দারোগা । আপনি সকলই জানেন ; জানেন না শুধু, রাজমোহন কত বড় দুর্বৃত্ত । আমি বহুদিন হইতে জানিয়াছি, সে চোরাই মাল লুকাইয়া স্রাখে এবং দস্যুদিগের নিকট হইতে তাহার অংশ গ্রহণ করে । আমার বিশ্বাস, আপনার বাড়ীর ঘটনাটি তাহারই যোগাযোগে হইয়াছে । রাজমোহন ব্যতীত অপর কেহ জানিত না, উইল কোথায় রক্ষিত ছিল এবং আমার বিশ্বাস, সে ইহা দস্যুদিগকে কহিয়া দিয়াছে ।

মাধব । তাহার স্বার্থ ?

দারোগা । অর্থ ।

মাধব । কে অর্থ দিবে ?

দারোগা । তাহা এক্ষণে বলিব না ।

মাধব । আপনি বোধ হয় আমার খুড়ীকে সন্দেহ করিতেছেন ?

দারোগা । না ; আমার ধারণা, তিনি একজন বড় খেলওয়ার্ডের
[হাতে বন্দ মাত্র ।

মাধব । তবে কি মথুর দাদার কথা বলিতেছেন ?

দারোগাবাবু উত্তর না করিয়া একটু হাসিলেন মাত্র ।

মাধব বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন । দারোগাবাবু গাত্রোথান
করিয়া একটু হাসির সহিত মুকুবি চালে কহিলেন, “আপনার বয়স বেশী
নহে—এ দেশেও বড় বেশী থাকেন না ; সুতরাং এ দেশের লোকেদের
আপনি ভালরূপ চিনেন না । আমি এই জেলাতে জীবন কাটাইলাম,
প্রায় সকল বদ্মায়েসই আমার নিকট পরিচিত । প্রমাণভাবে কেবল
তাহাদের টানাটানি করিতে পারি না । হাকিমগুলো যে আহান্নক,
নইলে কি কুই কাংলা ছাড়িয়া চুণো পুঁটির পিছনে ছুটিয়া বেড়াই ? যা’
হোঁক দেখা যাউক, এবার কি হয় ।”

দারোগাবাবু এইরূপে মৎস্ত উপঢৌকন দিয়া সন্দলবলে প্রস্থান
করিলেন । অবশ্য দম্বা-চতুষ্টয়কে সঙ্গে লইয়া গেলেন । যে দুই ব্যক্তি
উত্থানশক্তি-রহিত ছিল, তাহাদের ডুলি করিয়া লইয়া গেলেন এবং বথা-
কালে হাঁসপাতালে প্রেরণ করিলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ।



শরীর ও মনের উপর নানারূপ অত্যাচার প্রযুক্ত মাতঙ্গিনী পীড়িত হইয়া পড়িলেন । প্রথমে সামান্য জ্বর দেখা দিল—গ্রাম্য ডাক্তারই চিকিৎসা করিতে লাগিলেন । কিন্তু রোগ ফিভার মিক্‌চারে বাধা মানিল না—উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । তখন দূরবর্তী মহকুমা হইতে একজন এম, বি উপাধিধারী চিকিৎসককে আনান হইল । এই ডাক্তারটি গলদেশে রঙ্গীণ ফিতার ফাঁস লাগাইয়া এবং দেহোপরি ছাট-কোট বুট প্রভৃতি চড়াইয়া বিপুল দেহ লইয়া আসিয়া দর্শন দিলেন । তাঁহার আয়ুধ আদিরও কোন অপ্রতুলতা ছিল না ।—বামে চঞ্চলা খার্মিটার, দক্ষিণে দ্বিভুজা ষ্টেথোস্কোপ ।

ডাক্তারবাবুর এস্থলে একটু পরিচয় প্রদান না করিলে পাতকগ্রস্ত হইতে হইবে ; অতএব কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম । ইনি শুধু ডাক্তারি করেন না—অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্যও করেন । তদ্ব্যতীত দুই পরমা হয় কিনা জানি না ; কিন্তু পরশ্রীকাতর বিশ্বনিন্দুকেরা কহিয়া থাকে, বাদী আসামীর গৃহে রোগ না থাকিলেও ডাক্তারবাবুর তথায় ডাক পড়ে এবং চারি টাকার স্থলে আট টাকা দক্ষিণাও প্রাপ্তি হয় । এই হাকিমের নাম ডাক যথেষ্ট আছে । আসামী হইয়া তাঁহার বিচার বেষ্টনীর মধ্যে সহজে কেহ আসিতে চাহিত না ; তা' মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেট ছাড়িতেন না—বাহাতে দুই চারিটা সুবিধাজনক মর্কদ্দমা এই হাকিম প্রবরের নিকট আসে তদ্বিবরে তিনি যত্ববান্ হইতেন ; কেন না,

ম্যাজিষ্ট্রেট বাবুর কোন ভৃত্যের রাত্রি বিপ্রহরে শিরঃপীড়া ঘটিলে ডাক্তার বাবু মুক্তকচ্ছ অবস্থায় ছুটিয়া আসিয়া তাহার সেবায় ব্রতী হইতেন । একরূপ সজ্জন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত না করিয়া ক্ষুণ্ণ করিলে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মহাপাতকে নিমজ্জিত হইতেন ।

এবস্থিধ দ্বিগুণাত্মিক ডাক্তার-হাকিম আসিয়া মাধবের গৃহে দর্শন দিলেন । মাধব তাঁহার বিপুল দেহ দেখিয়া অশ্বস্ত হইলেন, রোগিনী সত্বর আরোগ্যলাভ করিবেন । অতীব যত্নসহকারে বৈঠকখানায় বসাইয়া মাধব তাঁহার জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন । ডাক্তার বাবু তদুপস্থিতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করত কহিলেন, “ও-সব রেখে দিন—রোগী কোথায় চলুন—আমাকে এখনি যেতে হবে—আমার কাইলে আজ পাঁচটা মকর্দমা ।”

ডাক্তার বাবুর সকল কথা শ্রোতৃবর্গ উপলব্ধি করিয়া উঠিতে পারিলেন না । কেন না, কথা কয়টা বিকৃতকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছিল । ইহাতে ডাক্তার বাবুর বিশেষ কোন অপরাধ দৃষ্ট হয় না ; দোষ তাঁহার কণ্ঠ-বেষ্টনী কলারের । এই জিনিষটা এত আঁটিয়া ডাক্তার বাবুর গলার বসিয়াছিল যে, তাঁহার গ্রীবা পরিচালনার শক্তি তিরোহিত হইয়াছিল—বাক্যাদিও সহজকণ্ঠে উচ্চারিত হইবার উপায় ছিল না । তদ্ব্যতীত ডাক্তার বাবুর কোনরূপ মনঃপীড়া ছিল না ; কেন না, তিনি স্থির জানিতেন যে, এই কণ্ঠবেষ্টনী তাঁহার বদনমণ্ডলের সবিশেষ সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছে । এ সম্বন্ধে কোন নবীনা, সম্বন্ধে ডাক্তার বাবুর কেলিকুঞ্চিকা—তাঁহাকে অগ্নায়রূপে পরিহাস করিয়াছিলেন । তদন্তরে ডাক্তার মহোদয় কহিয়াছিলেন, “হে শ্যালী, একরূপ পরিহাস তোমাদের শোভা পায় না ; যদ্ব্যতীত তোমরা কণ্ঠদেশে ‘চিক্’ নামা অলঙ্কারের আলিঙ্গন ধারণপূর্বক আড়ষ্ট হইয়া পুত্তলিকাবৎ উপবিষ্ট থাক ।”

আমরা উত্তমরূপে অবগত আছি, এ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে অত্যাধিক কলহ চলিতেছে ।

ডাক্তার বাবু রোগিনীকে দেখিলেন—যন্ত্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করিলেন—যথেষ্ট পরিমাণে গস্তীর হইলেন—অধর বিস্তৃত করিয়া সম্ভবমত উল্টাইলেন—ব্যবস্থাপত্র লিখিলেন—অবশেষে মোটা দক্ষিণা লইয়া প্রস্থান করিলেন । কিন্তু রোগিনী কোন উপকার প্রাপ্ত হইলেন না । ডাক্তার বাবু তিন চারি দিন যাতায়াত করিলেন, কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । অবশেষে মাধব জিলা হইতে ডাক্তার সাহেবকে আনয়ন করিলেন । সাহেব পরীক্ষাস্তে কহিলেন, ‘রোগ কঠিন—টাইফয়েড—যত্ন করিলে বাঁচিতে পারেন ।’ মাধব অনন্তকর্ম্মা হইয়া রোগিনীর শুশ্রূষায় ব্রতী হইলেন ।

মাধবের শয্যাগৃহের অতি নিকটে একটা ক্ষুদ্র কক্ষ মাতঙ্গিনীর জন্ম নির্দিষ্ট হইয়াছিল । ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—বাতাস ও আলো যথেষ্ট । আসবাব পত্র বড় বেশী ছিল না ; একখানি ছোট পালক, তার উপর অতি কোমল শয্যা । প্রাচীর-গাত্রে একটা বড় ঘড়ি, কয়েকখানা ফ্রেমে আঁটা বিলুতী ছবি ; একটা ছোট টেবিল, দুইখানা বসিবার চৌকী বা চেয়ার, একটা সেল্ফ্ ইত্যাদি ছিল । এতদ্ব্যতীত গৃহের শোভা-বর্দ্ধক আর একটা জিনিস ছিল,—সেটা শুভ্র শয্যার উপর কমল-মালাবৎ শয্যাশায়িতা মাতঙ্গিনী ।

একদা সন্ধ্যাকালে মাতঙ্গিনীর শিয়রে মাধব ও পদতলে হেমাদিনী উপবিষ্ট রহিয়াছেন । বিধাতার সৃষ্ট রাজ্যমধ্যে এত সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ সচরাচর দৃষ্ট হয় না । বিধাতা যেন তাঁহার নির্মাণ কৌশল জগতকে দেখাইবার অভিপ্রায়ে অত্যধিক যত্নসহকারে এই দুই ভগিনীকে সৃজন করিয়াছিলেন । দেখিলে মনে হয় দুইখানি প্রতিমাই যেন এক

কারিগরের হস্ত-নির্মিত—যেন এক বৃন্তে দুইটা কমল । তবে একটা প্রস্ফুটিত, অপরটা স্ফুটনোন্মুখ । একের বয়স অষ্টাদশ, অপরের ষোড়শ । প্রথমা পূর্ণযৌবনা, ভাদ্রের ভরা নদী—অপরা বর্দ্ধমানা আষাঢ়ের স্রোতঃস্বিনী । একজন আশাহত পূর্ণিমার শশধর, অপরা সুখআশা-বিগলিতা শুক্ল দশমীর চন্দ্রমা ।

মাধব, পূর্ণিমার শশধর প্রতি চাহিয়া নীরবে উপবিষ্ট ছিলেন । শশধর নিদ্রিত বলিয়াই মাধব অনুমান করিয়াছিলেন ; সহসা মাতঙ্গিনী ডাকিয়া উঠিলেন, “মাধব বাবু !”

“কি, মাতঙ্গিনী ?”

মাতঙ্গিনীর বদন আরক্তিম হইল, তিনি উত্তর না করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন । মাধব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বল্ছ দিদি ?”

কণ্ঠ আরও মৃদু, আরও মধুর । মাতঙ্গিনী তথাপি নিরুত্তর রহিলেন । মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘুম এসেছে দিদি ?”

“না ।”

“কি জিজ্ঞাসা করছিলে, বল ?”

“খবর কিছু পেয়েছ ?”

মাধব বুঝিলেন, মাতঙ্গিনী রাজমোহনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন । তাহার বিশেষ কোন সংবাদ মাধব অবগত ছিলেন না । আজিও ডাকাতির তদন্ত পুলিশ হইতে চলিতেছে । দারোগা বাবু তদন্ত করিয়া চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে ইন্স্পেক্টার বাবু তদন্তে আসিয়াছিলেন । তখন তাঁহার সৎকারার্থে মাধবের গৃহে ছাগ মাংসের অবতারণা হইয়াছিল । উক্ত অবতারণিকার দুই দিন পরে পুলিশ সাহেবের আবির্ভাব হইয়াছিল । তখন সেখপাড়ার পক্ষী-হননের মহাধুম পড়িয়া গিয়াছিল । এইরূপে কর্তৃপক্ষ তদন্ত করিতে আসিয়া হত্যাকাৰ্য্যের বিপুল সহায়তা

করিলেন । আর যিনি যখন আসিয়াছিলেন, তিনি তখন রাজমোহনের অনুসন্ধান লইতে বিরত থাকেন নাই । রাজমোহনের বিরুদ্ধে আপাততঃ কোনও প্রমাণাদি ছিল না, তথাপি তাহাকে এই ডাকাতিতে সংলিপ্ত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল । মাধব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে সংবাদ মাতঙ্গিনীর নিকট হইতে গোপন রাখিয়া উত্তর করিলেন,—“না ।”

মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদের বাসাতেও নাকি সে দিন ডাকাতি হয়েছে ?”

মাধব । হাঁ, তবে কিছু নিতে পারে নি ।

মাতঙ্গিনী । কেন ? কেহ বাধা দিয়েছিল কি ?

মাধব । বাধা দিতে কেহই ছিল না ।

মাতঙ্গিনী । তবে ?

মাধব । তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই কিছু লয় নাই ।

মাতঙ্গিনী । তবে ডাকাতিটা কি রকম ?

মাধব উত্তর না করিয়া ঘড়ির দিকে চাহিলেন ; কহিলেন, “তোমার ঔষধ খাইবার সময় উত্তীর্ণপ্রায় ।”

শব্দ্য-পদতুলে অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে ললাট আচ্ছাদন করিয়া হেমাঙ্গিনী উপবিষ্টা ছিলেন । তিনি একটা পাত্রে ঔষধি ঢালিয়া ভগিনীকে সেবন করাইলেন । সেবনান্তে মাতঙ্গিনী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে ডাকাতিটা কি রকম ?”

মাধব কহিলেন, “আমার মনে হয় ডাকাতির কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা— পুলিশেও তাই বলে ।”

মাতঙ্গিনী । না—মিথ্যা নয়—সত্য । কনক আমার দেখতে এসেছিল, সে বলেছে সত্য ।

মাধ । দেখছি তুমি আমার চেয়ে ভাল জান ; তবে তুমিই বল না ডাকাতরা কি জন্মে এসেছিল ।

মাত । আমার জন্মে ।

মাধ । সে কি !

মাত । হাঁ ।

মাধ । তোমার সন্ধান নিতে রাজমোহন বাবু হরত দুই একজন লোক পাঠিয়েছিলেন, লোকে সেটা বাড়িয়ে—

মাত । না, তা' নয় ; আমি কনক ও পিসেসের নিকট যা শুনেছি তা' হতে বুঝেছি ডাকাতরা আমাকেই নিতে এসেছিল ।

মাধ । কথাটার আমার তেমন শ্রদ্ধা হ'ল না ; তুমি কাকে সন্দেহ করছ ?

মাত । তাহা বলিব, বলিব বলিয়াই কথাটা তুলিয়াছি । (হেমাস্বিনীর প্রতি) হেম, একটু জল দে ।

মাতঙ্গিনী জলপান করিয়া একটু সুস্থ অনুভব করিলেন । মাধব চৌকী ত্যাগ করিয়া পালঙ্কোপরি মাতঙ্গিনীর পার্শ্বে গিয়া বসিলেন এবং তাঁহার ললাটের উপর হস্ত রক্ষা করিয়া কহিলেন, “জ্বর বেড়েছে—এখন আর বোকা না ।”

মাতঙ্গিনী । বাড়ে বাড়ুক, আমি মরব না ; আমার কপালে মৃত্যু নেই, তবে তোমাদের কিছু ভোগাব । যা'ক ও-সব কথা—তোমার খুড়ীর কোন সংবাদ পেলো ?

মাধব । শুনেছি তিনি বড় বাড়ীতে আছেন ।

মাত । তুমি তাঁকে আনতে লোক পাঠিয়েছিলে না ?

মাধ । হাঁ, কিন্তু আমাদের লোক তাঁর সাক্ষাৎ পায় নি ।

মাত । সাক্ষাৎ করতে দেয় নি বল ।

মাধ । কে দেয় নি ?

মাত । যে ব্যক্তি তোমার খুড়ীকে উপলক্ষ্য করে উইলের মর্কদ্দমা করেছে ।

মাধ । মথুর দাদার কথা বলছ ?

মাত । হাঁ, তুমি তাকে চেন না, কিন্তু দেশের লোক তাকে চেনে । তুমি সরল বিশ্বাসে মানুষকে ভালবাসতে গিয়ে প্রতারিত হও ।

দারোগার কথাটা মাধবের মনে পড়িয়া গেল । তিনি একটু আবেগ-ভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমারও কি বিশ্বাস মথুর দাদার পরিচালনার আমার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে ?”

মাত । সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ।

মাধ । আর তোমার বাড়ীর ?

মাত । তিনিই মূল ; তিনি সে সময় বাড়ীর কর্তাকে কৌশলে সরাইয়া এ কার্য্য করিয়াছিলেন ।

মাধ । উদ্দেশ্য ? সেখানে ত আর উইল ছিল না ।

মাত । তুমি বড় বোকা—রাগ করো না—সরল বিশ্বাসী ব্যক্তি-সত্ত্বেই একটু নির্ঝোঁধ । সে দিন যে সময় নদী হতে জল নিয়ে আমি ঘরে ফিরছিলাম, সে সময় তোমার পাশে কে দাঁড়িয়েছিল ?

মাধব । হাঁ, বুঝেছি—আর তোমার বলতে হবে না । মানুষ এত বড় পিশাচ হ’তে পারে, তা’ত আমি করনাতোও আনতে পারি নি । তুমি যখন সে দিন এসে আমার বলেছিলে উইল চুরিই দস্যুদের উদ্দেশ্য, তখন আমার মনে হয়েছিল মথুর দাদা এতে সংলিপ্ত আছেন । কিন্তু সেরূপ চিন্তা পোষণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল মনে করে আমি তা’ পরে বর্জন করেছিলাম । হি হি, আখীর এত বড় শত্রু হয় ।

মাত । আখীর কুটুঘই ত শত্রু হয় ; রাস্তার লোকের হিংসা করবার

ত কোন দরকার হয় না । আত্মীয়, আত্মীয়ের বিরুদ্ধে যখন কোন কথা বলিল, তখন জানিবে সেটা মিথ্যা ; আত্মীয়, আত্মীয়ের সহিত যখন হৃদয়তা জানাইল, তখন জানিবে সে ব্যবহার কপট । দেখ মাধব—ছোট বাবু—এই কপট পথ অবলম্বন করিয়াই এখন হইতে তোমাকে বড় বাবুর সঙ্গে চলিতে হইবে ।

মাধ । আমি তা' পারিব না—বিষয় আশায়ের লোভে কপটী হইব ! ছি !

মাত । সংসারে থাকতে গেলে শঠের সঙ্গে শঠতা করতে হয় । তোমাকে সতর্ক করবার জন্মেই কথাটা তুললাম । এখন আমার ঘুম পেয়েছে, কথা কহিতে পারছি না ।

মাধব, মাতঙ্গিনীর ললাট স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, অর আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষভাগে মাতঙ্গিনীর অবস্থা বড়ই চিন্তাবুক হইয়া শড়িল । ডাক্তার সাহেব জীবনের বড় একটা আশা দিতে পারেন নাই । তবে পথঘাট বাধিবার চেষ্টা প্রচুর হইয়াছিল—কোনও ক্রটি হয় নাই । নাড়ী ক্ষীণ ও হিমাক্ত হইয়া আসিলে মৃগনাভি, স্ট্রীকনাইন প্রভৃতি খাওয়াইতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । তাহা হইলেই রোগিনীর পলায়নোদ্ভূত প্রাণটা থাকিয়া যাইবে ।

রোগিণীর জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে । তবে মধ্যে মধ্যে কণেকের জন্ম জ্ঞানোদয় হয় । তখন তিনি সুপ্তোখিতার আয় গৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং মাধবের বদনমণ্ডল নয়নপথে প্রতিভ হইবামাত্র নয়নদ্বয় অস্বাভাবিকরূপে বিস্ফারিত করিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকেন । ক্রমে দৃষ্টি কণেকের জন্ম স্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তিনি তৎকালে ছই একটা কথার উত্তর দিতে সক্ষম হইলেন ।

ত্রয়োদশ দিবসের রাত্রি একরূপ কাটিয়া গেল—চতুর্দশ দিবস বুঝি আর কাটে না । রাত্রি একপ্রহরের সময় গ্রামের ডাক্তার জবাব দিয়া প্রস্থান করিলেন । মাধব ক্রন্দনধ্বনি হৃদয়মধ্যে চাপিয়া রোগিণীর শিরে বসিলেন । হেমাজিনী রোগিণীর পদতলে উষ্ণ তৈল মর্দন করিতেছিলেন । মাধবের মাসী হস্তাতলে উপবিষ্টা থাকিয়া মধ্যে মধ্যে মশক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । সনাতন দ্বার পথে নিম্নতুণ্ডে দণ্ডায়মান । পাঁচ ছয়জন দাসদাসী গরম জলের বোতল ও আণ্ডনের কড়া লইয়া গৃহবাহিরে উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল । সকলেই নীরব, নিস্তব্ধ । এমন সময় এক মনুষ্যমূর্তি দ্বারপথে সনাতনের পার্শ্ব আন্নিয়া দাঁড়াইল । সকলে তাহাকে চিনিল ; মাসী বলিয়া উঠিলেন, “কে, রাজমোহন ?”

অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতাটা ভাঙ্গিয়া গেল । সকলে যেন তখন নিশ্বাস ফেলিবার অবসর পাইল । মাধব নড়িয়া বসিলেন ; হেমাজিনী মাথার কাপড় টানিলেন ; সনাতন দ্বার ছাড়িল ; মাসী সরিয়া পথ দিলেন ।

রাজমোহন কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া জ্ঞানবিলুপ্তা মাতঙ্গিনীর প্রতি চাহিল । অনেককণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল ; গৃহমধ্যে কে কে আছে তাহা সুহৃৎ দেখিয়া লইল । তাহার হৃদয় মধ্যে কোনরূপ ভীষণ দুঃখ বা কষ্ট

উপজিত হইয়াছিল, এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না । রাজমোহন, মাধবের সমীপস্থ হইয়া মৃদুস্বরে বলিল “আমি ইহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি ।”

মাধব কথাটা ঠিক বুঝিলেন কি না জানি না, কিন্তু তিনি নিরুত্তর রহিলেন । রাজমোহন পুনরায় কহিল, “আমি ইহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি ।”

মাধব কথাটা এবার উপলব্ধি করিলেন ; তিনি উত্তর না করিয়া মুখ ফিরাইলেন । রাজমোহন পুনরায় কহিল, “আমার বেশী সময় নাই—এখন আমার যাইতে হইবে—দ্বারে পাকী অপেক্ষা করিতেছে ।”

মাধবের ইচ্ছা হইল, রাজমোহনের গণ্ডদেশে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেন ; তাহাতে তাঁহার হৃদয়বেগ কথঞ্চিৎ শমিত হইতে পারিত । কিন্তু বিধাতার বিচিত্র নির্বন্ধ অনুসারে তিনি সে সুখে বঞ্চিত হইলেন । মাতঙ্গিনী ঠিক সেই সময়ে বিকার ঘোরে ভয়াবহ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “মরি মরি কি সুন্দর ! চূপ কর—চঁচিও না—দেখিতে দাও—” তৎক্ষণাৎ আবার ভয়ব্যাকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—“রক্ষা কর—রক্ষা কর—আমার মেরে ফেললে—ওই দেখ হাত ভুলেছে—কি ভীষণ—ও কে—” রোগিণী আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল ।

রাজমোহন পালকের দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল, “আমি এমন ভাবে রোগীকে নিয়ে যাব যে, সে বুঝতে পারবে না, তাহাকে স্থানান্তরিত করা হুচে ।”

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কর্ণে উক্ত প্রস্তাব প্রবিষ্ট হইল । সে সময় মাসী-মাতা ভাবিতেছিলেন, মাতঙ্গিনীর মৃত্যু ঘটিলে তিনি কি ভাবে ক্রন্দনাদি করিবেন ; হস্তপদাদি কিরূপে বিক্রম করিবেন তাহাও মনে মনে স্থির করিয়া লইতেছিলেন । তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, যাহারা

নয়নপ্রাপ্তে অশ্রু আনয়নে অসমর্থী, তাহারা মুচ্ছার পথ অবলম্বন করিয়া থাকে । তিনি সেই পথ গ্রহণ করিবেন কিনা তাহাও চিন্তা করিতে ছিলেন ; কিন্তু কোনও মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্বেই রাজমোহনের প্রস্তাব তাঁহার কর্ণে প্রবেশলাভ করিল । তিনি মশক্কে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কণ্ঠ কাঁপাইয়া কহিলেন, “একটু অপেক্ষা কর—আর কতক্ষণই বা ধড়ে প্রাণ আছে ।”

রাজমোহন উত্তর করিল, “আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না—এখনই দেশে যাইব ; এ অঞ্চলে আর আসিব না ।”

মাধব মূঢ় অথচ ক্রোধতীব্র কণ্ঠে ডাকিলেন, “সনাতন !”

সনাতন কণ্ঠের একটু শব্দ করিয়া উত্তর করিল ।

মাধব কোনও আদেশ প্রদান করিবার পূর্বে মাতঙ্গিনী পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন এবং নয়নদ্বয় অস্বাভাবিকরূপে বিস্ফারিত করিয়া অস্থির দৃষ্টিতে চতুর্দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন । কোন দ্রব্যাদি বা মনুষ্যবদন তিনি যে চিনিতে পারিলেন, এরূপ প্রতীতি হইল না । মাধব, তাঁহার পদ্মদলবৎ পাণিতল স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, দেহের উত্তাপ কমিয়া আসিয়াছে ; তখন তিনি অস্থির হইয়া দাস দাসীকে নানারূপ আদেশ করিতে লাগিলেন । রাজমোহন তদর্শনে জিজ্ঞাসা করিল, “মাধববাবু, আমার জ্বর জন্ম আপনি অত কাতর হইতেছেন কেন ?”

মাধব কোনরূপ উত্তর প্রদান করিবার পূর্বে একজন দাসী আসিয়া সনাতনকে কহিল, “বাহিরে দারোগা বাবু এসেছেন—বড় দরকার ।”

সকলেই কথাটা শুনিলেন ; কিন্তু রাজমোহন ব্যতীত অপর কেহ এ সংবাদে বিচলিত হইলেন না । রাজমোহন কহিল, “দেখছি—এ অবস্থায় রোগিনীকে স্থানান্তরিত করা বৃক্তিসঙ্গত নয় ; আমি আজ তবে চলিলাম ।”

রাজমোহন মুহূর্তকাল আর অপেক্ষা না করিয়া কক্ষত্যাগ করিল। বাহিরে আসিয়া করুণাকে বলিল, “পাকী খিড়কী দ্বারে অপেক্ষা করছে, আমাকে খিড়কির পথ দেখিয়ে দেও।”

করুণা খিড়কীর পথে রাজমোহনকে বিদায় করিতে করিতে মৃদুস্বরে কহিল, “এ বাড়ীতে তোমায় যেন আর ঢুকতে না হয়।”

রাজমোহন কথা কয়টা শুনিতো না পাইলেও করুণার করুণভাব অনেকটা উপলব্ধি করিল। দ্বারে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ করুণা, তোমার বড় দিদি ঠাকরুণ এখানে কবে এসেছেন?”

করুণা নিরুত্তর রহিল। রাজমোহন পুনরপি কহিল, “ডাকাতির কিছু পূর্বে, না?”

করুণা কহিল, “হাঁ।” রাজমোহন প্রস্থান করিল।

এদিকে মাধব দারোগা বাবুকে দর্শন দিতে পারিলেন না—সনাতনকে পাঠাইলেন। সনাতন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, দারোগা বাবু সংবাদ পাইরাছেন, রাজমোহন এতদঞ্চলে পুনরাগমন করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ সে সময় তাঁহার গৃহমধ্যে অবস্থান করিতেছে। আরও কিছু গোপনীর সংবাদ ছিল; পরদিন সুবিধামত সময়ে আসিয়া দারোগাবাবু, ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, একরূপ ভরসা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর মাধব হুইজন দাসীর সাহায্যে মুম্বু রোগিনীর দেহমধ্যে উত্তাপ পরিচালিত করিবার বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং ঘন ঘন উত্তেজক ঔষধ সেবন করাইতে লাগিলেন। হেমাঙ্গিনীও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না; তিনি জননীর নিকট শুনিয়াছিলেন, বিপদকালে ‘সকটার স্তোত্র’ পাঠ করিলে বিপদ দূরীভূত হয়। জননীর বাক্যে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। এক্ষণে সেই পবিত্র বাক্য তাঁহার স্মরণ পথে উদ্ভিত হইবামাত্র তিনি মৃদুস্বরে ‘সকটার স্তোত্র’ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন,—‘সকটা প্রথমঃ

নাম, দ্বিতীয়ঃ বিজয়া তথা, তৃতীয়ঃ কামদাপ্রোক্তা, চতুর্থঃ দুঃখহারিণী, সর্বাণী পঞ্চমঃ নাম, ষষ্ঠঃ কাত্যায়নী তথা, সপ্তমঃ ভীমনয়না, সর্বরোগ হরাষ্টকঃ ।” হেমাঙ্গিনী উক্ত স্তোত্র বারংবার অতি মৃদুকণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন ।

মাসী দেখিলেন, এ সময় কিছু না করিলেই নয় । তিনি মাধবকে সাহায্য করিতে উত্ততা হইলেন ; কিন্তু প্রথম উদ্যমেই তিনি গরম জলের বোতলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন । তখন সে দিকে বিতথপ্রয়াস হইয়া হেমাঙ্গিনীর আনুকূল্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । কিন্তু স্তোত্রাদি কিছুই তিনি অবগত ছিলেন না । ‘টহলদার’দের দুই একটা গান শুনিয়াছিলেন । স্মৃতি-ভাণ্ডার মন্বন করিয়া দেখিলেন, “শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে”—ছাড়া অন্য কোনও গীত বা স্তোত্র তথায় অবস্থান করিতেছে না । তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এ সময় নাচানাচির গান স্থান বা অবস্থার উপযোগী হইবে না । তখন তিনি শিব ব্রহ্মাকে বিদায় দিয়া হরিকে ধরিলেন । তিনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, শব-বাহকেরা ‘হরিবোল’ দিতে দিতে শব বহিয়া লইয়া যায় । এমন কি, যে মুমূর্ষু তাহাকেও হরিধ্বনি শ্রবণ করায় । অতএব এ ক্ষেত্রে মাতঙ্গিনীকে হরিনাম শ্রবণ করান মহাপুণ্যজনক ও সময়োচিত কার্য । এবম্বিধ মীমাংসায় উপনীত হইবামাত্র তিনি শব-বাহকের কণ্ঠ ও ভঙ্গী অনুকরণ করত ‘হরিবোল’ দিয়া উঠিলেন । গৃহস্থ তাবৎ ব্যক্তি চমকিত হইলেন । মাধব ক্রুদ্ধী করিয়া মাসীকে তীব্র তিরস্কার করিলেন । মাসী তাঁহার অপরাধ বুঝিতে না পারিয়া দ্বিতীয় হরিধ্বনিটা কণ্ঠমধ্যেই সংবরণ করিয়া লইলেন ।—যথা, পলাশীক্ষেত্রে নবাব-সৈন্তের উত্তত কুপাণ ও উখিত চরণ মৃদ্রাকরের আদেশে সংবৃত হইয়াছিল ।

যে কারণেই হউক—সকটা মায়ের দয়ার অথবা ঔষধ-শক্তি প্রভাবে—যে কারণেই হউক, সে রাত্রি নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল ; এবং পরদিন একটু

উন্নতি দৃষ্ট হইল । গ্রাম্য চিকিৎসক আসিয়া স্বীয় ব্যবহার প্রচুর প্রশংসাবাদ করিলেন ; এবং তিনি চিকিৎসক-জগতে এক অদ্বিতীয় ও ক্ষণজন্মা পুরুষ তাহা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বহু দৃষ্টান্তের অবতারণা করিলেন । মাধব তাঁহাকে অসাধারণ প্রতিভা-সম্পন্ন চিকিৎসক মানিয়া লইয়া ডাক্তার সাহেবকে আনিতে লোক পাঠাইলেন ।

ডাক্তার সাহেব পরদিন আসিয়া রোগিণীকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন ; অবশেষে কহিলেন, “ভগবৎ কৃপায় রোগিণী এ যাত্রা রক্ষা পাইল । তাঁহার দয়া ভিন্ন পৃথিবীর কোন চিকিৎসকই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিত না ।”

তদবধি মাতঙ্গিনী উত্তরোত্তর আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন । এবং পঞ্চাশৎ দিবসে পথ্য পাইলেন । সেই দিবস অপরাহ্নে শয্যায় শুইয়া মাতঙ্গিনী, মাধবকে কহিলেন, “এখন বিষয় কৰ্ম্ম দেখ—আমি ত সব লজ্জভণ্ড করেছি ।”

মাধব হাসিয়া উত্তর করিলেন, “আমি বিষয়কৰ্ম্মই ত এতদিন দেখেছিলাম—ঠাকুরদেবতাকে আর কবে ডেকেছি ।”

মাসিমাতা তথায় উপস্থিত ছিলেন । তিনি বলিয়া উঠিলেন, “তোমার জন্মে মা, ভেবে ভেবে আমার মাধবের হাড় দুখানা সার হইয়াছে ; সমস্ত দিনরাত তোমার পাশে বসে কাটিয়েছে । শুকন মুখে বসে থাকত, ঠাকুর দেবতাকে আর কখন ডাকবে বল । তোমাকে যে মা ফিরে পাব—তুমি যে আবার শুকোর কোল দিয়ে ভাত খাবে—”

মাসিমাতার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল । তিনি বস্ত্রাঞ্চল তুলিয়া নয়নোপরি ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন । ভয়সা ছিল, এবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা কিঞ্চিৎ অশ্রুশক্তি ঘটিবে ; কিন্তু বিধি বিড়ম্বনার তাঁহার দেহ এত নীরস যে, চক্ষুঘর সহজে রসযুক্ত হইতে সক্ষম হইল না । তখন তিনি সে পথ পরিত্যাগ

করিয়া ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিলেন ; এবং কহিলেন, “ঠাকুর দেবতার কাছে মা তোমার কল্যাণ-কামনার কত ‘মানত’ করেছি। তা’ আমি আর কোথায় পাব ?—মাধব দেবে, তবেত পূজা দেব ?”

এইরূপে মাসী-মা এক টিলে ছই পাখী মারিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল ; কেন না, তাঁহার বাক্যায়ুধ মাধবের কর্ণ-কুহরে প্রবেশলাভ করিল না। তাঁহার হৃদয় তখন আনন্দে পরিপূর্ণ—ভাদ্রের ভরা গাঙ্গের গায় সলিলোচ্ছ্বাসে কূলে কূলে পূর্ণ।

মাধবের মুখপ্রতি চাহিতেই মাতঙ্গিনী তাহা বুঝিলেন ; তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন। মাসী গৃহকর্ম্ম সাধিতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। মাধবও উঠিলেন ; তাঁহাকে প্রস্থানোত্ত দেখিয়া মাতঙ্গিনী কহিলেন, “একটা কথা আছে, দাঁড়াও—মকর্দ্দমা কবে ?”

মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন্ মকর্দ্দমা ?—ডাকাতি ?”

মাতঙ্গিনী। হাঁ।

মাধব। তা’ ঠিক জানি নে। শুনেছি দলপতি রঘুনাথ জেলখানা হ’তে পলায়ন করেছে।

মাত। কবে পালান ?

মাধ। সে অনেক দিনের কথা ; তখন তোমার খুব অসুখ। রাজমোহনবাবু একদিন তোমায় দেখতে এসেছিলেন, তা’ জান কি ?

মাত। শুনেছি একদিন তিনি আমার নিতে এসেছিলেন।

মাধ। যে দিন তিনি আসেন, সেইদিন দারোগাবাবু আমার বলতে এসেছিলেন, রঘুনাথ তা’র অনুচরকে নিয়ে পালিয়েছে।

মাত। আর ছই জন ?

মাধ। তা’রা হাঁসপাতালে বুঝি আজও আছে।

মাত । তা'রা নাকি অপরাধ স্বীকার করেছে ?

মাধব একটু বিস্মিত হইয়া মাতঙ্গিনীর মুখপ্রতি চাহিলেন ; কহিলেন,
“তুমি জানিলে কি প্রকারে ?”

মাত । কনক বলেছে ।

মাধ । এ সব কথা নিয়ে তোমার মত রোগীর সঙ্গে তা'র আলাপ
করা উচিত হয় নি ।

মাত । দস্যুদের কে কে সাহায্য করেছে তা'ও নাকি তারা
বলেছে ?

মাধ । আমি তা' ঠিক জানি না ।

মাত । মথুর বাবুর নাম করেছে কি ?

মাধ । না ; বলেছে যে, তা'কে কেহই দেখে নি ।

মাত । ঠিক জান ?

মাধ । শুনেছি ত তাই ।

মাত । আর কাহারও নাম করেছে বলে শুনেছ ?

মাধ । কই, মনে ত পড়ে না ।

মাত । তুমি মিথ্যাক ।

মাধ । আমি মিথ্যাক নই মাতঙ্গিনী—তোমার প্রাণে 'অনর্থক ব্যথা
দিতে ইচ্ছা করি না ।

মাতঙ্গিনী মুখ ফিরাইয়া গুইল—আর বাক্যালাপ করিল না ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

দারোগাবাবু কি জানি কেন, রাজমোহনের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। দুইজন একরারি আসামীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া দারোগাবাবু একদিন সহসা রাজমোহনের উত্তরপাড়ার ভবনে আসিয়া দর্শন দিলেন। এবং হস্তে লৌহ অলঙ্কার পরাইয়া তাহাকে রাধাগঞ্জে আনিলেন। দারোগাবাবুর এমনই কৌশল ও অধ্যবসায় যে, স্বল্পকাল মধ্যে দুইজন ভদ্র ব্যক্তি আসিয়া সাক্ষ্য দিলেন, রাজমোহন, দস্যুপতির সহিত ঘটনার দুইদিন পূর্বে গোপনে দস্যুতা সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিল। শুধু তাই নয়, দারোগাবাবুর সাহচর্যের এমনই প্রভাব যে, একরাত্রির মধ্যে রাজমোহনের আশ্চর্য্য পরিবর্তন ঘটিল; সে, হাকিমের সম্মুখে সকল অপরাধ স্বীকার করিতে সম্মত হইল। গ্রামের মন্দলোকেরা রাষ্ট্র ক্রান্তি, থানার সন্নিহিত পথ হইতে উক্ত নিশিতে প্রহারের শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। সে সব অশ্রদ্ধের ও অলীক কথায় কোনও ভদ্রব্যক্তি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।

তাহার কয়েক দিবস পরে সদর মোকাম হরিগঞ্জে ডাকাতি মকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হইল। মাধব ও তাঁহার ভৃত্যাদিকে সাক্ষ্য দিতে আসিতে হইল। সনাতনের আসিবার কোনও প্রয়োজন হইল না; কেন না, সে ষষ্টি গাছটিও হস্তে গ্রহণ করে নাই। মাধব দুইখানা বড় নৌকায় সদল বলে উঠিয়া দুর্গা নাম স্বরণ পূর্বক যাত্রা করিলেন। পথে দুই রাত্রি

একদিন অতিবাহিত করিয়া তৃতীয় দিবস প্রভাতে হরিগঞ্জের ঘাটে মাধবের বজরা লাগিল ।

নৌকা ঘাটে লাগিতে না লাগিতে তাঁহার মোক্তার আম শ্রীযুক্ত হরিদাস রায় মহাশয় দর্শন দিলেন ; এবং নমস্কারান্তে কৃত্রিম দস্তরাজি বিকশিত করিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন । হরিদাস বাবুর এ স্থলে কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিলে প্রহরের অঙ্গহানি হইবার সম্ভাবনা ; অতএব নিম্নে তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলাম ।

হরিদাস বাবুর বয়স কত, তাহা ঠিক করিয়া বলা হুকুহ ব্যাপার । তিনি কখন বলেন বাষট্টি, আবার স্থান বিশেষে বলেন চুয়ান্তর ; সন্ধ্যার পর কখন কখন চল্লিশ বলিয়াও ব্যক্ত করিয়াছেন । তাঁহার কেশ বহুরূপী নামধের জীবের গ্ৰাম কখন শুভ্র, কখন কৃষ্ণ, কখন বা পিঙ্গল । তিনি ব্যবসারে মোক্তার, কিন্তু নানা কারণে ব্যবসারে প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইলেন নাই । কিন্তু বুদ্ধি-শক্তি ও অর্থোপার্জন ক্ষমতায় ততুল্য ব্যক্তি সমুদয় সহরে ছিল না । একদা এক হুরস্তু সাহেব, ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে জিলাতে আসিয়াছিলেন । তিনি নালিসের দরখাস্ত লইতে বড়ই নারাজ । মোক্তার বাবুরা দরখাস্ত লইয়া আসিলে তিনি তাহাদের গালি দিয়া বিতাড়িত করিতেন । গালিটা তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে আহ্বার করিতে পাইতেন বটে, কিন্তু উদরের আহাৰ্য্য কিছুই জুটিত না । সকলে পরামর্শ করিয়া হরিদাস বাবুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ; তিনিও এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না । মনে মনে একটা সংকল্প স্থির করিয়া তিনি একদিন বেলা এগারটার সময় একটা সুদীর্ঘ বংশ লইয়া কাছারিতে গমন করিলেন ; তবে প্রবেশ পথে না গিয়া ময়দানে বাতায়ন-সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন । এ দিকে দরখাস্ত গ্রহণের সময় উপস্থিত হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিলেন, এবং চিরস্তন প্রথা অনুসারে মোক্তার

বাবুদের ঐচ্ছুর পরিমাণে বাক্য-সুখা পান করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন । সাহেব যখন এবম্বিধ সুখাত্ত ভোজ্য পরিবেষণে ব্যস্ত, তখন অকস্মাৎ বাতায়ন-পথে একবংশ গু দৃষ্ট হইল । বংশ ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে সাহেবের সম্মুখে আসিয়া স্থির হইলেন । বংশ বিনা আভরণে আইসেন নাই,— তাঁহার শিরোদেশে একখানি দরখাস্ত রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া দোহলাঙ্গান অবস্থায় বৃদ্ধের বিতায়মান শুভ্র শশ্রু রাজির গায় প্রকাশ পাইতেছিল । সাহেব তদৃষ্টে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, “কোন্ হায়,” “কোন্ হায় ।” দূর হইতে উত্তর আসিল,—“দরখাস্ত হায় ।” সাহেব আদেশ করিলেন,—“উম্কে পাকাড়কে লে আও ।” হরিদাস বাবুর পলায়নের ইচ্ছা আদৌ ছিল না । তিনি অচিরে সাহেবের সম্মুখে আনীত হইলেন । তাঁহার শুভ্রকেশ-বিমণ্ডিত পক্ষ আশ্রয়ের গায় মূর্তি দেখিয়া সাহেব সম্ভবত একটু প্রীত হইলেন । অঙ্গুলি সঙ্কেতে বংশ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কেয়া হায় ?” হরিদাস বাবু নির্বিকার চিত্তে কহিলেন,—“হজুর, এঠো বাঙ্গলা দেশকো বাঁশ হায় । আপুকা পাশ্ হাম আস্লে গালি খাতা হায়, তাই ইস্কে ভেজ দিয়া—যেংনা খুসী ইস্কে গালি দিজিয়ে, আর হামার দরখাস্ত লিজিয়ে ।” সাহেব— প্রকৃত ইংরাজের প্রকৃতিই এইরূপ—প্রীত হইলেন ; এবং তদবধি শাস্ত ভাব অবলম্বন করিলেন ।

একদা একজন ধনসম্পন্ন ব্যক্তি গ্রাম্য পঞ্চায়তি প্রাপ্তি আশায় হরিদাস বাবুকে মুরব্বি ধরিয়াছিল । হরিদাস বাবু বাবতীয় দস্ত উন্মীলন পূর্বক সশব্দ হাশ্ব সহকারে কহিলেন, “আরে পাগুলা, সে কি সোজা কথা ! খোদ্ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্যতীত সে চাকুরী আর কেহ দিতে পারে না ।” ধনী ব্যক্তি ছাড়িলেন না, হরিদাস বাবুর হাতে পঞ্চাশটি টাকা গু জিয়া দিলেন । হরিদাস বাবু টাকাটা কিপ্রহস্তে বাস্তর মধ্যে তুলিয়া,

টাকা জিনিষটা যে অতি তুচ্ছ, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তৃতা প্রদান করত সাহেবকে অনুরোধ করিতে স্বীকৃত হইলেন । ধনী ব্যক্তি আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন । ইহার কিছু দিন পরে পদপ্রার্থী দেখিলেন, তাঁহার গ্রামস্থ পঞ্চায়তের গরু ছাগল খানা বাটা নিলাম হইতেছে । অনুসন্ধানে জানিলেন, চাকরির ক্রটিতে সরকার বাহাদুরের হুকুমে পঞ্চায়তের এইরূপ ভাগ্য-বিপর্যায় ঘটিয়াছে । পদপ্রার্থী ধনী ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সদর মোকাম অভিমুখে ধাবিত হইলেন ; এবং হরিদাস বাবুর চরণ-প্রাপ্তে ঘর্ম্মবিস্কৃত অবস্থায় পতিত হইয়া কহিলেন, “মহাশয়, রক্ষা করুন, আমি আর পঞ্চায়তীর প্রার্থী নই ।” তৎকালে হরিদাস বাবুর মুষ্টি মধ্যে একটা লেখনী ছিল ; তিনি তাহা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সান্তিশয় বিরক্তি সহকারে কহিলেন,—“বল কি ! এই মাত্র যে আমি সাহেবকে ধরে তোমার চাকরি স্থির করে আসছি ! এখন আর উপায় নেই—তোমাকে পঞ্চায়তি করতেই হবে ।” পদপ্রার্থী অনেক অনুরণ বিনয় করিয়া আর পঞ্চায়তী রোপ্য মুদ্রা হরিদাস বাবুর হস্তে প্রদান পূর্বক চাকরির দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন । ইহা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন হইবে না যে, হরিদাস বাবু তাহার চাকরির জন্ত কোনও চেষ্টা করেন নাই ।

হরিদাস বাবুর সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে ; কিন্তু লোক মুখে তদ্ সমুদয় এরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, সে সকল লিপিবদ্ধ করিয়া এই সত্য ঘটনা মূলক উপন্যাসকে কলঙ্কিত করিতে বাসনা করি না । হরিদাস বাবুর ছইটা বিশেষ গুণ ছিল, তিনি কোনও ব্যক্তির পশ্চাতে তাহার নিন্দা করিতেন না এবং কেহ তাঁহার উপকার করিলে তিনি জীবনে তাহা বিস্মৃত হইতেন না ।

এক সময়ে হরিদাস বাবু সুদীর্ঘ কাল রোগ শয্যায় আবদ্ধ ছিলেন ।

রোগান্তে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার যে কয়েক জন মক্কেল ছিল, তাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তাঁহার বাহা কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল, তাহা চিকিৎসায় ব্যয়িত হইয়াছে। এক্ষণে নিরুপায় হইয়া ভগবৎ কৃপা ভিক্ষার্থে পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশ পানে চাহিলেন। অসীম দয়ার সাগর তখন মাধবের পিতাকে প্রেরণ করিলেন। তিনি হরিদাস বাবুকে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া উত্তম বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। তদবধি হরিদাস অক্ষয় বিশ্বাসের সহিত মাধবের পিতার, পরে মাধবের কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

হরিদাস বাবু যথাকালে মাধবকে সঙ্গে লইয়া ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের একলাসে উপস্থিত হইলেন। ডিপুটি-বাবু নব্য যুবক ; তাঁহার বয়স অল্প হইলেও তিনি চক্ষুর উপর, চশমা নামক দুইখানা দৃষ্টি-যন্ত্র ধারণ করিয়াছেন। আইনের সুস্বাবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে এইরূপ যন্ত্রের নাকি বিশেষ প্রয়োজন। সে কালের হাকিমেরা মূর্থ ও অযোগ্য ছিলেন— আইনের স্বরূপ দর্শনে অসমর্থ বিধায় আসামীদের মুক্তি দান করিতেন এবং হৃদয়ের দৌর্বল্য প্রযুক্ত স্বদেশবাসীকে জেলখানায় প্রেরণ করিতে বড়ই অনিচ্ছুক ছিলেন। একবার একজন সেকালের হাকিমের নিকট একজন তুস্কের বিচার হইতেছিল। প্রকাশ যে, সে একদা নিশীথে কোনও দোকান হইতে দুই সের তণ্ডুল চুরি করিয়াছিল। তখন দেশে বড় অল্পকষ্ট—তাহার স্ত্রী পুত্র দুই দিন হইতে অনাহারে ছিল—নিজে পীড়িত, উপার্জনে অক্ষম। অনশনকাতর বালকবালিকার ক্রন্দন সহ্য করিতে না পারিয়া সে দুই সের তণ্ডুল অপহরণ করিয়াছিল। আরও লইতে পারিত, কিন্তু সে তাহা লয় নাই। হাকিম সমুদয় অবস্থা অবগত হইয়া বড়ই বিচলিত হইলেন এবং চক্ষু মুছিয়া অপরাধীকে একদিনের মেয়াদ দিলেন। অপরাধী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কে তাহাকে

এক বস্তা চাউল পাঠাইয়া দিয়াছে । অনুসন্ধান জানিল, “হাকিমেরই এই কাজ ।

এ সব দুর্বলচিত্ত বুড়া হাকিমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । সেই চিতাধোতবারিপ্রেক্ষণার্হ ভূমিতে নবীন হাকিমদিগের জন্ম । আমরা যে নবীন হাকিমের কথা বলিতেছিলাম, তিনি যদিও বাঙ্গালী, তথাপি বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন না । তবে এ অনভিজ্ঞতা রাজকার্যের অন্তরায় হইত না ; উকীল বাবুরা স্থান বিশেষে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া দিয়া হাকিমের বিশেষ সাহায্য করিতেন । হাকিম বিলাতে গমন করেন নাই, কিন্তু ইউরোপ প্রদেশের মানচিত্র দেখিয়াছেন এবং ছুইবার দার্জিলিং গিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে ।

সে যাই হউক, হাকিম প্রবর যথাকালে আসিয়া বিচারাসনে উপবেশন করিলেন এবং পুত্র-শোকাতুর পিতার স্মার গাভীর্ষ্য অবলম্বন পূর্বক সমবেত উকীল মোক্তারের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন ।

প্রথমেই ছোট মকদ্দমার ডাক হইল । সিপাহী একজন মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোককে আনিয়া কাঠ-বন্ধনীর মধ্যে তুলিল । হাকিম চাহার অপরাধ জিজ্ঞাসা করিলে কোর্ট বাবু কহিলেন, “এই ব্যক্তি গত রাতে কুৎসিত স্থানে মদ্যাদি পান করিয়া রাস্তায় হাল্লা করিতেছিল । ইহা এই ব্যক্তির প্রথম অপরাধ নহে, পূর্বেও কয়েক বার এইরূপ অপরাধে ইহার দণ্ড হইয়া গিয়াছে ।”

হাকিম । এই ব্যক্তি করে কি ?

কোর্ট-বাবু । আজ্ঞে, ইনি স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ।

হাকিম । সম্পাদক পদের উপযুক্তই বটে । দেশের লোক কেন যে এমন দুশ্চরিত্রের কাগজ পড়ে তা' আমি বুঝতে পারি না । ইচ্ছা

ছিল একে রাস্তার মাঝে দাঁড় করিয়ে চাবুক লাগাতে ; তা' এবার সেটা না করে এক হস্তার জন্তে, জেলে দিলুম ।

এইরূপ আরও দুইটা মকদ্দমা সারিয়া হাকিম ডাকাতি মকদ্দমার তলব দিলেন । তিন জন আসামী আসিয়া এই কাঠ-বেষ্টনীর মধ্যে স্থান গ্রহণ করিল । এই তিন জনের মধ্যে একজন রাজমোহন ।

কয়েক জন সাক্ষীর জবানবন্দীর পর মাধবের ডাক পড়িল । সরকার পক্ষ হইতে মাধবকে জিজ্ঞাসা করা হইল, “আপনার বাড়ীতে ১৫ই চৈত্র তারিখে ডাকাতি হয়েছে ?”

উত্তর । হাঁ ।

প্রশ্ন । কে কে ডাকাতি করেছে ?

উত্তর । তা' জানি না ; তবে এই দু'জন (কাঠ-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত দস্যুদ্বয়কে দেখাইয়া) যে, দলে ছিল, সেটা ঠিক বলতে পারি ।

প্রশ্ন । ঠিক চিনিতেন ?

উত্তর । হাঁ ।

প্রশ্ন । রাজমোহনকে সাহায্যকারী বলে আপনার মনে হয় কি ?

উত্তর । না ।

এই উত্তর, কেহ প্রত্যাশা করেন নাই । সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন ; এমন কি রাজমোহনও মুহূর্তের জন্ত মুখ তুলিয়া মাধবের প্রতি চাহিলেন । সরকার হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল,—“আপনার খুড়ার উইলের অবস্থিতি স্থান রাজমোহন জানিত ?”

উত্তর । না ।

প্রশ্ন । রাজমোহন আপনার আত্মীয় ?

উত্তর । হাঁ ।

প্রশ্ন । বেতন ভুক্ ?

উত্তর। হাঁ।

প্রশ্ন। সে আপনার বাটীতে থাকে ?

উত্তর। না, তিনি তাঁর বাসায় থাকেন, তবে কখন কখন আমার বাড়ীতেও এসে থাকেন।

প্রশ্ন। ঘটনার দিন কোথায় ছিল ?

মাধব দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিলেন, “আমারই গৃহে সঙ্কীর্ণ অবস্থান করিতেছিলেন।”

বিচারক, দারোগা প্রভৃতি সকলেই পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। রাজমোহন স্তম্ভিত হইয়া মাধবের মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। সরকার হইতে পুনরায় প্রশ্ন হইল। মাধব পূর্বানুরূপ উত্তর করিয়া কহিলেন,—“রাজমোহনবাবু আমার পরমাশ্রয়, তিনি কখন আমার বিপক্ষতাচরণ করেন নাই। ঘটনার দিন রাত্রিতে তিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। ওই দুই জন দস্যু যখন আমায় প্রহারোদ্ভত হয়, তখন রাজমোহন বাবু তাহাদের ভূপতিত করিয়া আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।”

হাকিম এতগুলি কথা ঠিক বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সাক্ষী কি বলছে?” সরকারী উকীল ইংরাজীতে কৃথাটা বুঝাইয়া দিলেন।

হাকিম কহিলেন, “তবেত লোকটা নির্দোষ আছে।” হরিদাস বাবু কহিলেন, “হজুর, একদম নির্দোষ হায়।”

তৎপরে মাধবের ভৃত্যবর্গ আসিয়া মাধবের উক্তি-অনুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিল। অতঃপর হাকিমের আদেশে রাজমোহন মুক্তি লাভ করিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ।



রাজমোহন কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া অধোবদনে চিন্তাকুল হৃদয়ে বিচার-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। কোথায় যাইবে তাহার স্থিরতা নাই। জেলখানায় যাইতে হইবে ইহাই সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ; অতঃপর সে যে মুক্তিলাভ করিয়া অসীম অস্থিরতার মধ্যে সহসা নিষ্কিপ্ত হইবে, এটা সে ভাবিয়া রাখিবার অবসর পায় নাই। তা' ছাড়া তা'র মনের ভিতরও কেমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছিল। এই সকল অপ্রত্যাশিত নানাকারণে রাজমোহন কেমন একটা ক্লান্তি অনুভব করিল ; অধিকদূর অগ্রসর হইতে অসমর্থ হইয়া বিচার গৃহের সন্নিহিত বৃক্ষতলে উপবেশন করিল।

রাজমোহন যখন জ্বল্প যথাসম্ভব উত্তোলন পূর্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, তখন হরিদাস রায় মহাশয় আসিয়া দর্শন দিলেন। তিনি কহিলেন, “আপনাকে গোটা সহরটা খুঁজে বেড়াচ্ছি—কেবল খোঁজাড়ে যাইনি; সেখানে আপনাকে থাকা আপাততঃ সম্ভব নয়, মনে করে, যাই নি।”

রাজমোহন উত্তর করিল, “মহাশয়ের অনুগ্রহ যথেষ্ট।”

হরিদাস। হাকিম যথার্থ বিচার করেছেন ; আপনার গায় সাধু ব্যক্তিকে দারোগা ব্যাটা অনর্থক এই কষ্ট দিল। যা' হো'ক মহাশয় এখন কোথায় যাচ্ছেন ?

রাজ। তাহা স্থির করি নাই।

হরি । বেশ করেছেন, স্থির না করাই ভাল । পাথের আছে কি ?
রাজ । না ।

হরি । আরও ভাল ; আমি কিছু এনেছি গ্রহণ করুন ।

হরিদাস পশ্চাতে নেত্রপাত করিলেন ; দেখিলেন, কেহ কোথাও
নাই । তখন পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া রাজমোহনকে
দিলেন । রাজমোহন একটুও ইতস্ততঃ না করিয়া মুদ্রা কয়টি গ্রহণ
করিলেন । হরিদাস প্রস্থান করিলেন ; কিন্তু কিছু দূর গিয়াই প্রত্যা-
বর্তন করিলেন ; এবং চাপকানের গুপ্তস্থান হইতে আরও পাঁচটি টাকা
বাহির করিয়া কহিলেন, “নিমখ্‌হারামীতে কাজ নাই, যাহা দিতে
দিয়াছেন, তাহা দিলাম ।”

রাজমোহন । কে দিতে দিয়েছেন ?

হরিদাস । কে আবার ? বাবু—মাধব বাবু । হুনিয়াতে আবার
মানুষ কে আছে ? এক ছিলেন রামকানাই বাবু, এখন আছেন তাঁর
পুত্র মাধব বাবু ।

এবার টাকা লইতে রাজমোহন একটু ইতস্ততঃ করিল । হরিদাস
বাবু কহিলেন, “এখন বাবা, সরে পড়—কি জানি যদি দারোগাটা এসে
আবার তোমার ধরে ; তোমার কীর্তিত বড় সামান্য নয় ।”

পরমহিতৈষী দারোগার নামে রাজমোহনের স্নাতক উপস্থিত হইল ;
সে আর দ্বিকল্পিত না করিয়া টাকা কয়টি লইয়া প্রস্থান করিল । বাজারে
গিয়া একখানা ধূতি ও উত্তরীয় ক্রয় করিল ; পরে ঘাটে আসিয়া
একখানা ডিঙ্গি ভাড়া করিল ; এবং রাধাগঞ্জ অভিমুখে ছুটিল ।

যে পথ অতিক্রম করিতে মাধবের প্রায় দুইদিবস অতিবাহিত হইয়া-
ছিল, রাজমোহন সেই পথ ক্ষুদ্র নৌকার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অতিক্রম
করিল । যখন রাধাগঞ্জে পৌঁছিল, তখন রাত্রি গভীর । গ্রাম সুশুপ্ত,

চতুর্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন । ১) রাজমোহন তথাপি নৌকা পরিত্যাগ পূর্বক
কুলে উঠিল । মধুমতী তীর হইতে তাহার গৃহ বড় বেশী দূর হইবে না ;
কিন্তু পথ অতি-বিকৃষ্টিত ও তমসাচ্ছাদিত । রাজমোহন তদ্বৈতু ধীরে
ধীরে সাবধানতাসহকারে পদক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিল । পথে দুই
চারিটা শৃগাল কুকুর ছাড়া আর কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না ।
তাহারা বিবিধ সুর আলাপ পূর্বক অভ্যাগতকে স্বর্দ্বনা করিল । রাজ-
মোহন তদপ্রতি মনোযোগী না হইয়া পূর্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিল । পথ
কনকের গৃহপার্শ্ব দিয়া বাহিত হইয়াছে । রাজমোহন যখন তন্নিকটবর্তী
হইল, তখন মনুষ্যকণ্ঠধ্বনি তাহার কর্ণাগত হইল ; তাহার প্রতীতি হইল,
দুই ব্যক্তি মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছে । রাজমোহনবাবু তখন
কর্ণোত্তলন পূর্বক পথের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন ; কিছু বুঝিয়া
উঠিতে পারিলেন না—সতর্ক পদে আরও দুই চারি পদ অগ্রসর হইলেন ।
দেখিলেন, দুইটা অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি কনকের গৃহবাহিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া
আলাপ করিতেছে ; একটা স্ত্রীলোক, অপরটা পুরুষ । রাজমোহন
শুনিলেন, রমণী কহিতেছে, “তা’ আমি কি করব ? আমার ত কোন
ক্রটি হয় নি । দুই বোণের পেটে আঁকুসি দিলেম, তা’ হইল কোথা
আছে কেউ কহিতে পারিলে না । এখন আমার টাকা মারলে
চলবে কেন ?”

পুরুষ কহিল, “কাজ হাসিল করলে টাকা দেবার কথা ছিল ।”

রমণী একটু উত্তেজিত হইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল, “তা’
বলে এখন চলবে না । মারে ঝরে সমস্ত সাঁঝের বেলাটা পড়ে রইলুম,
এখন বল কিনা কাজ ফাঁসিল না হ’লে পাৰি নে । ও-সব আমার কাছে
চলবে না—ভালয় ভালয় দেবে ত দাও, নইলে—”

পুরুষ । নইলে কিরে মাগী ?

রমণী । মাগী ? আমি মাগী ? তোমার বাপ মাগী, তোমার মা মাগী,
তোমার চোদ্দপুরুষ মাগী—

পুরুষ । আচ্ছা তাই হ'ল ; এখন কি করতে চান, তাই বল ।

রমণী । আমার টাকা না দিলে সকলকে বলে দেব, বড়বাবু ছইল
চুরি করতে আমার পাঠিয়েছিল ।

পুরুষ । গাঁয়ের বাসি ওঠাতে চাস্ত বলিস্ ।

রমণী । ওরে বাপরে ! মগের মূলুক কি না !

পুরুষ । তোমার ঘরে আগুন লাগালে কে ঠেকায় ?

রমণী এ যুক্তি অকাট্য মনে করিল ; কিন্তু নৈসর্গিক পণ্ডিতেরা
অকাট্য যুক্তির সম্মুখেও যেমন মস্তক নমিত বা সুর নরম না করিয়া ভিন্ন
পথ ধরিয়া তর্ক করিতে থাকেন, রমণীও তেমনই অত্র পথ অবলম্বন
করিয়া কহিল, “দেখ বাপু, অধর্ম্য করো না—আমার টাকা
আমায় দাও ।”

আত্মগোপনে আর প্রয়োজন বিবেচনা না করিয়া রাজমোহন অগ্রসর
হইলেন । তাঁহার বর্ণ তেমন উজ্জ্বল ছিল না । তাঁহার কটিতে উত্তরীয়
খানি, মন্দরপর্বত-কটীতে বাসুকীবৎ আবদ্ধ ছিল । স্নানাবৃত বক্ষ ও
উদরের বর্ণজ্যোতিঃ অন্ধকারের মধ্যে পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল না ।
কনকের মাতা দেখিল, একটা তমিস্রস্তূপ তমস্বিনীর মধ্যে অগ্রসর
হইতেছে । তিনি আর কালক্ষেপ না করিয়া পলায়মানা হইলেন ।
পুরুষটিও তাঁহার দৃষ্টান্ত যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত
হইলেন ; কিন্তু ভিন্নদিকে । রাজমোহন তদৃষ্টে তাঁহার দেহকে চালিত
করিয়া পলায়মান পুরুষের অনুবর্তী হইলেন ।

পথের ছরবস্থা ও অন্ধকারের গাঢ়তা প্রযুক্ত উভয়েই দ্রুত পদ চালনার
সুবিধা পাইতেছিলেন না । রাজমোহনের আর একটা অসুবিধা ঘটিয়া-

ছিল। তাঁহার বিপুল মাংস স্তূপ দেহোপরি সংলগ্ন থাকিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিত্তেছিল; অগ্রগামী পলায়মান ব্যক্তির এতদ্ বিষয়ে অনেকটা সুবিধা ছিল—তাঁহার দেহ বলিষ্ঠ, কিন্তু মাংস-স্তূপে পীড়িত নহে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময় ভাগ্যদেবী কঠিন দণ্ডদ্বস্তে অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া রাজমোহনের ভাগ্য-চক্র অন্ধকারময় পথে প্রবর্তন করিতেছিলেন; তিনি এক্ষণে সেই পথে রাজমোহনের সহায় হইয়া দাঁড়াইলেন। পথের উপর একটা নিরাশ্রয় সারমেয় শয়ান ছিল, অগ্রগামী ব্যক্তি তাহা অনবগত ছিলেন; তিনি তাহার উদরোপরি সজোরে পদক্ষেপ করিবামাত্র কুকুর মহাচীৎকার করিয়া উঠিল এবং অত্যাচারী ব্যক্তিও সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হইলেন। কুকুর চীৎকার করিয়া জানাইল,—তুমি অকারণ আমার পীড়ন কর কেন? আমি ত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই। পীড়ক কহিল—পীড়ন করে থাকি করেছি, তাই বলে তুমি প্রতিবাদ কর কেন? যাই হউক, রাজমোহন এই সুযোগে সারমেয়দলনকারীর সমীপবর্তী হইলেন।

ভূশায়ী ব্যক্তির হস্তে একটা ক্ষুদ্র ষষ্টি ছিল; সে তাহা দৃঢ়হস্তে ধারণপূর্বক উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজমোহন তদৃষ্টে কহিলেন, “মারামারির কোনও প্রয়োজন নাই—একটা আপোষে মীমাংসা হইবার আপত্তি কি?”

সম্বোধিত ব্যক্তি তখন সহর্ষে কহিয়া উঠিল, “কে, রাজমোহনবাবু?”

রাজমোহন এইরূপে অভিহিত হইয়া চমৎকৃত হইলেন। দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া বক্তার বদন নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু অন্ধকারের গাঢ়তা প্রযুক্ত তাহাতে অকৃতকার্য হইলেন। পূর্ববক্তা পুনরপি কহিলেন, “চিনিতে পারিলে না? আমি রঘুনাথ।”

রাজমোহন তখন আরও নিকটবর্তী হইয়া দস্যুপতির বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিল। পথের দুইধারে বৃক্ষাদি থাকায় অন্ধকারটা সে স্থানে

গাঢ়তর হইয়াছিল । তথাপি রাজমোহন, দস্যুপতির বদন নিরীক্ষণ করিতে নিবৃত্ত হইল না । অবশেষে সন্তুষ্ট হইয়া রঘুনাথের হস্ত ধারণ করিল এবং নিঃশব্দে পথ অতিবাহিত করিয়া নিজের গৃহে আসিল ।

গৃহ জনশূন্য, আবর্জনারময় । রাজমোহন তাঁহার মদালাপিনী পিসী ও পুত্রবতী ভগিনীকে বহুপূর্বে গোপনে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন । গৃহের দ্বারে দ্বারে তালা ছিল ; কিন্তু পাড়ার শুলীল ব্যক্তির তালাগুলি খুলিয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছেন এবং দ্রব্যাদি পাছে নষ্ট হইয়া যায় এই আশঙ্কায় পীড়িত হইয়া সে সকল নিজ নিজ গৃহে আনিয়া রাখিয়াছেন ও নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতেছেন । রাজমোহন দীপ জ্বালিবার কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া অন্ধকারময় দাবায় উপবেশন করিলেন এবং কটিতট হইতে উত্তরীয় উন্মোচন করত গাত্রের ধর্ম্মাদি মার্জনা করিলেন । রঘুনাথ তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি যে বড় এখানে ? আমারই মত অবস্থা নাকি ?”

রাজমোহন । না, খালাস পেয়েছি ।

রঘুনাথ । সে কি ! কিরূপে ঘটিল ?

অন্ধকারের মধ্যে ক্রভঙ্গী করিয়া রাজমোহন উত্তর করিলেন, “মাধব বাবুর দয়ায় ।”

দস্যু কোতূহলী হইয়া বিবরণ জিজ্ঞাসা করিল ; রাজমোহন সংক্ষেপে পরিচয় দিয়া অবশেষে কহিলেন, “মাধববাবুর দয়া আমার অসহ । তাঁর অনুগ্রহ না লইয়া আমি জেলে যাইতে পারিতাম, কিন্তু তথায় বাস করিতে আমার দুইটা আপত্তি ।

রঘুনাথ । আপত্তি দুইটা কি ?

রাজ । শুনিয়াছি জেলখানাটা বড় গরম ; সেখানে যদি কেহ পাখার বাতাস করে—

রঘু । তা' করবে না, হাকিমগুলোর সে ভদ্রতা নেই । দ্বিতীয়
আপত্তিটা কি ?

রাজ । আমার স্ত্রী ।

রঘু । সে সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি । ভরসা করি আপত্তি
দুইটা অত্যাধিক বর্তমান আছে ।

রাজ । হাঁ ।

রঘু । তবে আমাদের কাজে লাগ ।

রাজ । লাগিতে পারি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও ।

রঘু । প্রস্তাবটা কি ?

রাজ । কথাটা মথুরাবাবুর নিকট হইতে লইব ।

দস্যুরাজ মৌনাবলম্বন পূর্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিল ; তৎপরে
কহিল, “কাল এমনই সময়ে এইখানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব ।”

রাজ । কাল এখানে আমি থাকিব না ।

রঘু । কোথায় যাইবে ?

রাজ । আমার স্ত্রীকে লইয়া দেশে যাইব ।

রঘুনাথ চমকিয়া উঠিল । রাজমোহন তাহা অন্ধকার মধ্যে লক্ষ্য
করিতে অসমর্থ হইলেন । দস্যু-রাজ জিজ্ঞাসা করিল, “যদি দেশে যাও,
তবে আমাদের কাজে লাগিবে কি প্রকারে ?”

রাজমোহন । তোমাদের কাজ লইয়া কথা, অতশত জিজ্ঞাসা
করিবার প্রয়োজন কি ?

দস্যুপতি । তুমি একটু অপেক্ষা কর—আমি আসিতেছি ।

রঘুনাথ প্রশ্ন করিল । রাজমোহন বুঝিলেন, দস্যুপতি কোথায়
গেলেন । প্রায় দুই দণ্ড পরে রঘুনাথ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, “আমার
সঙ্গে এস ।”

রাজমোহন উঠিলেন । উভয়ে নিশকে পৃথ অতিবাহিত করিয়া স্বল্পকাল মধ্যে বড়বাবুর উদ্যান-বাটীতে সমুপস্থিত হইল । ফটকের নিকট রাজমোহনকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দস্যুপতি উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিল । রাজমোহন অতি সতর্ক পদে তাহার অনুবর্তী হইলেন এবং একটা বাতায়নের ধারে আসিয়া কর্ণোত্তলন পূর্বক দণ্ডায়মান রহিলেন । দুই ব্যক্তি চুপি চুপি কথা কহিতেছে, এরূপ তাঁহার প্রতীতি লইল ; কিন্তু তাহাদের কথোপকথনের ভাবার্থ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না । ক্ষণপরে উক্ত ব্যক্তিদ্বয় গৃহাভ্যন্তর ত্যাগ করত বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন । রাজমোহন তখন শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি অপরকে কহিতেছে, “এখন ওকে চটিও না—আগে কাজটা আদায় করি ।”

অপর ব্যক্তি উত্তর করিল, “ছজুর যেমন আদেশ করবেন তেমনই হবে ।”

প্রথম ব্যক্তি কহিল, “এখন যাও তাকে নিয়ে এস ।”

দ্বিতীয় ব্যক্তি ফটকের দিকে প্রস্থান করিল । রাজমোহন তখন আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রথম ব্যক্তির সমীপস্থ হইলেন । তিনি একটু চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ?”

রাজমোহন উত্তর করিলেন, “আমি রাজমোহন, বড়বাবু ! আপনারই আদেশে এখানে এসেছি ; কিন্তু কথাবার্তার পক্ষে এ স্থানটা তেমন সুবিধাজনক নয়—ঘাটের উপর আসুন ।”

বড়-বাবু বিক্রান্তি না করিয়া রাজমোহনের অনুবর্তী হইলেন । পুষ্করিণীর মুক্ত ঘাটের উপর বসিয়া রাজমোহন জিজ্ঞাসা করিল, “বড়-বাবু সম্ভবত মহাভারত পাঠ করেন নাই ।”

মথুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কথা কেন ?”

রাজমোহন । মহাভারত পঠিত থাকিলে আপনি বল প্রকাশ

না করিয়া কৌশল অবলম্বন করিতেন । শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়া-
ছেন, যেখানে বল প্রয়োগে ফল না হয়, সেখানে কৌশলের
আশ্রয় গ্রহণ করিবে । আপনার রঘু ডাকাত ছই কুড়ি লোকের
সাহায্যে যে কার্য সম্পন্ন করিতে পারে নাই, তাহা আমি একাকী সম্পন্ন
করিতে প্রস্তুত ।

মথুর । উত্তম, তুমি কার্যভার গ্রহণ কর ।

রাজ । কিন্তু অপরের যোগাযোগে আমি কার্য করিতে পারিব
না ; বিশ্বাস হয়, ভার দিন ; না হয়, রঘুকে ধরুন ।

মথু । রঘুনাথ বহুদিন হইতে আমার কার্য করিয়া আসিতেছে,
তুমি কখন কর নাই । তুমি কতদূর সফল হইবে জানি না—

রাজ । সফল না হই, পয়সা দিবেন কেন ? আমি ত বলছি না,
সব টাকাটা এখন আমাকে দিতে হবে ।

মথু । তোমার সৰ্ত্ত কি ?

রাজ । এক মাসের মধ্যে উইলখানি আপনার হাতে দিব, তখন
ছই হাজার টাকা গুণিয়া লইব । এক্ষণে আমার হাত ধরচের কারণ
একশতখানি চাই ।

মথু । ~~টাকাটা~~ কিছু জিয়াদা হইতেছে ।

রাজ । কাজটাও এক্ষণে শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে । আসামী
সতর্ক—উইল স্থানান্তরিত ।

মথু । কোথায় সরিয়েছে ?

রাজ । তাহা সন্ধান লইতে হইবে ।

মথু । টাকাটা কিছু কম করিয়া লও ।

রাজ । আমি দর-দস্তুর করি না, রঘুনাথ তাহা জানে ; আপনার
ইচ্ছা হয় দিবেন, না হয় রঘুনাথকে ভার দিবেন ।

বলিয়া রাজমোহন গাত্রোথান করিলেন । মথুরবাবু তখন কহিলেন,
“আচ্ছা, আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম ।”

রাজ । ভালই করলেন । এই ডাকাতগুলোর মত নিমখহারাম
আর নেই ; দু'টো চড় পিঠে পড়লেই সব কবুল করে ব'সে । এখন
ভাবে উঠলাম ; হাত খরচের টাকাটা লোক দিয়ে আজই পাঠিয়ে দিবেন ।

মথু । তুমি কোথায় থাকবে ?

রাজ । নিজের ঘরে ।

মথু । বেশ—যাও ।

বীজ বপন করিয়া ভাগ্য-দেবী অন্ত্র প্রস্থান করিলেন ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ।



পরদিন প্রভাতে মাধবের প্রেরিত জনৈক ভৃত্য আসিয়া পুরমহিলা-
দিগকে সংবাদ দিল, রাজমোহন নিরপরাধ আবাস্ত হইয়া মুক্তি লাভ
করিয়াছেন । তাহার হস্তে মাতঙ্গিনীর শিরোনামাক্ত একখানা পত্রও
মাধব প্রেরণ করিয়াছিলেন । পত্রখানি ক্ষুদ্র, তাহাতে দুই-ছত্র মাত্র
লেখা ছিল । মাতঙ্গিনী পাঠ করিলেন,—

“দিদি, রাজদ্বারে সুবিচার প্রাপ্ত হইয়া রাজমোহনবাবু মুক্তি লাভ
করিয়াছেন । আমি সত্বর যাইতেছি । মাধব ।”

পত্র পাঠান্তে মাতঙ্গিনী মূহ-কণ্ঠে কহিলেন, “বিচার ঠিক হয় নাই ;
কিন্তু মাধব আমার উপায় করিয়া দিলেন—নিজের সত্য-ধর্ম বিসর্জন দিয়া

আমার উপায় করিয়া দিলেন । কিন্তু—কিন্তু তিনি আমার উপায় করিতেছেন, না, দিন্ দিন্ আমায় নিরুপায় করিয়া তুলিতেছেন ?”

মাতঙ্গিনীর হৃদয় ক্ৰিষ্ণিৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল । তিনি পত্রখানা কনিষ্ঠা ভগিনীর অঙ্কোপরি ফেলিয়া দিয়া একটু নির্জনতা লাভের আশায় স্বীয় কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বেই সন্মুখে দেখিলেন, রাজমোহন দ্বারপথে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । মাতঙ্গিনী কেমন একটু চমকিয়া উঠিলেন । এমন সময় তাঁহার মাসী-মা ও করুণা আসিয়া উপস্থিত হইলেন । রাজমোহন যথাসম্ভব মস্তক আনত করিয়া মাসীমাতাকে একটা প্রণাম করিলেন । ইত্যবসরে মাতঙ্গিনী অবগুষ্ঠন দ্বারা বদন আবৃত করিয়া যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

হেমাজিনী কহিলেন,—“কি হয়েছে, দিদি ?”

মাতঙ্গিনী কোনরূপ প্রত্যুত্তর না করিয়া উৎকর্ণ হইয়া মাসীমাতার কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলেন । মাসী তখন ক্রন্দনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া কহিতেছিলেন, “তা’ কি হয় ! মাতু এখনও সারে নি, এখন সে কোথায় যাবে ? আর দু’দিন যাক্—”

রাজমোহন উত্তর করিলেন, “সে সব হ’বে না আমি এখনই নিয়ে যাব ।”

করুণার ধৈর্য্যাচ্যুতি ঘটিল ; সে কহিল,—“নিয়ে যাব বললেই শু আর যাওয়া হ’ল না ; আগে বাবু আসুন, ছকুম দিন, তা’র পর নিয়ে যাবেন । এখন বাইরে বসুন গে—”

রাজমোহন তথাপি কহিলেন,—“না, আমি এখনই নিয়ে যাব ।”

করুণা সুর চড়াইল, কহিল,—“আপনি বাইরে যান, মেয়েদের কাছে বকুবক্ করবেন না ।”

সনাতন ক্রমপূর্বে তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; কিন্তু এতাবৎ বাঙনিষ্পত্তি করে নাই । এক্ষণে কহিল,—“আপুনি বাইরে আসুন ।”

এটা আহ্বান নয়—আদেশ । রাজমোহন ফাছা বুঝিলেন । তিনি তর্জ্জন করিবেন, কি পলায়ন করিবেন তাহা মীমাংসা করিতে অসমর্থ হইয়া মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তা’ হ’লে কি আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পাব না ?”

মাসী কোনও উত্তর দিবার পূর্বে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী মাতঙ্গিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; এবং করুণার সমীপবর্তিনী হইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমি যাব—মাসীকে বাধা দিতে নিষেধ কর ।”

মৃদুস্বরে উচ্চারিত হইলেও মাতঙ্গিনীর বাক্যানিচয় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হইল । তচ্ছবণে রাজমোহনের বদন হর্ষোৎফুল্ল হইল । করুণা তাহার তান্মুলরঞ্জিত অধরকে সম্পূর্ণভাবে উল্টাইয়া ফেলিল । সনাতন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল । মাসী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া কহিলেন,—“যা’র জন্তে করি চুরি সেই বলে চোর ।” বলিতে বলিতে তিনি তাঁহার দেহখানি লইয়া অদৃশ্য হইলেন ।

পথ পরিষ্কার দেখিয়া রাজমোহন কহিলেন,—“তবে প্রস্তুত হও ।”

প্রস্তুত হইবার বিশেষ কোনও আড়ম্বর প্রয়োজন হইল না,—স্বারেক হেমাঙ্গিনীর নিকট বিদায় গ্রহণ ।

কনীনিকা কহিলেন,—“দিদি, যাচ্ছ কেন ?”

জ্যোষ্ঠা কহিলেন,—“আমি কি চিরদিন এখানে থাকিব ?”

কনীয়সী অগ্রজার চরণ ছুইখানি চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, “হ্যাঁ, দিদি হ্যাঁ ।”

জ্যোষ্ঠা মৃদু হাস্তের সহিত কহিলেন,—“তুই আজও ছেলে মানুষ, কিছু বুঝিস্ নে ।”

মাতঙ্গিনী প্রশ্বানোত্ততা হইলেন, তদৃষ্টে হেমাঙ্গিনী জ্যেষ্ঠার চরণোপরি পতিতা হইয়া মৃদুস্বরে অনেক কান্নাকাটি করিলেন। কিন্তু কিছুতেই মাতঙ্গিনীর সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটিল না,—তিনি প্রশ্বান করিলেন।

রাজমোহন কোথায় অবস্থান করিতে মানস করিয়াছেন, মাতঙ্গিনী তাহা অবগত ছিলেন না ও অবগত হইবার জন্ত কোনরূপ কৌতূহলও প্রদর্শন করেন নাই। যখন দেখিলেন, রাজমোহন তাঁহাকে রাধাগঞ্জের জনশূণ্ড গৃহে আনয়ন করিলেন, তখন তিনি একটু বিষন্ন হইলেন। রাধাগঞ্জে অবস্থান করিতে তাঁহার অভিলাষ নাই। এ স্থান হইতে দূরে—বহুদূরে অপসৃত হইবার জন্ত কেমন একটা ব্যাকুলতা তাঁহার হৃদয়মধ্যে সঞ্জাত হইয়াছে। তিনি রাজমোহনকে কহিলেন,—“আমি দেশে যাইব।”

“কেন ?”

“এখানে থাকিতে আমার মন সরিতেছে না।”

“বেশ তাই হবে। সন্ধ্যার পর খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে আমরা যাত্রা করিব।”

অপরাহ্নে কনক আসিয়া মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, “হ্যাঁরে, তুই নাকি দেশে যাবি ?”

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন,—“সেইরূপ স্থির হয়েছে।”

কনক। কেন, আমাদের অপরাধ ?

মাত। তোমাদের আবার অপরাধ কি দিদি ?

কন। তবে যাচ্ছি কন ?

মাত। এখানে বড় চোর ডাকাতির ভয়।

কন। আর তোর কি নেবে ? সবইত গেছে।

মাতঙ্গিনী ত্রস্তনয়নে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করত মৃদুস্বরে কহিলেন, “চুপ্”।

মাতঙ্গিনী কণ্ঠ সংঘত করিয়া কহিলেন, “যদি একবার ডাকাতি হয়ে গেলে সকল দ্বারই বলশূন্য হ’য়ে যায়। তখন যতই কেন চেষ্টা কর না, যেখানেই কেন যাওনা, দস্যুর কবল হ’তে আর নিস্তার নাই।”

কথাটা মাতঙ্গিনীর ভাল লাগিল না, তিনি নিরুত্তরে অবস্থান করিলেন। কনক তখন অগ্ৰাণ্ড প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া মাতঙ্গিনীর অধরে ও নয়নে হাসি ফুটাইয়া তুলিল। বৃক্ষচ্ছায়া ক্রমে দীর্ঘতর হইতে লাগিল; স্নায়মান রবিকর ক্রমে বৃক্ষচূড়ে উঠিল, অবশেষে ধরাধাম ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল।

মাতঙ্গিনী গৃহে দীপ জ্বালিতে উঠিলেন। কনক কহিল,—“তবে আমাদের জীবনে এই কি শেষ দেখা?”

মাতঙ্গিনী। আমার মন বলিতেছে আবার এখানে আমার আসিতে হইবে।

কনক। আবার তেমনি করে জল আন্তে যাবি, কেমন?

মাতঙ্গিনী। মরণ আর কি! জল আনাইত কাল হল।

সন্ধ্যার কিছু পরে রাজমোহন তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। পাড়ার লোকেরা জানিল, রাজমোহন সস্ত্রীক নিজের দেশে গেল। কিন্তু রাজমোহন এরূপ কার্য্য করিলেন না। তিনি প্রত্যাষে হরিগঞ্জ পহুছিয়া নদীতীরে এক নির্জনস্থানে একটা ক্ষুদ্র কুটার ভাড়া লইলেন। ঘরখানি খড়ের। মাতঙ্গিনীকে তথায় আনিয়া কহিলেন, “এই স্থানে এখন আমাদের কিছুদিন থাকিতে হইবে।”

মাতঙ্গিনী। কেন, দেশে যাওয়া হবে না?

রাজমোহন। আপাততঃ তথায় তেমন সুবিধা দেখিতেছি না।

মাতঙ্গিনী আর কোনরূপ প্রতিবাদ করিলেন না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।



মাধবের ভাগ্যে তাঁহার খুল্লতাত-পত্নীর দর্শন লাভ ঘটিল না । এমন কি মাধবের প্রেরিত দাস-দাসীরাও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল না । মথুরাবাবু তাঁহাকে স্বীয়-গৃহে এমত সতর্কভাবে রক্ষা করিয়াছেন যে, বাহিরের কাক পক্ষীরাও তাঁহার দর্শন পাইত না । মাধবের দাসীরা এইরূপে বারংবার প্রত্যাখ্যাত হইয়া আসিতে আসিতে উভয় সংসার মধ্যে একটা মনোমালিন্যের ব্যবধান মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল । ছোট বাড়ীর দাসীরা প্রতিশোধ লইবার মানসে বড় বাড়ীর দাসীদিগকে অপমানাদি করিতে প্রবৃত্ত হইল । সেই সকল তুচ্ছ ঘটনা নানারূপে অলঙ্কৃত হইয়া মথুরের কর্ণগোচর হইতে লাগিল । মথুর বুঝিয়া দেখিলেন, উভয় গৃহমধ্যে সন্তাব সংরক্ষিত হওয়া কঠিন । সন্তাব রক্ষার বিশেষ কোন প্রয়োজনও তিনি দেখিলেন না ; কেননা উইলের মর্কটমার মাধব পরাস্ত হইলে তাঁহাকে পথের ভিখারী বা ততুল্য একটা কিছু হইতে হইবে । তবু তিনি নিজেকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে মাধবের গৃহে বারেক দর্শন দিলেন । দর্শনের সময়টা কৌশল সহকারে নির্বাচিত হইয়াছিল ; মাধব যে সময় সদর জিলায় ডাকাতি মর্কটমার সাক্ষ্য প্রদান করিতে ব্যাপৃত, মথুর সেই সময়টা উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া মাধবের গৃহে আগমনান্তর দর্শন দিলেন ; এবং মাধব গৃহে নাই শুনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে হুঃখ ও বিষয় প্রকাশ করিলেন । এবিধ মেহ ও আত্মীয়তাতেও মাধবের হৃদয় বিচলিত হইল না,—তিনি মথুরের গৃহে

পদার্পণ করিলেন না । ঘটনাক্রমে পথে উভয়ের মধ্যে একদা সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল ; মাধব মুখ ফিরাইয়া লইয়া অত্ৰপথে গমন করিয়াছিলেন ।

তদবধি প্রকাশ্যরূপে উভয়ের সংসারমধ্যে বিবাদ চন্দ্রিতে লাগিল । গোপন করিবার আর কোনও প্রয়োজন না থাকায় মথুরের কর্মচারিবৃন্দ ও উকীল মোক্তার ছদ্মবেশ পরিত্যাগপূর্বক প্রকাশ্যরূপে উইলের মর্কদ্দমা চালাইতে লাগিলেন । আজিও মর্কদ্দমার গুনানী আরম্ভ হয় নাই ; মথুরের উকীল পুনঃ পুনঃ সময় লইতেছিলেন । সম্ভবতঃ উইলখানি হস্তগত না হইলে মথুর কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে পারিতেছিলেন না । তিনি রাজমোহনের নিকট প্রতিদিন লোক প্রেরণ করিয়া থাকেন । রাজমোহন বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—উইল কোথায় আছে তাহার সন্ধান পাইয়াছি এবং সম্বর তাহা সংগ্রহ করিতে পারিব, একরূপ ভরসা করি ।

যে ব্যক্তি মথুরের পক্ষ হইতে প্রতিদিন রাজমোহনের নিকট যাতায়াত করিত, তাহার নাম বিশ্বনাথ । সে ব্যক্তি মথুরের প্রসাদজীবী অনুচর, নিবাস রাধাগঞ্জের সন্নিকটবর্তী কোনও এক ক্ষুদ্র গ্রামে । তাহার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইবে ; দেহ দুর্বল, আকৃতি খর্ব, চক্ষু ক্ষুদ্র ও কোটরগত ; মাথায় কেশের উপর বিচিত্র প্রণালী ; গুন্দ বড় একটা উঠে নাই, যাহা উঠিয়াছে তাহা লইয়াই মধ্যে মধ্যে বড় একটা টানাটানি পড়িয়া যায় । বর্ণ তাম্রবৎ ; গ্রীবার অংশটা কিছু কম পড়িয়া গিয়াছে এবং বিধাতার ইচ্ছায় তাঁহার চিবুকটা দেহ হইতে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে । নাসিকাও উক্ত পথাবলম্বী হইবে এইরূপ বাঞ্ছা জানাইয়াছে । এইসকল সুশোভন আয়ুধ পরিধৃত হইয়া বিশ্বনাথ অতি গন্তীর ও সতর্কভাবে পথে ঘাটে বিচরণ করিতেন—তাঁহার আশঙ্কা পাছে তাঁহার কন্দর্প-লাঙ্ঘিত রূপ দর্শন করিয়া কুললক্ষ্মীরা গৃহত্যাগ পূর্বক তাঁহার অনুসরণ করেন ।

এই মহা রূপবান্ ব্যাক্ত আপাততঃ হারগঞ্জে অবস্থান করিয়া উইলের মকর্দমা তদ্বির করিতেছেন । তদ্বিরের প্রধান অঙ্গ, উইল সংগ্রহ ; তা' সে দিকে তাহার প্রতিভা সুরণের কোন লক্ষণই দৃষ্ট হইতেছিল না ।

বিশ্বনাথ কয়েকদিন যাবৎ দেখিতেছে জনৈক ছদ্মবেশী ভদ্রব্যক্তি শুশ্রুভাবে তাহাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করিতেছে । বিশ্বনাথ যখন বাসা পরিত্যাগ করিয়া রাজমোহনের কুটার অভিমুখে গমন করে, তখন এই ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিতে থাকে, আবার যখন গৃহাভিমুখ হয়, তখন ছদ্মবেশিন্ পুনরায় তাহার সঙ্গ গ্রহণ করে । যে কোন সময় হউক, বিশ্বনাথ গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলেই এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিয়া তাহার পশ্চাৎ গ্রহণ করে । বিশ্বনাথ কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া পড়িল এবং দিবালোকে রাজমোহনের গৃহে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিল ।

রাজমোহন কিন্তু এতদ্ সম্বন্ধে বড়ই নির্বিকার ছিলেন । তাঁহার কেহ পশ্চাদনুসরণ করিতেছে কিনা, তাহা তিনি কখন ফিরিয়াও দেখেন নাই । তিনি গৃহ হইতে দিবাভাগে কদাচিৎ নিষ্ক্রান্ত হইতেন । বাজারে দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার প্রয়োজন হইলে, তবে তিনি স্বল্পকালের জন্য গৃহত্যাগ করিতেন ; নতুবা গৃহ-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিতেন না । কিন্তু গভীর নিশীথে মাতঙ্গিনী যখন নিদ্রাভিভূতা থাকিতেন, তখন তিনি কুটার-দ্বারে তালা লাগাইয়া অতি রাত্রিতে কোথায় গমন করিতেন এবং রজনী প্রভাত হইবার পূর্বেই গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন । তাঁহার দাসদাসী ছিল না । তিনি নিজে নদী হইতে জল বহন করিয়া আনিতেন । মাতঙ্গিনীকে গৃহ-বাহিরে কদাপি আসিতে দিতেন না ।

মাতঙ্গিনীর কুটারখানি ক্ষুদ্র—একখানি মাত্র শয়নঘর । এ ছাড়া পাকশালা ছিল । কুটারখানি ক্ষুদ্র হইলেও মাতঙ্গিনী তথায় বাস করিয়া কিঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন । তাঁহার বাতায়ন-নিম্নে বেগবতী নদী

সদা প্রবাহিতা । মাতঙ্গিনী নদীপানে চাহিয়া থাকিয়া অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন । কত নৌকা, জাহাজ যাতায়াত করিত, মাতঙ্গিনী কোতুহলী হইয়া তাহা গণনা করিতেন । নৌকাখন কুলের নিকট দিয়া বহিয়া যাইত, মাতঙ্গিনী তখন পলকশূন্য নয়নে আরোহীদের প্রতি চাহিয়া থাকিতেন । যখন দেখিতেন তাহাদের মধ্যে কেহই তাঁহার পরিচিত নহে, তখন একটা আরাম, একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেন ; কিন্তু হৃদয়ের কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে একটা আঘাতও পাইতেন । নদীতে তুফান উঠিলে মাতঙ্গিনী ভীতা হইয়া পড়িতেন ; নৌকাগুলি একে একে কুলে লাগাইলে তিনি কিঞ্চিৎ শান্তি অনুভব করিতেন । যদি দৈবাৎ কোন তরনী কুলে আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করত পথ বহিয়া চলিত, তাহা হইলে মাতঙ্গিনী তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া চুপিচুপি বলিতেন, “হে তরি, কুলে এস—শীঘ্র এস—ওই দেখ তোমার পিছনে ঢেউ, পাশে ঢেউ, সম্মুখে ঢেউ—তুমি কুলে এস, তরি !” যদি কোন তরনী মাতঙ্গিনীর উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া ফেনস্তূপ ভেদ করতঃ শীকর-কণা বিকীর্ণ করিতে করিতে হেলিয়া ছলিয়া ডুবিয়া উঠিয়া গমন করিত, তখন মাতঙ্গিনী নিম্পন্দবক্ষে যুক্তকরে উর্দ্ধদৃষ্টিতে কহিতেন, “ভগবন্, উচ্ছ্বল বিপন্নকে রক্ষা কর ।”

একদিন রাত্রিশেষে ঝড় উঠিল । ঝড়ের বেগ তত ভীষণ না হইলেও তাহার শব্দে মাতঙ্গিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল । অন্ধকার-ক্রোড়ে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া পবনদেব বহুবিধ কণ্ঠে গর্জন করিতেছিলেন । তচ্ছবনে মাতঙ্গিনী কেমন একটু ভীত হইলেন ; শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন । অনুভবে বুঝিলেন, রাজমোহন শয্যায় নাই । ইহা অনুভূত হইবামাত্র মাতঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন ; কম্পিত হস্তে পুনঃ পুনঃ দীপ জালিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলেন । তখন তিনি পালঙ্ক হইতে

অবতরণপূর্বক দ্বারসমীপে সতর্ক চরণে অগ্রসর হইলেন । ঘরের দুইটা দ্বার ছিল ; একটা বাহিরের দিকে, অপরটা পাকশালার সম্মুখস্থ উঠানের উপর । মাতঙ্গিনী ভিতরের দ্বার খুলিলেন । চতুর্দিক অছিদ্র অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন । মাতঙ্গিনীর মনে হইল, ভিতরের চেয়ে বাহিরের অন্ধকার গাঢ়তর । তিনি বাটিকি দ্বার বন্ধ করিয়া বাহিরের দিকে যে দ্বার, তদসমীপে আগমন করিলেন ; এবং দ্বারপৃষ্ঠে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া ক্রণকাল দণ্ডায়মান রহিলেন । দ্বারের অপর পৃষ্ঠে একটু বারান্দা ; রাজমোহন এইস্থানে মাদুর বিস্তার করতঃ বিখনাথকে অভ্যর্থনা করিতেন । এই বারান্দার সম্মুখে একটু খোলা মাঠ, তা'র পর রাস্তা । মাতঙ্গিনী যখন দ্বারে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া থাকিয়াও মনুষ্যের উপস্থিতি অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি অর্গলে হস্তার্পণ করিলেন । বুঝিলেন, অর্গল মুক্ত ; দ্বার টানিয়া অনুভব করিলেন, বাহির হইতে তাহা শিকলবদ্ধ । মাতঙ্গিনী ফিরিয়া আসিয়া শয্যার উপর উপবেশন করিলেন এবং গভীর চিন্তায় নিমজ্জিতা হইলেন ।

ক্রণপরে বাহিরে শিকলের শব্দ হইল । মাতঙ্গিনী বুঝিলেন, রাজমোহন প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন । তিনি তখন শয্যায় শয়ন করিয়া একান্ত নিদ্রাভিত্তার স্থায় রহিলেন । রাজমোহন ধীর পদে কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন ।

পরদিবস রাত্ৰিতে মাতঙ্গিনী সতর্ক রহিলেন । তিনি ছল করিয়া সুষুপ্তি স্থিতির স্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিলেন । মধ্য রাত্ৰিতে রাজমোহন শয্যাভ্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং দীপ জালিয়া দেখিলেন, মাতঙ্গিনী নিদ্রাভিত্তা । তখন তিনি কক্ষ ভ্যাগ করিয়া বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিলেন । মাতঙ্গিনীর অনুমান হইল, তালাও বন্ধ হইল ।

তৃতীয় দিবস রাত্ৰিতেও মাতঙ্গিনী দেখিলেন, রাজমোহন পূর্ববৎ

গৃহত্যাগ করিলেন । স্ত্রী আশঙ্কা করিলেন, স্বামী কোনরূপ অবৈধ কার্যে ব্রতী হইয়া হরিগঞ্জে অবস্থান করিতেছেন । কার্য্য কি, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিলেন না ; কিন্তু সেটা যে মাধবের পক্ষে কল্যাণকর নহে, ইহা মাতঙ্গিনী স্থির করিলেন ।

পরদিবস সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথ যখন বারান্দায় উপবেশন করণান্তর মুহূর্ত্তে রাজমোহনের সহিত বাক্যালাপ করিতেছিল, তখন মাতঙ্গিনী দ্বারপৃষ্ঠে কর্ণ সংলগ্ন করিয়া তাহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন । কিন্তু তাহারা এতই সতর্ক যে, দুই চারিটা অসংলগ্ন কথা ছাড়া আর কিছুই মাতঙ্গিনীর শ্রুতিগোচর হইল না । একবার শুনিলেন, বিশ্বনাথ বলিতেছে, 'উইল' ; আর একবার শুনিলেন, রাজমোহন কহিতেছেন, "আজ যা' হয় ।" অবশেষে মাতঙ্গিনীর কর্ণগোচর হইল, রাজমোহন কহিতেছেন, 'কাল সকালে আসিও ।' মাতঙ্গিনী চিন্তিত হৃদয়ে রক্ষনশালায় প্রবেশ করিলেন ।

কর্ণপরে রাজমোহন আসিয়া কহিলেন, "আমি একবার বাজারে যাইব—কপাটটা বন্ধ করিয়া দাও ।"

রাজমোহন প্রস্থান করিলেন । মাতঙ্গিনী উন্মুক্ত দ্বার সমীপে দণ্ডায়মান থাকিয়া অন্ধকারময় নদীপানে চাহিয়া বসিলেন । তাহার ইচ্ছা হইল, নদীগর্ভে আত্মবিসর্জন করিয়া যন্ত্রণাদায়ক চিন্তার দায় হইতে মুক্তিলাভ করেন । কিন্তু মৃত্যু ঘটিলে একটা সুখকরী চিন্তা, আরামদায়িনী স্মৃতি জীবনের সহিত বিলুপ্ত হইবে, ইহা মাতঙ্গিনী সহ করিতে পারিলেন না । মৃত্যু অপেক্ষা জীবনটা সুখময়, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়া মাতঙ্গিনী দ্বার বন্ধ করিতে উদ্যত হইলেন ।

এমন সময় দ্বার পার্শ্ব হইতে কে ডাকিল, "মা !"

সম্বোধিতা চমকিতা হইয়া দ্বার বন্ধ করিলেন । আগন্তুক কহিল,—

“মা, আগে আমার একটু পরিচয় দিই, তা’হলে আপনি নির্ভয় হইবেন । আমার নাম গোরহরি, নিবাস রাধাগঞ্জ হইতে এক দিবসের পথ, মথুর আমার সর্ব্ব্ব অপহরণ করিয়াছে । দলীল জাল করিয়া, বিষয় সম্পত্তি লইয়াছে, ডাকাতি করিয়া স্ত্রীকে লইয়াছে, ঘর জ্বালাইয়া দিয়া আমাকে আশ্রয়শূন্য করিয়াছে । কদবধি আমি তাহার শত্রু, অলক্ষ্যে আমি তাহার পিছে পিছে ঘুরিতেছি । মাধব বাবুর বাড়ীতে ডাকাতি হয়, মথুরের চক্রান্তে । আমি সে দিন লাঠি ধরিয়া মথুরের দলকে কিঞ্চিৎ বাধা দিয়াছিলাম । আমি জানি আপনি মাধব বাবুর হিতৈষিনী, তাই আপনাকে বলিতে সাহস পাইতেছি, মাধব বাবুর খুড়ার উইলখানি সরাইবার চেষ্টা চলিতেছে—”

মাতঙ্গিনী কণকালের জন্ত স্থান কাল পাত্র বিস্মৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “উইল কোথায় আছে ?”

গোরহরি কহিল, “মাধব বাবুর উকীল ললিতচন্দ্র নন্দীর কাছে ।”

এমন সময় দূরে সন্মুখের পথে মনুষ্যপদ শব্দ শ্রুত হইল । মাতঙ্গিনী অনুমান করিলেন, রাজমোহন প্রত্যাবর্তন করিতেছেন । তিনি বাটতি দ্বীর বন্ধ করিয়া রুকনশালা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । গোরহরি অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইল ।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ ।

উকীল ললিতচন্দ্রের গৃহে আজ সন্ধ্যায় একটা বড় গুঁহের ভোজ চলিয়াছে । তিনি সচরাচর একরূপ ভোজ দিয়া থাকেন, এটা কেহ যেন মনে না করেন । স্বার্থ না থাকিলে তিনি একটা পয়সাও ব্যয় করেন না । তাঁহার চরিত্র বিবিধরূপে কলুষিত, অথচ তিনি নিজের তহবিল হইতে একটা পয়সা লইয়াও প্রবৃত্তি চরিতার্থতার ব্যয় করিতেন না । মক্কেল বা বন্ধুবান্ধবদিগের স্বল্পে আরোহণ পূর্বক তিনি সকল ব্যয় নির্বাহ করিতেন । তিনি পরের গৃহে নিঃসঙ্কোচে আহার করিয়া বেড়ান, কিন্তু নিজের গৃহে কখন কাহাকেও আহ্বান করেন না । লোকে বলিত, তাঁহার চক্ষু আছে, কিন্তু চক্ষুর আবরণ মাই ; হৃদপিণ্ড আছে, কিন্তু হৃদয় নাই ।

তবে আজ যে তিনি এই বৃহৎ ব্যাপারের অমুষ্ঠান-করিয়াছেন, তাহার একটা বিশেষ কারণ ছিল । অনেক স্থানীয় হাকিম স্থানান্তরে বদলী হইয়া যাইতেছেন ; তাঁহার বিদায় উপলক্ষে আজ এই অমুষ্ঠান । ললিতচন্দ্রের কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় হইবে বটে, কিন্তু তিনি মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ব্যয় অপেক্ষা লাভটাই বেশী ; কেন না, একদিকে কয়েকটা রত্নমুদ্রা, অপরদিকে জাতি ও প্রতিপত্তি ।

ললিতচন্দ্র জাতিতে ছোট ; ব্রাহ্মণ কার্যে তাঁহার গৃহে অন্নজন গ্রহণ করেন না । হাকিমরা অনেকেই বিদেশে জাতি বিচার করেন না ;— একটা নিমন্ত্রণ পাইলেই ‘হজুর’ ‘হজুর’ শব্দটা বারংবার শুনিবার অভি-

প্রায়ে ছুটি আসেন । তাঁহাদের অনুজীবীরা তখন আর থাকিতে পারেন না,—জাতি-মাহাত্ম্য সহসা বিস্মৃত হইয়া মহাজনের পস্থা অনুসরণ করেন । মানব-চরিত্রের এ গুঢ় রহস্য ললিতচন্দ্রের নিকট অবিদিত ছিল না । তিনি হাকিম ও হাকিম-সমাজের অনুগ্রাহকদের মহাভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন । নিমন্ত্রিত সুধীজন ললিতচন্দ্রের গৃহে আসিয়া পদার্পণ করিলেন এবং প্রত্যেক পলায় গ্রাসের সহিত ললিতচন্দ্রকে জাতিনামক বৃক্ষশাখার উত্তোলন করিতে লাগিলেন ।

প্রতিপত্তি লাভেও ললিতচন্দ্র নিরাশ হইলেন না । বিচারপ্রার্থীরা যখন শুনিল যে, হাকিমবন্দ ললিতচন্দ্রের গৃহে আহারাদি করিয়াছেন, তখন অনেকেই কাছায় টাকা বাঁধিয়া তাঁহার গৃহাভিমুখে ছুটিল । স্মতরাং দেখা যাইতেছে, ললিতচন্দ্রের হিসাবে কোনরূপ ভুল হয় নাই ।

তাঁহার গৃহখানি ক্ষুদ্র, কিন্তু ইষ্টক-নির্মিত ও দ্বিতল; নীচে ছুটি ছোট ঘর, উপরেও তাই । তা' ছাড়া কয়েক খানা চালা ঘর ছিল । ললিতচন্দ্র ও তাঁহার পিতৃপুরুষ পূর্বে কখন ইষ্টকের গৃহে বাস করেন নাই ; এক্ষণে তাহাতে বাস করিতে পাইয়া ললিতচন্দ্র গর্বেতে অর্দ্ধ-মুদ্রাধিকারী ভেকবৎ স্ফীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং কহিয়া থাকেন, তিনি আরও দশ দ্বিখানা ইটের বাড়ী নির্মাণ করিবেন ।

গৃহস্থানাভাব প্রযুক্ত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের জন্ত নিম্নতলটা ছাড়িয়া দিতে হইল । কাগজপত্র বাস্তব পেটরা নীচের একটা চালাঘরে স্থানান্তরিত করিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিদিগের জন্ত স্থান করা হইল । মাধবের খুড়ার উইলখানা একটা পেটারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া এই চালাঘরে নীত হইল ।

ভোজের ব্যাপার সমাধা হইতে অর্দ্ধরাত্রি অতিবাহিত হইল । গৃহে দীপের পর দীপ—প্রভাত আগমনে নক্ষত্রতুল্য—নির্ঝাপিত হইয়া

আসিতে লাগিল। মনুষ্যকণ্ঠাখিত কোলাহলের পরিবর্তে দলীপত্র-
লেহন-ব্যাপ্ত শৃগাল কুকুরের কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। পথে
মনুষ্য চলাচল বিরল হইল। এমন সময় একটা কৃষ্ণকারী মনুষ্যমূর্তি
কৃষ্ণবসনে সমাচ্ছাদিত হইয়া ললিতচন্দ্রের গৃহ-প্রাঙ্গণস্থ বৃক্ষতলে দাঁড়াইল।
অনেকক্ষণ পরে গৃহমধ্য হইতে একব্যক্তি বাহিরে আসিল এবং নিঃশব্দ
পদসঞ্চারে বৃক্ষতলে উপনীত হইয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তির সহিত সম্মিলিত
হইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি, গৃহকর্তার উড়িয়া ভৃত্য—নাম নিমাই। প্রথম
ব্যক্তি আমাদের পরিচিত রাজমোহন।

উভয়ের মধ্যে ক্ষণকাল কর্ণে কর্ণে পরামর্শ চলিল। তৎপরে উভয়ে
বৃক্ষতল ছাড়িয়া চালাঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ঘরের ভিতর প্রবেশ
করিয়া রাজমোহন দ্বার বন্ধ করত দীপ জালিল। নিমাই প্রহরার্থে দ্বারে
রহিল। স্বল্পকালমধ্যে রাজমোহন কার্য সমাধা করিয়া বাহিরে আসিল
এবং নিমাইয়ের হাতে পাঁচটা টাকা গুণিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ ।



পরদিন প্রভাতে বিশ্বনাথ আসিয়া রাজমোহনকে জিজ্ঞাসা করিল,
“কি হ'ল ?”

রাজমোহন বিজ্ঞতার সহিত উত্তর করিলেন, “হবে আবার কি ? বে
কাজে আমি লাগি, সে কাজ হাসিল করে ছাড়ি।”

বিশ্ব। উইল তবে পেয়েছ ?

রাজ। নিশ্চয়।

বিশ্ব । কই, দেখি ।

রাজ । আগে তোমাদের টাকাটা দেখি ।

বিশ্ব । টাকা আমার কাছে নেই ।

রাজ । উইলও আমার কাছে নেই ।

বিশ্ব । কথাটা ঠিক বুঝলে না ; আমি বলছি না উইলখানা আমার দেও । আমি একবার দেখতে চাই, কাগজখানা ঠিক কি না ।

রাজ । এ কথাটা মন্দ নয় ; কিন্তু টাকাটা কবে পাইব ?

বিশ্ব । বাবু আসিলে দিব ।

রাজ । তিনি কবে আসিবেন ?

বিশ্ব । আজ কাল । মকদ্দমা তিনদিন বাদে উঠিবে ; হাকিম আর সময় দিবেন না কহিয়াছেন । উভয় পক্ষকেই এবার আসিতে হইবে ।

রাজমোহন তখন উঠিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন । তথায় মাতঙ্গিনী ছিলেন । তাঁহাকে কার্যাস্তরে পাকশালার প্রেরণ করিয়া রাজমোহন গুপ্তস্থান হইতে উইলখানি বাহির করিলেন । তৎপরে উঠানে কিছুকাল ঘুরিয়া, হাত পায়ে কিঞ্চিৎ মাটি মাখিয়া বিশ্বনাথের সমীপে ফিরিয়া আসিলেন । রাজমোহন চতুর্দিকে তীক্ষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া বস্ত্রাভ্যস্তর হইতে উইলখানা বাহির করিতে করিতে কহিলেন, “মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলাম, কি জানি যদি কেহ চুরি ডাকাতি করে ।”

এটা মিথ্যা কথা ; কিন্তু বিশ্বনাথ তাহা বুঝিল না ; সে ভাবিল, “রাজমোহন বড় ছ’সিয়ার—ছলেবলে ইহার কাছে কিছুই করিতে পারিব না ।”

উইল দেখিয়া বিশ্বনাথ প্রস্থান করিল ।

রাজমোহন সমস্ত দিবস গৃহের বাহির হইলেন না । উইলের

প্রহরার অথবা পথে বাহির হইলে নিমাই উড়ের সহিত সাক্ষাৎ ঘটতে পারে, এই আশঙ্কার তিনি সমস্তদিন গৃহে অবস্থান করিলেন। নিমাই তাঁহাকে চিনে না ; এখন তাহাকে চেনা দেওয়াটা ঠিক হইবে না— কি জানি পুলিশ যদি উইলচুরি অপরাধে নিমাইকে লইয়া টানাটানি করে। রাজমোহন স্থির করিয়াছিলেন, তিনি গৃহবাহির হইবেন না ; টাকাটা পাইলেই মাতঙ্গিনীসহ দেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী অন্তরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার পর মাতঙ্গিনী কহিলেন, “ঘরে তেল নুন বাড়ন্ত।”

রাজমোহন। সে কি ! কাল রাতে যে আমি তেল নুন এনে দিয়েছি।

মাত। নুনের সরায় তেলের ভাঁড় পড়ে গেছে।

রাজ। এ রকম পড়ে কেন ? বলি, এ রকম পড়ে কেন ?

মাত। বিড়ালে হস্ত ফেলে থাকবে।

রাজ। বিড়াল আস্তে দেও কেন ? তোমার জালায় কি আমি ফতুর হ'ব ?

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিলেন। তিনি হস্ত ভাবিতেছিলেন, স্বামীর সহিত প্রতারণা করিয়া ভাল করেন নাই ; অথবা হস্ত ক্ষিত্ব করিতে-ছিলেন, বিড়ালের নামে বৃথা দোষারোপ করা উচিত হয় নাই। বঙ্গদেশীর হিন্দুরম্বীদিগের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে, মার্জারের প্রতি মিথ্যা কলঙ্কারোপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য। মাতঙ্গিনী স্থনিশ্চিত জানিতেন, বিড়ালের দ্বারা অপচরের কার্যটা সংসাধিত হয় নাই। মাতঙ্গিনী স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক তৈলের ভাঙ লবণের পাত্রের উপর ভাঙ্গিয়াছেন। একপে দ্বারপার্শ্বে সরিষা গিরা অবনত বদনে কহিলেন, “থাক, একবেলা না হয় নুন তেল নাই হ'ল।”

রাজমোহন কণ্ঠ বিকৃত করিয়া উত্তর করিলেন, “তুমি ত বললে নাই হ’ল; এখন আমার চলে কি প্রকারে? তোমার মাথাটা খেয়ে কি রাত কাটাই?”

মাতঙ্গিনী জানিতেন তাঁহার স্বামীর কথার উত্তর না করিলে তিনি জ্বলন্ত হইবেন। উত্তর করিলেও নিস্তার নাই। হিন্দুরমণী কোমল মৃদুত্বিকা, স্বামী কুস্তকার—যেমন গড়াবে স্ত্রী তেমনই হইবে। মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, “না হয়, আজ আমার মাথাটা খাইয়াই থাকিও।”

এবস্থিৎ ভোজনের আয়োজনে প্রস্তুত না হইয়া রাজমোহন কহিলেন, “তবে দরজাটা বন্ধ কর, আমি চট করে বাজার হতে ঘুরে আসি।” গাত্রবস্ত্র লইতে লইতে রাজমোহন বলিলেন, “এ হতভাগা দেশ ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচি।—এ রকম করে আর থাকা যায় না।”

রাজমোহন প্রস্থান করিবামাত্র মাতঙ্গিনী দ্বার বন্ধ করিলেন; এবং অরিতপদে পালঙ্কের উপর উঠিয়া চালের স্থানবিশেষে খড়ের ভিতর হাত দিলেন। এই গুপ্তস্থানে মাধবের খুড়ার উইল রক্ষিত ছিল। তিনি তাহা বাহির করিয়া লইয়া দীপালোকে কিয়দংশ পাঠ করিলেন। উইলের স্থানে স্থানে মাধবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও দেখিলেন; পরে ভাবিলেন, “এখন এখানি লইয়া কি করিব? কে মাধবের নিকট দিয়া আসিবে?”

অকস্মাৎ গোরহরিকে স্মরণ হইল; পরক্ষণেই ভাবিলেন, “কিন্তু তাহাকেই বা বিশ্বাস কি? কিন্তু এ অবস্থায় তাহাকে বিশ্বাস না করিলে চলে কই? লোকটাকে প্রতারক বলিয়া মনে হয় না।” মাতঙ্গিনী চিন্তামগ্ন হইলেন। মূল্যবান সময় অতিবাহিত হইয়া যায়, এমন সময় দ্বারে মূছ করাঘাত হইল; করাঘাতের সহিত ব্যস্তকণ্ঠে কে ডাকিল, “মা”!

মাতঙ্গিনী উইলখানি বজ্রাভ্যন্তরে রক্ষা করিয়া দ্বারসমীপে আসিলেন ;
জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ?”

বাহিরের ব্যক্তি উত্তর করিল, “আপনার পুত্র গৌরহরি ।”

মাতঙ্গিনী দ্বার খুলিতে সাহস পাইলেন না—অর্গলে হাত দিয়া
দাঁড়াইয়া রহিলেন । গৌরহরি দ্বারের অপর ষ্ঠ হইতে কহিল, “মা,
সর্বনাশ হইয়াছে—উইল চরি গিয়াছে : মথুর এবার দেশের রাজা
হ’ল ।”

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিলেন । গৌরহরি কহিল, “এখন আমি
চলিলাম, মা—রাজমোহন এখনি হয়ত আসিয়া পড়িবে । সহরে ছলস্কুল
—চারিদিকে পুলিশ—”

মাতঙ্গিনী দেখিলেন, বৃথা লজ্জা ও সঙ্কোচ করিলে কার্যোদ্ধার হয় না ।
তিনি দ্বার ঈষন্মুক্ত করিয়া কহিলেন, “আপনি উইল পাইলে মাধব বাবুকে
দিয়া আসিতে পারেন ?”

“নিশ্চয় পারি ; যদি সে জন্তে প্রাণ দিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত ।”

“উইল গ্রহণ করুন ।”

“মা, তুমি উইল পেয়েছ ?”

“বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না—পালান ; মা কালী ছাপনার সহায়
হউন ।”

মাতঙ্গিনী গৌরহরির হস্তে উইল প্রদান করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ
করিলেন ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ ।

পরদিন সন্ধ্যার অনতিপূর্বে রাজমোহন গৃহে বসিয়া গবাক্ষ পথে দেখিলেন, একখানি বড় বজরা নদীবক্ষে ধীরে ধীরে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া হরিগঞ্জের ঘাটে লাগিল । বজরা খানি নয়ন পথে পড়িবা মাত্র রাজমোহন চিনিলেন, মথুর বাবুর বজরা । তাঁহার মন অনেকটা স্থির হইল । তিনি জানিতেন এই বজরা খানি তাঁহার জন্ত দুই সহস্র মুদ্রা বহন করিয়া আনিতেছে ; আর এতগুলি টাকার রাজা মথুরমোহন টাকা গুলি দিবার জন্ত হাত তুলিয়া আসিতেছেন । এই টাকা প্রাপ্তিমাত্র রাজমোহন আর কালবিলম্ব না করিয়া মাতঙ্গিনী-সহ দেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন । রাজমোহন তদভিপ্রায়ে পূর্ব হইতে একখানি নৌকা স্থির করিয়া রাখিতে সচেষ্টিত হইলেন । বিশেষ চেষ্টার কিছুই প্রয়োজন হইল না,—অনতিকাল পরেই একখানি ছোট নৌকা কুল বহিয়া যাইতেছিল । তাহাতে একজন বৃদ্ধ মাঝি ছাড়া দ্বিতীয় আরোহী ছিল না । রাজমোহন মাঝিকে ডাকিয়া শিবগঞ্জের ভাড়া স্থির করিলেন । মাঝি অদূরে নৌকা লাগাইয়া আহাঙ্গাদির চেষ্টা করিতে লাগিল ।

শিবগঞ্জ, কলিকাতা যাইবার পথের উপর । হরিগঞ্জ হইতে রাখা-গঞ্জে যাইতে হইলে যে নদীপথ অবলম্বন করিতে হয়, তাহার মাঝামাঝি রাস্তা হইতে একটা খাল বাহির হইয়া গিয়াছে । এই খাল, শিবশা নদীতে গিয়া পড়িয়াছে । শিবশার উপকূলে বিখ্যাত বাণিজ্য স্থান শিবগঞ্জ । রাজমোহন মানস করিয়াছিলেন, শিবগঞ্জ হইতে দ্বিতীয় নৌকা

গ্রহণান্তর কলিকাতায় আসিবেন । কিন্তু রাজমোহনের চিরবৈরী ভাগ্য-দেবী নিশ্চয় দণ্ড-হস্তে নদী-উপকূলে দণ্ডায়মানা থাকিয়া অন্তরূপ ব্যবস্থা করিতেছিলেন ।

রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় বিশ্বনাথ আসিয়া সংবাদ দিল, মথুর বাবু সদরে শুভাগমন করিয়াছেন এবং তিনি রাজমোহনকে স্বরণ করিয়াছেন । রাজমোহন তদবস্থায় বিশ্বনাথের সমভিব্যাহারে যাইতে উত্তত হইলেন । বিশ্বনাথ কহিল, “উইল থানা সঙ্গে লইয়া যাইতে কহিয়া দিয়াছেন ।”

রাজমোহন উত্তর করিলেন, “সে কাজটা সম্ভবপর নয়—কাজ পত্র নিয়ে রাস্তা হাঁটা হাঁটি আমি কোন কালেই পছন্দ করি না ।”

বিশ্বনাথ । বুঝিয়াছি তুমি আমাদের বিশ্বাস করিতেছ না । ভাবিতেছ, তোমাকে আমাদের আয়ত্রে পাইয়া টাকা না দিয়া তাড়াইয়া দিব ।

রাজ । আমি কি ভাবিতেছি, না ভাবিতেছি, তাহা অনুমান করিয়া লইবার বিশেষ কোন প্রয়োজন পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না । আমি এক হাতে টাকা লইব, অপর হাতে দলীল দিব ।

বিশ্ব । বেশ, কর্তাকে তাহাই জানাইব ।

বিশ্বনাথ প্রস্থান করিল ; এবং দুই তিন দণ্ড পরে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজমোহনকে কহিল, “টাকা আনিয়াছি উইল দাও ।”

রাজমোহন কোনরূপ উত্তর না করিয়া গৃহের চতুর্দিক পরিক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অন্ধকার ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, কেহ কোথাও লুকায়িত আছে কি না । কৃষ্ণাষ্টমীর চন্দ্র তখনও গগনে সমুদিত হয় নাই ; তবে অন্ধকার তত গাঢ় নয় । সেই অন্ধকার আলোকে বতদূর মনুষ্যানয়ন দর্শনে সমর্থ, ততদূর পর্যন্ত রাজমোহন

নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, সন্দেহজনক কোন বস্তু বা জীব নাই। তখন তিনি প্রত্যাবর্তন করিয়া বিখনাথকে কহিলেন, “কত টাকা আনিয়াছ ?”

“হুই হাজার ।”

“কই দেখি ।”

বিখনাথ গামছার বাঁধা এক গোছা নোট দেখাইল। সতর্ক রাজমোহন কহিলেন, “গামছাটা খোল ।” বিখনাথ বাঁধন খুলিয়া নোট দেখাইল। রাজমোহন নয়ন দ্বারা পরিমাপ করিয়া দেখিলেন, হুই হাজার টাকার নোট হইতে পারে। তখন তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পালকোপরি উঠিয়া গুপ্ত স্থানে উইলের অব্বেষণ করিলেন। উইল পাওয়া গেল না। রাজমোহন কিপ্রহস্তে চালের খড় টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন; শয্যা পালক খড়ে ভরিয়া গেল, তবু উইল পাওয়া গেল না। তখন তিনি একটু চিন্তা করিলেন; চিন্তান্তে পালক হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক নামিয়া রুকনশালা অভিমুখে রুদ্ধ মূর্তিতে ধাবিত হইলেন। মাতঙ্গিনী তখন চুলার জ্বাল ঠেলিয়া মৃন্ময় পায়ে অন্নপাক করিতেছিলেন; সম্ভবত তিনি রাজমোহনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; কিন্তু যখন সেই রুদ্ধমূর্তি দ্বার পথে দেখিলেন, তখন তাঁহার হৃদপিণ্ড নিস্পন্দ হইল। রাজমোহন ডাকিলেন, “মাতঙ্গিনী !”

এরূপ সম্ভাষণ কখন শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া মাতঙ্গিনী স্মরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আনারাবদ্ধা হরিণীর স্থায় ভীত, কাঁতরনয়নে রাজমোহনের প্রতি উত্তরস্বরূপ চাহিলেন। রাজমোহন ক্রোধবুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উইল কোথায় মাতঙ্গিনী ?”

মাতঙ্গিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না—উত্তর করিবার শক্তি তাঁহার বড় ছিল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাজমোহন মূহ

অথচ সমুদ্র গর্জনবৎ কণ্ঠে কহিলেন, “মাতঙ্গিনি, তুমি মাধবকে ভালবাস ।”

মাতঙ্গিনীর সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল । মর্শ্বস্থানে কি যেন একটা লুকান ছিল, রাজমোহন সহসা তাহাতে হাত দিয়া টালিয়া বাহিরে আনিল । তাহার নয়নে যে ভয় ও কাতরতা ক্রান্তিপূর্বে দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে তিরোহিত হইল । তিনি কহিলেন, “কে আত্মীয় স্বজনকে ভাল না বাসে ? কিন্তু তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, আমি বাচিয়া তোমার সঙ্গে আসিয়াছি ।”

রাজমোহন । তুমিও ভুলিয়া যাইতেছ মাতঙ্গিনী, তুমি নিশীথ রাত্রে আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া মাধবের কল্যাণ কামনার তাহার গৃহে একাকিনী গমন করিয়াছ ।

মাত । দস্যুহস্ত হইতে আমার ভগিনীর মান ও প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম ।

রাজ । ভগিনীর নয়, ভগিনী-পতির । আর আজ তাহারই কল্যাণ কামনার উইল চুরি করিয়া তাহাকে প্রদান করিয়াছ । মাতঙ্গিনী, তোমাকে আমি বড় স্নেহ করিতাম । টাকা আমার বড় প্রিয় ; কিন্তু সেই টাকার উপরেও তোমাকে স্থান দিয়াছিলাম । আজ মাতঙ্গিনী, দুই-ই গেল—স্নেহ, অর্থ দুই-ই গেল ।

মাতঙ্গিনী চুল্লীর সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন । রাজমোহন পুনরায় কহিলেন, “কিন্তু তুমি যে মাতঙ্গিনী, মাধবের উপভোগ্যা হইয়া সংসারে জীবিত থাকিবে, ইহা আমি সহ করিতে পারিব না—আজ তোমার শেষ দিন ।”

মাতঙ্গিনী, রাজমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কহিলেন, “আমিও আর বাঁচিতে ইচ্ছা করি না । তবে তুমি খুন করিয়া কেন বিপদে পড়িবে, আমি নিজেই আত্মহত্যা করিতেছি ।”

রাজমোহন দস্ত বিকসিত করিয়া হাসিয়া উঠিল। বে টুকু ধৈর্য বা আত্মসংযম ও ভাষার সংযম ছিল তাহা তিরোহিত হইল; কহিল,—“না, না, তা হ'বে না হারামজাদী। তোকে স্বহস্তে মারবার সুখ হ'তে আমি বঞ্চিত হ'তে পারি নে—আমি তোকে বড় ভালবাস্তাম।”

রাজমোহন দ্বারপথ অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইল। মাতঙ্গিনী ইতিপূর্বে যে সাহসে বুক বাধিয়াছিলেন, তাহা মৃত্যু সম্মুখে অন্তর্হিত হইল। তিনি ভীতিচিতে চুল্লার দিকে আরও একটু অগ্রসর হইলেন। রাজমোহন দক্ষিণ চরণ উত্তোলন করিল, মাতঙ্গিনীর দেহ তাহার অজ্ঞাতসারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল—রাজমোহনের চরণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চুল্লীর উপর আঘাত করিল। চুল্লী ভাঙ্গিয়া গেল—অন্নপাত্র ভূমিসাৎ হইল এবং অর্ধসিদ্ধ অন্নের কিয়দংশ মাতঙ্গিনীর চরণোপরি নিক্ষিপ্ত হইল। মাতঙ্গিনী যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ করিয়া উঠিলেন। রাজমোহন প্রহারার্থে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়াছিলেন। মাতঙ্গিনীর করুণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক ধ্বনি প্রহারকের কর্ণগোচর হইবামাত্র তাহার উদ্ভত হস্ত শূন্য পথে মস্তমুগ্ধবৎ রহিল।

এমন সময় বাহির হইতে বিশ্বনাথ ডাকিল, “রাজমোহন বাবু, শীঘ্র আইসেন।”

রাজমোহন উত্তর দিল না। বিশ্বনাথ পুনরপি কহিল, “ঋগড়া পরে করব্যান, এহন কাগজ দ্যান, টাহা লয়েন।”

রাজমোহনের উদ্ভত হস্ত নমিত হইল। সহসা তাহার মাথার ভিতর একটা কি চিন্তা প্রবেশ করিল। রাজমোহন মুহূর্তমধ্যে রক্তনশালা পরিত্যাগ পূর্বক বাহিরে আসিল।

বিশ্বনাথ বাহিরে যেখানে উপবিষ্ট ছিল, সেখানে মৃগের পাতে একটা দীপ জলিতেছিল; তৈলাভাব প্রযুক্ত এক্ষণে তাহা নির্বাণোগ্রুথ। সেই

মুহু আলোকোজ্জ্বল স্থানে বসিয়া বিশ্বনাথ একটু উষ্ণ চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার মনে হইতেছিল, বাহিরের গাছ পাতা যেন অন্ধকার হইতে ধীরপদে অগ্রসর হইয়া ঘরের আলো নিবাইতে আসিতেছে। রাজমোহনকে দেখিয়া প্রথমে চমকিয়া উঠিল, পরে আশ্চর্য হইল, কহিল, “কঁতটা মাটির নীচে কাগজখান্ পুঁইতে রাখছিলেন ?”

রাজমোহন কোনও উত্তর না করিয়া সহসা বিশ্বনাথের উপর পতিত হইল এবং তাহার কণ্ঠদেশ দুই হস্তে সবলে বেঠন করিয়া বক্ষের উপর জামু দিয়া উঠিল। ক্ষীণ দুর্বল বিশ্বনাথ জীবন রক্ষার্থে বড় বেশী চেষ্টা করিয়া উঠিতে পারিল না,—মত্ত হস্তীর প্রমত্ত আলিঙ্গনে সঙ্ঘর গতাস্থ হইল।

রাজমোহন তখন বিশ্বনাথের জীবনশূন্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার বস্ত্র মধ্যে নোটের তাড়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। এমন সময় তাহার বাহুমূল কে করদ্বারা ধারণ করিল,—নরর দম্বাকে প্রতিরোধ করাই তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু কোমল লতিকা কোন্ কালে মত্ত মাতঙ্গের গতিরোধ করিতে সমর্থ ? রাজমোহনের তখন সংজ্ঞা বিলুপ্ত, সে মৃগালের স্পর্শামুভব করিল না ; নোট সহ গামছাখানি ধ্বন তাহার হস্তগত হইল, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইল। পার্শ্বে দেখিল, মাতঙ্গিনী দণ্ডায়মান ; কহিল, “তুমি এখানে ?”

রাজমোহন, মাতঙ্গিনীর হস্ত মুষ্টিমধ্যে গ্রহণ করিল। নরবাতীর করস্পর্শে মাতঙ্গিনীর দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি স্থিরা সৌদামিনীর দ্বার অন্ধকার মধ্যে দণ্ডায়মানা রহিলেন। সে উজ্জ্বল আলোক রাজমোহন সহ করিতে পারিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিল। চক্ষুর ভিতরেও সে তীব্র আলোক কুটির উঠিল। সে জ্যোতির্ধরী মূর্তি সম্মুখে রাজমোহন সঙ্কচিত হইয়া তাহার হস্ত ত্যাগ করিল।

উভয়ে যখন নৌকার উঠিলেন, তখন পশ্চিম আকাশে নিবিড় মেঘ সমুদিত হইয়াছে । মাঝি কহিল, “বাবু, পশ্চিমে ম্যাঘ হইছে ।”

রাজমোহন উত্তর করিল, “আরে ম্যাঘে কি করবে? নৌকা ছেড়ে দে ।”

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ ।



উক্ত ঘটনার অত্যন্তকাল পরে গৌরহরি, রাজমোহনের গৃহ-সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইল । গৃহের কুত্রাপি যে দীপ জলিতেছে এমনত বোধ হইল না । গৌরহরি ধীরে ধীরে অন্ধকার মধ্যে অগ্রসর হইয়া দাবার ধারে উপনীত হইল । গৃহ যেন কেমন অস্বাভাবিকরূপে নিস্তর । গৌরহরির অন্তরে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল । দাবার উপর নিঃশব্দে উঠিল; সম্মুখেই দেখিল, এক ব্যক্তি ভূপৃষ্ঠে শয়ান রহিয়াছে । গৌরহরি আত্মগোপন করিবার অভিপ্রায়ে দাবা হইতে বাহিরে নামিয়া আসিল । ক্রমকাল অপেক্ষা করিয়া দেখিল, শায়িত ব্যক্তি কোনরূপ অঙ্গচালনা করিল না—তাহার নিশ্বাসের শব্দও শ্রুত হইল না । গৌরহরি তখন পুনরায় দাবার উঠিল । কক্ষঘরের দিকে চাহিয়া দেখিল; দেখিল দাবার উন্মুক্ত, কক্ষ অন্ধকারময় । অসুভবে বুঝিল, তাহা মনুষ্যশূন্য । গৌরহরি ফিরিয়া শায়িত ব্যক্তির প্রতি চাহিল—তাহার পদতলে উপবেশন করিল; সহসা তাহার মনে উদিত হইল, তাহার সম্মুখে একটা জীবন-

শূণ্ণ দেহ পতিত রহিয়াছে । গৌরহরির প্রত্যেক রোমরন্ধু কণ্টকিত হইয়া উঠিল ।

গৌরহরি আর তথায় অপেক্ষা করিল না, ক্ষিপ্রচরণে পলায়ন করিল । কিয়দূর যাইতে না যাইতে তাহার গতি মন্দীভূত হইল—অবশেষে স্থির হইল । পথমধ্যে দাঁড়াইয়া গৌরহরি কি ভাবিল ; পরে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে প্রত্যাবর্তন করিল । দেখিল, মৃতদেহ পূর্ববৎ ভূপৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছে । তাহাকে ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া আনিয়া উন্মুক্ত স্থানে নিক্ষেপ করিল, এবং তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া তাহার বদন উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল । নক্ষত্রদীপ্তালোকে গৌরহরি তাহাকে সহজেই চিনিল । চিনিবামাত্র তাহার মুখের উপর একটা পৈশাচিক আনন্দের হাসি প্রকটিত হইল । সে তথায় আর বৃথা কালাতিপাত না করিয়া গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল ।

রন্ধনশালায় একটা ক্ষীণালোক জলিতেছিল । গৌরহরি তাহা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া কিঞ্চিৎ রজ্জু সংগ্রহ করিল । গৃহকোণে একটা বারিপূর্ণ মৃন্ময় কলস পড়িয়াছিল, গৌরহরি তাহাও লইল । রজ্জু ও কলস নদীকূলে রাখিয়া আসিয়া বিশ্বনাথের মৃতদেহ বাহু মধ্যে গ্রহণ করিল এবং স্বল্প আয়াসে নদীকূলে বহিয়া লইয়া চলিল । কলসীর পার্শ্বে শব রক্ষা করিয়া তাহার চরণে দড়ি বাঁধিল । অবশেষ রজ্জুর একাংশ স্বীয় হস্ত মধ্যে গ্রহণ করিয়া কলসী সহ জলে নামিল ।

শ্রোত তাড়নে তিনটা জিনিস ভাসিয়া চলিল—গৌরহরি ও তাহার বক্ষনিয়ন্ত্রে ভাসমান কলস এবং কিঞ্চিৎ পশ্চাতে রজ্জুবদ্ধ মৃতদেহ । কূলে নৌকার ভিড় ; গৌরহরি কূল ছাড়িয়া গভীর জলের উপর দিয়া চলিল । অন্ধকার পূর্বাপেক্ষা গাঢ় হইয়া আসিয়াছিল ; আকাশের পশ্চিম প্রান্তে যে নিবিড় মেঘ পূর্ব হইতে সঞ্চারিত হইতেছিল, এক্ষণে তাহা বিপুলাকার

ধারণ করতঃ সমুদয় পশ্চিমাকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। অনেক তারকা-সুন্দরী ভয়ে ভীতা হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বাঁহারা অত্যধিক সাহসিনী, তাঁহারা হই শুধু অনাবৃত বদনে স্বচ্ছ স্থির নীলাকাশে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলেন। গৌরহরি সেই ক্ষীণালোকে আপন গন্তব্য পথ দেখিয়া লইয়া সস্তুরণ পূর্বক মৃতদেহ টানিয়া লইয়া চলিল।

মথুর বাবুর বজরা বাঁধাঘাটের সন্নিকটে অপেক্ষা করিতেছিল। বজরার পশ্চাদ্ভাগ গভীর জলে, সম্মুখভাগ ঘাটের সিঁড়ি হইতে কিছু দূরে। বজরার একটা কামরায় আলো জালিতেছিল। গবাক্ষ উন্মুক্ত থাকার দূর হইতে আলোটা দেখা যাইতেছিল। গৌরহরি এই বজরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। যখন তন্নিকটবর্তী হইল, তখন একবার তীক্ষ্ণ নয়নে চতুর্দিক অবলোকন করিল। নিকটে অন্য কোন নৌকা দৃষ্ট হইল না; বজরার ছাদে মাঝিমালাও দেখা গেল না—সম্ভবত তাহারা আহারাঙ্কে নিদ্রাদেবীর সাধনায় ব্যস্ত ছিল। গবাক্ষপথে আলোকমণ্ডলীর মধ্যে মথুরকে দেখা গেল। গৌরহরি নিঃশব্দে সস্তুরণ পূর্বক বজরার পশ্চাদ্দেশে উপনীত হইল। গৌর শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভাশায় নৌকার স্থান ধরিল। পরে মৃতের অঙ্গ হইতে বসন উন্মোচন করিয়া লইয়া তাহার একাংশ কলস-মুখে, অপরাংশ শবের কর্ণে বাঁধিল। গৌরহরির হস্তমধ্যে রজ্জুর একপ্রান্ত নিহিত ছিল, সেই প্রান্ত এক্ষণে হালের সহিত শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দিল। এ জন্ত গৌরহরিকে কিছু সময়ের জন্ত জলনিম্নে অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

কার্য্য সমাধা করিয়া গৌরহরি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল; এবং কিয়দূর স্রোতানুকূলে গিয়া অবশেষে তীরে উঠিল। যে স্থানে উঠিল, সে স্থান হইতে তাহার বাসা বড় বেশী দূর নয়। গৌরহরি বাসার পঁছিবার পূর্বেই সোঁ সোঁ শব্দে বড় উঠিল এবং মেঘে সমস্ত আকাশ

ভরিয়া গেল। সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে কোন রকমে পথ অতি-
বাহিত করিয়া গৃহে পঁছছিল। দ্বার বন্ধ করিয়া দীপ জালিল এবং সিক্ত
বস্ত্র ত্যাগ করিয়া একখানি পত্র লিখিতে বসিল।

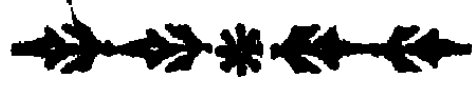
পত্র লেখা শেষ হইলে গোরহরি দেখিল, আকাশ ভাঙ্গিয়া বারিপাত
হইতেছে। গৃহ মধ্যেও মুক্ত বাতায়ন পথে বৃষ্টি আসিতেছে; কিন্তু গোর-
হরি লিপিলিখনে এতই নিবিষ্টচিত্ত যে, এ সকল বৃত্তান্ত অনবগত ছিল।
একবার দ্বার খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল; বিহ্বাদাম ব্যতীত আর
কিছুই তাহার নয়নগোচর হইল না। গোরহরি দ্বার বন্ধ করিয়া দিল এবং
শুক বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সিক্ত বস্ত্র পুনঃগ্রহণ করিল। তৎপরে দীপ
নির্বাণিত করিয়া পত্রখানি মুঠার ভিতর লইয়া গৃহ ত্যাগ করিল।

পথে ষাইতে ষাইতে গোরহরি কতবার পড়িল, উঠিল; কতবার
বিপথে গিয়া পথ হারাইল; তথাপি সে নিরস্ত হইল না। তিন চারি
দণ্ড পরে সে তাহার গন্তব্য স্থান কোতওয়ালীতে উপনীত হইল।
তথায় কক্ষমধ্যে একজন সিপাহী গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকিয়া পাহারা
দিতেছিল। কক্ষদ্বার উন্মুক্ত, গৃহ উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। দ্বিতীয়
মনুষ্যমূর্ত্তি গোরহরির নয়নগোচর হইল না। প্রহরীকে উঠাইয়া পত্র-
খানা দিবে কিনা গোরহরি একটু চিন্তা করিল। তাহার আশঙ্কা হইল,
নিদ্রাভঙ্গের অপরাধে প্রহরী তাহাকে নির্যাতনও করিতে পারে। তখন
সে অন্য উপায় না দেখিয়া প্রহরীর পাগড়ীর একপ্রান্তে পত্রখানা গুঁজিয়া
দিল।

শেষ রাত্রিতে পাহারা বদলীর সময় সিপাহী দেখিল, তাহার পাগড়ীতে
একখানি পত্র রহিয়াছে। সে “কেয়া ছয়া” “কেয়া ছয়া”-রবে পত্রখানিকে
অভ্যর্থনা করিল; এবং নিশি প্রভাতে কোতওয়ালের হস্তে প্রদান
করিল। কোতওয়াল পত্র পাঠ করিলেন;—

“বাঁধাঘাটে একখানি বজরা বাঁধা আছেক । সেখানি রাধাগঞ্জের জমীদার মথুর বাবুর হইবার লাগে । তিনি অণু রোজ ইহনে আগমন করছেন । ফাঁড়ির ঘড়িতে যখন পাহারা বদলীর ঘণ্টা বাজবার লাগে; তখন মথুর বাবু তাঁহার গোমস্তা বিশ্বনাথকে গর্দান টিপি মারিছেক । লাস মজকুর সরাইতে এহনও সম্মত হইবেন নাই—হাইলে বাঁধা থাকিতে পারেক । ছজুরের তদন্তে সকলি মালুম হইবেক ।”

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ।



রাজমোহনের নৌকার মাঝি যখন দেখিল, পশ্চিমাকাশে বিপুল মেঘাড়ম্বর হইতেছে, তখন সে কহিল, “কর্ত্তা বড়ি মাঘ হইছে ।”

তাঁহার কথার কেহই উত্তর দিল না । আরোহীন্দর নিজ নিজ হৃদয়-বীথক চিন্তাভারে পীড়িত হইয়া স্থান কাল বিস্মৃত হইয়াছিলেন । ক্ষণ-কাল এইভাবে অতীত হইবার পর সহসা মাতঙ্গিনী আচ্ছাদকের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন ।

রাজমোহন জিজ্ঞাসা করিল, “কোথা যাও ?”

মাতঙ্গিনী উত্তর প্রদান না করিয়া বাহিরে বসিলেন ।

রাজমোহন পুনরপি কহিল, “বাহিরে কেন ?—ভিতরে এস ।”

মাতঙ্গিনী কহিলেন, “না ।”

রাজমোহন বাহিরে উঠিয়া আসিল । সে সন্দেহ করিল, মাতঙ্গিনী আত্মহত্যা মানসে বাহিরে আসিয়াছেন । রাজমোহন তাঁহার পার্শ্বে

উপবেশন করিল। মাতঙ্গিনী নদী পানে মুখ ফিরাইয়া ধারের দিকে সরিয়া বসিলেন।

মাতঙ্গিনী প্রতিমূহুর্তে জীবন দুর্ক্বে অনুভব করিতেছিলেন। অনুক্ষণ তাঁহার মনোমধ্যে জাগিতেছিল, নরঘ্ন তাঁহার হৃদবিহারী—তিনি নরঘ্নের পাণিগৃহিতা। এই মর্ষব্যথক চিন্তা তাঁহাকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিল।

রাজমোহন ডাকিল, “মাতঙ্গিনী !”

মাতঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিলেন; ধারের দিকে যতটা সরিয়া যাওয়া যার ততটা সরিলেন। মাঝি হাঁকিয়া উঠিল, “লা এক ক্যাং হইছে কর্তা !”

রাজমোহন অপর পাশে সরিয়া বসিল, কিন্তু মাতঙ্গিনীর বস্ত্রাঞ্চল হস্ত মধ্যে গ্রহণ করিল। মাতঙ্গিনী তাহা পছন্দ না করিয়া অঞ্চল আকর্ষণ করিলেন।

রাজমোহন কহিল, “তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না—”

মাতঙ্গিনী অঞ্চল পুনঃ আকর্ষণ করিলেন। রাজমোহন কহিল, “আর আত্মহত্যার প্রয়োজন নাই মাতঙ্গিনী—আমি শপথ করিতেছি, জীবনে তোমার প্রতি আর কখন অত্যাচার করিব না।”

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, “তোমাতে আমাতে একত্রে অবস্থান আর সম্ভবপর নহে।”

রাজমোহন ঈষৎ রুষ্ট হইল। ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া কহিল, “মাতঙ্গিনী, আমি চুরি করি, ডাকাতি করি, সে তোমার জন্ত; আমি খুন করি, অধর্মাচরণ করি, সেও তোমার জন্ত। মাতঙ্গিনী—”

মাতঙ্গিনী উত্তর না দিয়া বস্ত্রাঞ্চল সবলে আকর্ষণ করিল। রাজমোহন, মাতঙ্গিনীর স্বক্কাপরি হস্ত স্থাপন পূর্বক কহিল, “তোমাকে আমি কিছুতেই মরিতে দিব না মাতঙ্গিনী—”

রাজমোহনের করস্পর্শে মাতঙ্গিনীর সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

তাঁহার মনে হইল, যেন নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া তাঁহার অঙ্গ দাহ করিল । তিনি সঙ্কুচিত হইয়া হস্তস্পর্শ হইতে বিমুক্ত হইবার প্রয়াস পাইলেন । রাজমোহন কহিল, “শুন মাতঙ্গিনী, আমার টাকা কড়ি যা’ কিছু, সকলি তোমার জন্ত । তোমাকে সুখে রাখিবার অভিপ্রায়ে—তোমার স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উদ্দেশ্যে—”

মাতঙ্গিনী । তোমার অভিপ্রায় উদ্দেশ্যে বজ্রাঘাত হউক—আমি মরিব ।

রাজমোহন । কেন মরিবে মাতঙ্গিনী ? ভগবানের কাছে কাঁদিলে ক্ষমা পাওয়া যায়, তোমার কাছে কি অপরাধের ক্ষমা নাই ?

মাতঙ্গিনী । তুমি স্বামী, কিন্তু তোমাকে আমি কখন শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারিব না ; অতএব আমি মরিব ।

এমন সময় সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠিল । একটা যেন কৃষ্ণকায় বিকটাকারী দানবী অগ্নিময় নয়নে অনলোৎপাত করিতে করিতে ভীষণ গর্জন সহকারে পশ্চিম আকাশপ্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া বিপুল কেশ দ্বারা সমস্ত গগন সমাচ্ছন্ন করিল । রাজমোহন চমকিয়া উঠিল ; তীব্র স্বরে কহিল, “মাঝি, কূলে লাগাও ।”

“কূল ঠাওর হচ্ছি নে কর্তা, বড়ি অঁধার ।”

বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে তাহার চির অনুগামী তরঙ্গ গর্জিয়া উঠিল । ক্ষুদ্র তরঙ্গী, বায়ু-স্পর্শে ক্ষণপূর্বে মাতঙ্গিনী যেরূপ রাজমোহনের করস্পর্শে কাঁপিয়া উঠিয়াছিলেন, সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল । রাজমোহন উৎকণ্ঠা-তীব্র স্বরে পুনরায় কহিল, “মাঝি, কূলে লাগাও ।”

মাঝি কহিল, “তহনিত কইছিলেম কর্তা, মাঘ উঠছে ; তা’ তুমি ত শুন্না না, এহন কূলে লাগাতে কইছ—এহন কূলে কেমনি লাগাই কও ।”

সহসা আকাশ পৃথিবী আলোকিত করিয়া বিজলী চমকিয়া উঠিল । তদালোকে রাজমোহন দেখিল, কূল বড় বেশী দূর নয়—আর সেই কূলের নিকটে একখানা বড় বজরা স্থির হইয়া অবস্থান করিতেছে । মাতঙ্গিনীও তাহা দেখিলেন । বজরাখানি দেখিবামাত্র তিনি তাহা মাধবের বজরা বলিয়া চিনিলেন । যে বিদ্যুৎ আকাশে খেলিতেছিল, সেইরূপ একটা বিদ্যুৎ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনোমধ্যে চমকিয়া গেল । যে নিবিড় মেঘ ইতিপূর্বে তাঁহার হৃদয়মধ্যে সঞ্চিত হইয়া তাঁহার গন্তব্যপথ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণে বিদ্যুৎ স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে পুঞ্জীকৃত অন্ধকার দূরীভূত হইল,—তিনি তাঁহার পথ দেখিতে পাইলেন, ভাবিলেন, “ছি ছি ! আমি করছিলাম কি ! আত্মহত্যা ! মাধব যে আত্মঘাতীকে ঘৃণা করে—দুর্বলচিত্ত ব্যক্তি মাত্রই যে তাহার ঘৃণার ও দয়ার পাত্র ।” কিন্তু তিনি চিন্তা করিবার বড় বেশী অবসর পাইলেন না—ভয়ঙ্কর গর্জনে মেঘ ডাকিয়া উঠিল—পবনদেবও প্রতিযোগিতা মানসে হুল্লোর রবে গর্জিয়া উঠিলেন । মাঝি চীৎকার করিয়া উঠিল, “সাবধান কর্তা, লা বুঝি আর থাকে না ।” রাজমোহন, মাতঙ্গিনীর অঞ্চল ছাড়িয়া নৌকা আবরকের মধ্যে প্রবেশ করিল ; তথায় নোটের তাড়া একখানা গামছায় বাঁধা ছিল । রাজমোহন তাহা গ্রহণ-মানসে হস্ত প্রসারণ করিল ; এমন সময় ক্ষুদ্র-তরঙ্গী হুলিয়া উঠিল এবং পরক্ষণে ডুবিয়া গেল ।

ক্ষণকালপরে রাজমোহন কূলের সমীপবর্তী হইয়া বজরা ধরিল এবং চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মাতঙ্গিনী এসেছ ?”

বজরার আরোহীরা চমকিয়া উঠিল । গবাক্ নিচয় রুদ্ধ ছিল, তথাপি রাজমোহনের চীৎকার আরোহীদের কর্ণগোচর হইল । একটা গবাক্ উন্মুক্ত হইল ; কক্ষে উজ্জল দীপ জলিতেছিল, নৌকারোহী জিজ্ঞাসা করিল, “কে ?”

রাজমোহন বক্তাকে চিনিল ; কহিল, “মাধববাবু, মাতঙ্গিনী এসেছে ?”

মাধব কহিলেন, “মাতঙ্গিনী ? তিনি কোথায় ?”

রাজমোহন আর বাক্যব্যয় না করিয়া বজরা ছাড়িয়া দিল এবং গভীর জলের দিকে সম্ভরণপূর্বক অগ্রসর হইল। যাইতে যাইতে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “মাতঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী, কোথা তুমি ?”

মাধব মুহূর্তকাল স্থির হইয়া চিন্তা করিলেন। পরে চীৎকার করিয়া কহিলেন, “নিকটে একটা স্ত্রীলোক ডুবেছে—যে তাহাকে রক্ষা করতে পারবে তাহাকে আমি একশ’ টাকা দেব।”

বাক্যের অবসান হইতে না হইতে তিনি গবাক্ষ পথ দিয়া নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদান করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সনাতনও লক্ষ্যত্যাগ করিল ; তদপশ্চাতে কয়েকজন মাঝি-মাল্লাও নদীতে পড়িল।

অন্ধকার নদী—পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গ—অতিকোপন বায়ুর হুকার ; মাধব আত্মজীবনের কোনরূপ চিন্তা না করিয়া নদী-বক্ষে পড়িলেন। কিন্তু কোথায় মাতঙ্গিনী ? নিজের জীবন বিপন্ন করিলেই কি মাতঙ্গিনীকে পাইয়া—বাইবে ? অন্ধকারমধ্যে ফেণমালা পরিবৃত হইয়া মাধব চিন্তা করিলেন, “এ অনন্ত অন্ধকারমধ্যে কোথায় মাতঙ্গিনীকে খুঁজিয়া পাইব ? কিন্তু সে রূপ-জ্যোতিঃ অন্ধকারত লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না—ফুটিয়া উঠিবে—মেঘমধ্যে বিজলীর গ্রায় ফুটিয়া উঠিবে।” মাধবের মনোমধ্যে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। কিন্তু যখন তাঁহার মনে হইল যে, সে বদন নিবিড় কেশদাম কর্তৃক সমাচ্ছাদিত হইলে আরত সে বর্ণজ্যোতিঃ দৃষ্ট হইবে না, তখনই তাঁহার উৎসাহ নিবিয়া গেল। সহসা তাঁহার পদতল মনুষ্যদেহ স্পৃষ্ট হইল। মাধব চমকিয়া উঠিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে মাতঙ্গিনী ?”

“না, আমি সনাতন ।”

“তুমি এসেছ সনাতন ? বেশ, কিন্তু আমার কাছে কেন ?—অন্তস্থানে মাতঙ্গিনীকে খোঁজ ।”

সনাতন একটু পশ্চাতে গেল, কিন্তু নিকটেই রহিল । এতক্ষণ ঝড় বহিতেছিল, এইবার বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, বিছাৎ-ক্ষুরণে এতক্ষণ কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল, এইবার তাহাও অসম্ভব হইল । মাধবের উৎসাহ সম্পূর্ণরূপে নির্বাণিত হইল । তিনি ভাবিলেন, “মাতঙ্গিনী হয়ত এতক্ষণ জীবিত নাই । যদিও তিনি সম্ভরণে সুদক্ষ, এমন কি আমার বাড়ীর সকল স্ত্রীলোকই তাঁহার নিকট প্রতিযোগিতায় পরাস্ত, তথাপি তিনি যে এই উত্তাল-তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া কূলে পহুঁছিতে সমর্থ হইবেন, ইহা সম্ভবপর নয় ।”

মাধব ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন—তাঁহার হস্তপদ শিথিল হইয়া আসিল । এমন সময় তাঁহার পদতল পুনরায় মনুষ্যদেহ স্পৃষ্ট হইল । তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, “কে মাতঙ্গিনী ?”

“না, আমি সনাতন ।”

“এখনও তুমি আমার সঙ্গে ! যাও, মাতঙ্গিনীর অনুসন্ধান করিগে ।”

“আপনি আমার পৃষ্ঠে ভর দিন ।”

“না, না, সনাতন, আমি বেশ সবল আছি—তুমি যাও—মাতঙ্গিনীর অনুসন্ধানে যাও । আমরা জীবিত থাকিতে একটা স্ত্রীলোক ডুবিয়া মরিবে !”

সনাতন আত্মা পালন করিল না—সঙ্গেই রহিল । মাধব বিরক্ত হইলেন । কিন্তু বিরক্তি প্রকাশের অবসর পাইলেন না—এক বিপুলদেহ তরঙ্গ আসিয়া মাধবকে জড়াইয়া ধরিয়া দূরে লইয়া গিয়া ফেলিল । যতক্ষণ বল ছিল, ততক্ষণ তিনি তরঙ্গশিরে ভাসিতেছিলেন । বলশূন্য হইয়া

এক্ষণে তিনি তরঙ্গ কর্তৃক পুনঃপুনঃ আহত হইতে লাগিলেন ; অবশেষে নদী-মৈকতে প্রক্ষিপ্ত হইলেন ।

মাধব বলশূন্য দেহ লইয়া ধীরে-ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন । তাঁহার হস্তপদ শৈত্য ও দুর্বলতার কল্পিত হইতেছিল, তথাপি তিনি মাতঙ্গিনীর অব্বেষণার্থে পুনরায় নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদানে উদ্যত হইলেন । এমন সময়ে সৌদামিনী ধরণীবক্ষে ভাসিয়া উঠিল । তদালোকে মাধব দেখিলেন, সন্নিকটে পুলিনোপরি এক মনুষ্যমূর্তি শয়ান রহিয়াছে । তিনি ক্ষিপ্রচরণে তদভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং বদন অবনত করিয়া দেখিলেন, ছিন্ন বিছালতার গায় মাতঙ্গিনীর দেহ বালুকামূলে শায়িত রহিয়াছে । তিনি চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, “সনাতন, সনাতন, মাতঙ্গিনীকে পেয়েছি ।”

সনাতন নিকটেই ছিল—ছুটিয়া আসিল । তখন উভয়ে মাতঙ্গিনীর চৈতন্যশূন্য দেহ উঠাইয়া লইয়া বজরা অভিমুখে চলিলেন ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ ।



বিশ্বনাথের প্রতীক্ষায় সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া নিশাশেষে মথুরমোহন নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন । প্রভাতে যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন দেখিলেন, পুলীশের সিপাহীরা তাঁহার বজরা বেঁটন করিয়াছে । কোতওয়াল সাহেব কয়েকজন সিপাহীসহ দুইখানা ডিম্বিতে আরোহণপূর্বক বজরার পশ্চাতে অবস্থান করিতেছিলেন । ধীবর ডাকিতে লোক ছুটিয়াছিল, কোতওয়াল তাহারই অপেক্ষা করিতে-ছিলেন । এই কোতওয়াল কিছুকালপূর্বে রাধাগঞ্জের দারোগা

ছিলেন; এক্ষণে সদরে কোতওয়ালরূপে আসিয়াছেন। মথুরমোহন তাঁহার সুপরিচিত। এই সুপরিচিত অত্যাচারী জমীদারকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার বাসনা কোতওয়াল সাহেব বহুকাল হইতে হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু এতাবৎ সুবিধা ঘটয়া উঠে নাই।

বজরার ছাদে উঠিয়া মথুর, কোতওয়ালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “একি, দারোগাবাবু! আমার বজরা ঘিরেছেন কেন?”

মৃদুমধুর হাসিয়া কোতওয়াল উত্তর করিলেন, “বড় অশ্রায় কাজ করে ফেলেছি, বড়-বাবু! এখন উপায়?”

অবিলম্বে কয়েকজন ধীবর আসিয়া পহুছিল। কোতওয়াল সাহেবের উপদেশানুসারে তাহারা বজরার তলদেশে শবের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। হালে রজ্জুর ছিন্নাংশ পাওয়া গেল, কিন্তু মৃতদেহ পাওয়া গেল না। কোতওয়ালের বদন বিস্ময় হইল। ধীবরেরা জলতলে ডুবিয়া নদীগর্ভে অন্বেষণ করিল; কিন্তু কোথায় শব? তখন আরও কয়েকজন ধীবর আহূত হইল। তাহারা জালক্ষেপ করত অনেকটা দূর ব্যাপিয়া নদীতল অন্বেষণ করিল। স্বল্পকাল মধ্যে কোতওয়াল সাহেব ঈঙ্গিত পদার্থ প্রাপ্ত হইলেন; তখন উল্লাসে, গর্বে সশীত হইয়া বজরার উপর জাঁকিয়া বসিলেন।

মৃতদেহ দেখিবামাত্র মথুর চমকিয়া উঠিলেন; সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে একে মারলে, দারোগাবাবু?”

দারোগা উত্তর করিলেন, “একটু অপেক্ষা করুন, মড়াটাকে জিজ্ঞাসা করি।”

ব্যাপারটা কি মথুর বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। মথুরের বদন বিষন্ন হইল—তাঁহার সকল আশা ভঙ্গ হইল। তিনি কখন ভাবিলেন, মাধবের লোক হয়ত বিশ্বনাথকে মারিয়া উইল কাড়িয়া লইয়াছে;

আবার কখন মনে উদয় হইল, মাধবের আত্মীয় রাজমোহন হয়ত বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া বিশ্বনাথকে হত্যা করিয়াছে । তিনি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না ।

কোতওয়ালের তদন্ত শেষ হইতে দুইপ্রহর বেলা অতীত হইল । তখন তিনি লাস থানায় চালান দিবার হুকুম দিলেন । কিন্তু লাস বহিবে কে ? ডোম সংগ্রহার্থে সিপাহী ছুটিল । মথুরকেও চালান দিবার হুকুম হইল । মথুর কহিল, “সে কি, আমাকে কেন ?”

কোতওয়াল সাহেব ঈষৎ হাস্যসহকারে কহিলেন, “রাজদ্বারে আপনার নিমন্ত্রণ—আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেছি ।”

মথুর বিস্মিত হইল । তাহার মন, উইল সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া এতই বিচঞ্চল ছিল যে, কোতওয়ালের তদন্তের প্রতি মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই । তদন্ত শেষ হইয়া গেলেও সে বুঝিল না যে, তাহাকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করা হইতেছে এবং কোশল ও ধমকাদির দ্বারা তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা হইয়াছে ।

ঘাটে ও তটে অনেক লোক সমাগত হইয়াছিল । ভদ্রাভদ্র অনেকেই ছিলেন—তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি তামাসা দেখিতে আসিয়াছিলেন । মথুরের উকীল মোক্তার আসিয়াছিলেন বাবুর নিকট হইতে অর্থ ও উপদেশ গ্রহণ করিতে । কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, কোতওয়াল সাহেব সেই জনসভ্যের সম্মুখে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া মথুরের করযুগলে লৌহবলয় পরাইলেন, তখন তাঁহারা বেগভরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।

আমাদের পরিচিত হরিদাস বাবু দেশমাহাত্ম্য বিস্মৃত না হইয়া উপরি-উক্ত ভদ্র মহোদয়গণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন ; কিন্তু তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন, এ ঘটনা হইতে দুই পয়সা উপার্জিত হওয়া অসম্ভব

নহে । তিনি যখন দেখিলেন, মথুর সিপাহী পরিবেষ্টিত হইয়া নগ্নপদে চলিয়াছেন, তখন তিনি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন । কোতওয়াল সাহেব কিঞ্চিৎ অগ্রগামী হইয়া পাহুকার প্রচণ্ড শব্দ করিতে করিতে সগর্বে চলিয়াছেন ; এবং পথপার্শ্ববর্তী গৃহবাসিনীরা তাঁহাকে দেখিতেছে কি না, ইহাও তিনি অপাঙ্গে দেখিয়া লইতেছেন । হরিদাস বাবুর পশ্চাতে এক দল বালক বালিকা চলিয়াছিল ; তাহাদের অধিকাংশই দিগম্বর বা ততুল্য কিছু । তাহারা কোতওয়াল সাহেব বা বন্দী মথুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল না—তাহাদের দ্রষ্টব্য পদার্থ সিপাহীর লাল পাগড়ী । কেহ কেহ বা কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আত্র ভোজনে কার মন অর্পণ করিয়াছিল ; আবার কেহ বা লক্ষ্যনাদিকার্য্যে ব্যাপ্ত ছিল ; কেহ কেহ যে কলহ করিতেছিল না এমন কথা বলা যায় না । হরিদাস বাবু এই সকল সূক্ষ্ম বালকবৃন্দের সাহচর্য্য পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষিপ্ৰচরণে অগ্রসর হইলেন এবং বন্দীর সমীপবর্তী হইয়া কহিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন মথুর বাবু, আমি আপনাকে খালাস করিব । আপাতত জামিনের দরখাস্ত করিতেছি ।” পরে অন্তরীক্ষের দিকে নেত্রপাত করিয়া কহিলেন, “ওরে, পঞ্চাশ টাকার একখানা ষ্ট্যাম্পু কাগজ নিয়ে আয় ।”

মথুর অপ্যায়িত হইলেন । বিপন্ন হওয়া অবধি তাঁহাকে কেহ একটা সহানুভূতির কথা বলে নাই—তদেশবাসীর স্বভাব চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া তিনি তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য বা সহানুভূতি প্রত্যাশাও করেন নাই । এক্ষণে হরিদাস-প্রমুখাৎ আশা-ভরসার কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল । তিনি কহিলেন, “আমাকে রক্ষা করুন, হরিদাস বাবু, আপনাকে একশ’ বিঘা ভূঁই নিষ্কর দেব ।”

হরি । এ আবার বেশী কথা কি ! আপনি হলেন রাজতুল্য ব্যক্তি ।

মথুর । আমার কেউ নাই হরিদাস বাবু ! এক ছিল মাধব—

হরি । ভয় কি, আশ্বি আছি ।

মথুর । যা' কিছু প্রয়োজন আপনি মুক্ত হস্তে ব্যয় করুন—বজ্রায়
অনেক টাকা আছে—চাবি লউন—কোমর হ'তে খুলে লউন—

হরি । না, না, থাক ।

হরিদাস বাবু বড় মুস্কিলে পড়িলেন ; কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস করিলে
তিনি আর বিশ্বাস ভঙ্গ করিতে পারিতেন না । মথুর বিশ্বাস করিয়া
তাঁহাকে চাবি দিতে না চাহিলে তিনি মথুরের সর্বস্ব অপহরণ করিতেও
কুণ্ঠিত হইতেন না । কিন্তু যখন সে তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তখন তিনি
আর কপর্দকও গ্রহণ করিতে পারেন না । হরিদাস বাবু মহাভ্রুত
হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, “না, না, থাক ।”

দলবল লইয়া কোতওয়াল সাহেব সদর থানায় উপস্থিত
হইলেন । তখন হরিদাস বাবু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, “হাতকড়ি খুলিয়া
লইতে হুকুম হউক, কোতওয়াল সাহেব !”

কোতওয়াল স্বীয় আসনে উপবিষ্ট হইলেন । তাঁহার সম্মুখে হাজত
ঘর ও কাগখানা ; পার্শ্বে তক্তাপোষের উপর ঢালা বিছানা, তদুপরি মুস্লি
ও ছোট বাবু একটা একটা বাক্স কোলে করিয়া উপবিষ্ট । দুই একজন
উকীল মোস্তার ছাড়া থানা ঘরে অপর কেহ প্রবেশাধিকার লাভ করে
নাই । কোতওয়াল তামাক দিতে আদেশ করিয়া ঈষৎ হস্ত সহকারে
হরিদাস বাবুর কথার উত্তর করিলেন, “দিতেছি হরিদাস বাবু, আগে
লক্ষীকে ঘরে তুলি ।”

আসামীর হাতকড়ি খুলিয়া দিয়া তাহাকে হাজত ঘরে আবদ্ধ করা
হইল । হাজতে আর একজন আসামী ছিল,—সে আমাদের পরিচিত
নিমাই উড়ে । প্রহারের প্রতাপে নিমাই উইল-চুরি স্বীকার করিয়াছে ।

কিন্তু এ কার্যে তাহার উৎসাহদাতা কে, তাহা সে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজমোহনের পরিচয় নিমাই অবগত ছিল না। তাহার টাকা খাইয়াছে ও অন্ধকার রাত্রিতে তাহাকে দুই চারি বার দেখিয়াছে, এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে নিমাই সমর্থ হইয়াছে। উকীল ললিত বাবু তথাপি নিরস্ত হইয়া নাই,—কখন ভয়, কখন বা প্রলোভন দেখাইয়া নিমাইয়ের মস্তক মধ্যে একটা ঝড় তুলিয়াছিলেন। এখনও হাজত ঘরের দ্বার-সমীপে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিমাইকে নানা মতে বুঝাইতেছিলেন। নিমাই অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইয়া বসনাংশে বদন আবৃত করত এক্ষণে ক্রন্দনই সার করিয়াছিল।

নিমাই যখন বুঝিল, মথুর বাবু তাহার সঙ্গী হইতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, তখন সে একটু তৃপ্তিলাভ করিল। বসনান্তরাল হইতে বদন মুক্ত করিয়া নয়নাশ্রু মোক্ষণ করিল; এবং বিশেষ কৌতূহলের সহিত মথুর বাবুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মথুর কোমরের ঘুন্সি হইতে চাবি খুলিয়া লইয়া হরিদাস বাবুকে দিল; কহিল, “আপনি মুক্তহস্তে ব্যয় করুন হরিদাস বাবু, কিন্তু আমাকে রক্ষা করুন।”

হরিদাস চাবি লইলেন, কিন্তু নড়িলেন না; কহিলেন, “আপনার উকীলের হাতে চাবি দিন; আমি কখন আপনার কাজ করিনি—আমায় বিশ্বাস করবেন না।”

মথুর। আপনি অনেক দিন হ’তে আমাদের বংশের কাজ করে আসছেন—আপনি আপাততঃ চাবি রাখুন, পরে আমার নারৈবকে দেবেন।

হরিদাস। না, না, আমি চাবি নিতে পারব না।

হরিদাস বাবু চাবি ফেলিয়া দিয়া প্রস্থানোচ্ছত হইলেন; এমন সময়

তথায় রাজমোহন ত্রস্তভাবে আসিয়া হরিদাস বাবুর পিরাণ ধরিয়া টানিল । তাহার পরিধানে একখানি ধূতি মাত্র । নগ্নপদ, নগ্নদেহ, বিশৃঙ্খল কেশ, কর্দ্দমবিলেপিত অঙ্গ—তাহাকে দেখিলেই যেন উন্মাদ বলিয়া ভ্রম হয় ।

রাজমোহন কিরূপে এ সময় কোতওয়ালীতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার একটু পরিচয় প্রয়োজন । আমরা শেষ তাহাকে দেখিয়াছি, সে মাতঙ্গিনীকে নদী-বক্ষে অব্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে । জলে স্থলে যখন তাহাকে পাইল না, তখন সে আত্মজীবন রক্ষার্থে চেষ্টাবিত হইল ; সবিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও নদীকূল তাহার গায় সন্তরণ-পটু ব্যক্তির পক্ষে সহজলভ্য । একস্থানে বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া রাজমোহন আপন অবস্থা পর্যালোচনা করিতে লাগিল । কোমরে হাত দিয়া দেখিল, গামছার বাঁধা নোটের তাড়া কাপড়ের নীচে ঠিক আছে । স্বল্পকাল পরে ঝড় বৃষ্টি ধামিল—আকাশ মেঘমুক্ত হইল—কৃষ্ণাষ্টমীর চাঁদ আকাশের গায় চুপি চুপি উঠিল । রাজমোহন তীক্ষ্ণ নয়নে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । নদীর অপর পারে যেখানে মাধবের বজরা-খানি বাঁধা ছিল, সেখানে বজরা আর নাই, দেখিল । রাজমোহন উঠিয়া একটু অগ্রসর হইল, কিন্তু বজরা কোথাও দৃষ্ট হইল না । তদ্পরিবর্তে একখানি নৌকা দেখিল । রাজমোহন যে পারে ছিল, সেই পারেই এই নৌকাখানি বাঁধা ছিল । কূল বহিয়া নৌকার কাছে গেল ; দেখিল, সেখানি তাহারই নৌকা—মাঝি তন্মধ্যে নির্বিকার চিত্তে শয়ন রহিয়াছে ।

অরুণোদয় হইতে না হইতে রাজমোহন সেই নৌকার আরোহণ পূর্বক হরিগঞ্জ অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিল । নদগর্ভ ও নদীকূল তীক্ষ্ণ নয়নে দেখিতে দেখিতে রাজমোহন চলিল । মাতঙ্গিনীর দেহ কুত্রাপি

দৃষ্ট হইল না ; কিন্তু মাধবের বজরার সহিত পথমধ্যে সাক্ষাৎ ঘটিল । বজরা তখন স্থির নাই—বেগের সহিত বহিয়া চলিয়াছে । রাজমোহন ভৃত্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিল, মাতঙ্গিনীকে জীবিতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে—ছোটবাবু তাঁহাকে একথানা পান্সিতে উঠাইয়া লইয়া হরিগঞ্জ অভিমুখে পূর্বেই প্রস্থান করিয়াছেন—সনাতনও সঙ্গে গিয়াছে ।

এতদ্রূপে রাজমোহন যে বিশেষ আনন্দ অনুভব করিল, এরূপ বলিতে পারি না । তাহার ক্রোধ আপন হইতেই কুঞ্চিত হইয়া আসিল । রাগটা আপাততঃ মাঝির উপর গিয়াই পড়িল ; সে কেন নোকা ডুবিতে দিল ? রসনেঞ্জিরে বজ্রনিদান করিতে করিতে রাজমোহন পথ অতিবাহিত করিয়া চলিল ।

হরিগঞ্জে পঁছঁিতে মধ্যাহ্ন অতীত হইল । ঘাটে ঘাটে অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইল, কিন্তু মাধবের সন্ধান কোথাপি পাইল না । তখন রাজমোহন ভাবিল, হরিদাস বাবু, মাধবের সংবাদ অবগত থাকিতে পারেন । তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে রাজমোহন অবশেষে থানায় আসিয়া উপস্থিত হইল ।

হরিদাস বাবুকে দেখিতে পাইয়া রাজমোহন সোৎসাহে কহিল, “এই যে হরিদাস বাবু ! আপনাকে সকল স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি । মাধব বাবু কোথায় ?”

হরিদাস । মাধব বাবু ? তা' ত জানি না ।

রাজমোহন । তিনি বজরা ছাড়িয়া পান্সিতে আসিয়াছেন ; সঙ্গে—
এমন সময় নিমাই উড়ে কহিয়া উঠিল, “অবধাড় ছজুর ; এই মনুষ্য কাগজ লইছে—মুকে ছাড়ি দাও ।”

কথা কয়টা কোতওয়াল সাহেবের কর্ণে প্রবেশ করিল । তিনি নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন । নিমাইয়ের বাক্য

অবধানান্তে কোতওয়াল মাথা তুলিয়া রাজমোহনের পানে চাহিলেন । তাহাকে দেখিবামাত্র তিনি ঝটিতি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন ; এবং রাজমোহনের সমীপবর্তী হইয়া সহাস্ত্রে তাহার হস্ত ধারণ পূর্বক কহিলেন, “আরে, এ যে আমার পুরাতন বন্ধু—এস এস বঁধু এস, তোমার বিরহে আমরা জর জর—ওরে বঁধুকে আদর আপ্যায়ন কর—”

একজন জমাদার হাসিতে হাসিতে আসিয়া রাজমোহনের করযুগে লৌহবলয় পরাইল ।

হরিদাস বাবু কাসকুসুমগুলা মস্তকে হস্ত বিমর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, “ভায়া আমার সকল শুভ কর্মেই আছেন । কিন্তু বাবা, তোমার মত নিমখ্‌হারাম আমার এতটা বয়সেও দেখি নাই । এবার যদি মাধব বাবু তোমার মত নচ্ছারকে রক্ষা করেন, তা’ হ’লে তাঁর কাজে আমি ইস্তফা দিব ।”

কোতওয়াল সাহেব উত্তর করিলেন, “এবার আর মাধব বাবুকে রক্ষা করিতে হইবে না ; শত মাধব চন্দ্র—”

এমন সময় বাহিরের জনতা ভেদ করিয়া মাধব বাবু স্বয়ং থানা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন । গৃহের যাবতীয় ব্যক্তি কেমন যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ।



জলমগ্ন ব্যক্তির কিরূপে চৈতন্যোৎপাদন করিতে হয় মাধব তাহা ইংরাজী পুস্তক পাঠে কিছু কিছু জানিয়াছিলেন ; কিন্তু মাতঙ্গিনীর জ্ঞান শূন্য অবস্থা দর্শনে মাধব এমন বিকল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সে সকল শিক্ষাদি তাঁহাকে কোনরূপ সাহায্য করিয়া উঠিতে পারিল না । অশিক্ষিত সনাতন, দেশীয় প্রক্রিয়া দ্বারা অবিলম্বে মাতঙ্গিনীর চৈতন্য বিধান করিল । মাতঙ্গিনী চৈতন্য লাভ করিয়াও নির্জীবের গায় মাধবের শয্যোপরি পতিত রহিলেন । সনাতন তাঁহাকে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা গলাধঃ হইল না—স্বক্ৰণী বহিয়া পতিত হইল । তখন মাধব, সনাতনের সহিত পরামর্শ করিয়া একখানি ক্রতগামী পান্‌সী ভাড়া করিলেন ; এবং মাতঙ্গিনীকে লইয়া হরিগঞ্জে আসিলেন ।

তখন প্রভাত হইয়াছে । সহরের এক প্রান্তে নির্জন স্থানে নৌকা লাগাইয়া মাধব, সনাতনকে সহরে প্রেরণ করিলেন । সনাতন চিকিৎসক লইয়া সহর প্রত্যাবর্তন করিল । চিকিৎসক দেখিলেন, রোগিনীর উদরে তখনও কিঞ্চিৎ জল রহিয়াছে ; গম্ভীরভাবে কহিলেন, “চিকিৎসা এক্ষণে সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন ।” মাধব প্রচুর পারিতোষিক দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ; তখন চিকিৎসক অনন্তকর্ম্ম হইয়া চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন ।

মধ্যাহ্ন অতীত হইবার পূর্বে মাতঙ্গিনী সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন

এবং অবগুণ্ঠনে বদন সমাচ্ছাদিত করিয়া দেখাইলেন চন্দ্রমা কিরূপে রাহুর কবলমধ্যে লুক্কায়িত হই। চিকিৎসক একশত খানি রক্তমুদ্রা গ্রহণ করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন এবং মনে মনে মাতঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, “এইরূপ তুমি প্রত্যহ ডুবিও, আর আমার কাছে চিকিৎসার্থে আসিও ।”

স্বল্পকাল মধ্যে মাধবের বজরা দূরে দৃষ্ট হইল । তখন তাঁহার পান্‌সি কূল ত্যাগ করিয়া বজরার উদ্দেশে চলিল ; এবং অনতিবিলম্বে বজরার গায়ে গিয়া ভিড়িল । মাধব তখন মাতঙ্গিনীসহ বজরায় উঠিলেন । পান্‌সির মাঝি বিদায় চাহিল ; মাধব তাহাকে যাহা দিয়া বিদায় করিলেন, তাহা সে একমাস খাটিয়াও উপার্জন করিতে সমর্থ নহে ।

অচিরে বজরা বাঁধা ঘাটে গিয়া লাগিল । তখন মথুরের লোকজনেরা পরামর্শ করিয়া মাধবের দর্শনাভিলাষী হইয়া দাঁড়াইল । মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমরা কি চাও ?”

লোকজনেরা তখন বড় বাবুর বিপদের বার্তা মাধবের গোচরে নিবেদন করিল । মাধব তচ্ছ্রবণে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন । তিনি ক্ষণকাল নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে কোতওয়ালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন । সঙ্গে দুইজন ,দ্বারবান লইলেন ; সনাতনকে লইলেন না—তাহাকে রোগিণীর পরিচর্য্যার্থে রাখিয়া গেলেন ।

কিয়দূর অগ্রসর হইতে না হইতে এক ব্যক্তি নমস্কার করিয়া মাধবকে কহিল, “রাজমোহন বাবুর স্ত্রী আপনাকে একখানি কাগজ দিতে দিয়াছেন ।”

মাধব হস্ত প্রসারণপূর্বক কাগজ গ্রহণ করিলেন । আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখিলেন, সেখানি তাঁহার পিতৃব্যের উইল । বিস্মিত হইয়া আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে ?”

“আজ্ঞে, আমার নাম গৌরহরি, তত্ত্বিন্ন আমার অণু পরিচয় আপাততঃ নাই ।”

বাক্য শেষ হইতে না হইতে গৌরহরি প্রশ্ন করিল এবং সত্বর অদৃশ্য হইল ।

মাধব কোতওয়ালীতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই দেখিলেন, রাজমোহন বন্ধনাবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে । ক্র কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার কি ?”

কোতওয়াল সাহেব আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একথানা কাষ্ঠাসন টানিয়া দিয়া মাধবকে অভ্যর্থনা করিলেন । মাধব সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার কি দারোগা বাবু ?”

দারোগাবাবু হাস্যরসে মুখখানিকে সঞ্জীবিত করিয়া কহিলেন, “এ যাত্রা আপনি কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিবেন না ।”

“তবু ব্যাপারটা কি শুনি ।”

কোতওয়াল সাহেব তখন উইল চুরির পরিচয় দিলেন এবং কিরূপ অকাটা প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিলেন । মাধব মুছ হাসিয়া কহিলেন, “দেখিতেছি আপনারা সকলে স্বপ্ন দেখেন । উইলত আমার কাছে—চুরি গেল কি প্রকারে ?”

বলিয়া তিনি বজ্রাভ্যন্তর হইতে উইল বাহির করিয়া দারোগার নাকের উপর ধরিলেন । ললিতচন্দ্র ও হরিদাস বাবু বিস্ফারিত চক্ষুসহ অগ্রসর হইয়া উইল দেখিতে লাগিলেন । উইল দৃষ্টে ললিতচন্দ্রের বায়স-বিনিন্দিত বর্ণও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; তিনি সোৎসাহে চীৎকার করিয়া কহিলেন, “এইত সে উইল ।”

কোতওয়ালের বদন মলিন হইয়া গেল । হরিদাসবাবু ধৈবতে সুর

চড়াইয়া হাসিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, “একটা মাধবচন্দ্র কি করিতে পারে আগে দেখুন, তারপর শীত মাধবচন্দ্রের কথা তুলিবেন, দারোগাবাবু !”

কোতওয়াল সাহেব স্বহস্তে রাজমোহনের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া কহিলেন, “যাহার হৃদয় আছে, হরিদাস বাবু, সে সব করিতে পারে । আমার মত ব্যক্তি যে কাহাকেও জগতে শ্রদ্ধা করিয়া চলে না, সে ও মাধব বাবুকে সম্মান করে ।”

ললিতচন্দ্র । হৃৎথের বিষয় তিনি আত্মপর চিনিতে পারিলেন না ।

কোতওয়াল । ভুল বুঝিয়াছেন, উকীল বাবু, ভুল বুঝিয়াছেন ; মাধব বাবু আত্মপর খুব চিনেন । এই উইল চুরির ঘটনা সত্য—তিনি জানেন, কে তাঁহার সর্বনাশ করিতে এই উইল চুরি করিয়াছে । জানিয়া শুনিয়াও তিনি যে তাঁহার মহা শত্রুকে ক্ষমা ও রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এইটিই তাঁহার মহত্ব । এ মহত্ব আপনার ঞ্চায় লোকেরা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে না ।

রাজমোহনের মুখ খানি যে বৈশাখী মেঘ তুল্য গম্ভীর হইয়াছিল, তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই । তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “উইল খানা ঐকবার দেখি, মাধব বাবু !”

মাধব উইল দেখাইলেন, রাজমোহন মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহা আপনি কোথায় পাইলেন ?”

মাধব । তাহা আপনার জানিবার প্রয়োজন নাই ।

রাজমোহন । হুঁ ; মাতঙ্গিনী কোথায় ?

মাধব । সে সব কথা পরে হইবে । এখানে এখন আমার একটু কাজ আছে, আপনি অপেক্ষা করিতে পারেন ।

কোতওয়াল সাহেব সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার কি কাজ মাধব বাবু ? আপনাকে যে ভয় হয় ।”

মাধব সহসা কোন উত্তর না করিয়া কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিলেন ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হরিদাস বাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহাকে সাদরে আসনে বসাইয়া নিজে একটা ভগ্নপ্রায় মোড়া টানিয়া লইয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন । হরিদাস বাবুর নয়ন সজল হইয়া উঠিল ; তিনি কহিলেন, “আজকাল একরূপ সম্মান বুড়াদের প্রতি কেহ দেখায় না, দারোগা বাবু !”

কোতওয়াল সাহেব একটু লজ্জিত হইলেন । তিনি আর আসন গ্রহণ করিলেন না—দণ্ডায়মান রহিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কি আদেশ মাধব বাবু ?”

মাধব । বড় বাবুর অপরাধ কি ?

কোতওয়াল সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিয়া সহাস্ত্রে কহিলেন, “এ ক্ষেত্রে আপনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন না ।”

মাধব একটু ভাবিয়া কহিলেন, “দারোগাবাবু, আপনাকে আমি অনেকদিন হইতে চিনি ও জানি । আপনি বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন । আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, আপনার গৃহের উন্মুক্ত প্রান্ত্রে যদি কেহ এক পুঁটুলি গহণা পুঁতিয়া রাখিয়া যায়, তাহা হইলে কি আপনি চোর হইবেন ? উন্মুক্ত নদীগর্ভে অন্ধকার সাহায্যে কেহ যদি মথুরাবাবুর বজরার তলে মৃতদেহ বাঁধিয়া রাখিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি কি হত্যাকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন ? হি, আপনার নিকট এ বিচার আমি প্রত্যাশা করি নাই ।”

কোতওয়াল । প্রমাণ আছে, মাধববাবু, প্রমাণ আছে ।

মাধব । ক্ষমা করিবেন, আপনাদের সংগৃহীত প্রমাণের উপর আমার ততটা আস্থা নাই । আপনি আপাততঃ মথুরাবাবুকে জামিনে খালাস দিন ।

কোত । এ সকল অপরাধে জামিন নাই ।

মাধব । তদন্ত যখন শেষ হয় নাই, তখন আপনি ইচ্ছা করিলেই জামিন লইতে পারেন । আমি পঁচিশ হাজার টাকা জামিন দিতেছি— নিরাপরাধকে কষ্ট দিবেন না, মানী ব্যক্তির মান নষ্ট করিবেন না ।

কোত । কিরূপে জানিলেন মথুরমোহন নিরপরাধ ?

মাধব । আমার বিশ্বাস, আমার ধারণা তিনি নিরপরাধ । আপনিও জানেন—

কোত । না, আমি কিছুই জানি না । আমরা সঙ্গী দেখিয়া অনেক সময় আসামীর বিচার করিয়া থাকি । যিনি রাজমোহনের মুকুবি, দস্যুপতি রঘুনাথের সহচর, তিনি নরঘাতক হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে ।

মাধব । এসব ত আপনার কল্পনার কথা ।

কোত । প্রমাণও আছে ।

মাধব । প্রমাণ আপনি কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । ধমকের দ্বারা যাহা কিছু পাইয়াছেন, তাহাও দায়রায় টিকিবে না ; হাজার লোক আসিয়া আসামীর তরফে সাক্ষ্য দিবে, সে নিরপরাধ । তবে কেন মিছামিছি একটা ভদ্রবংশের মর্যাদা নষ্ট করিতেছেন, আর আপনি নিজেও অপযশ ও অশান্তি আহরণ করিয়া আনিতেছেন ।

কোতওরাল নিরুত্তর রহিলেন ; যুক্তিটা তাঁহার প্রাণে লাগিল । বুঝিয়া দেখিলেন, প্রমাণ তিনি কিছুই সংগ্রহ করিতে পারেন নাই । যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা কৌশিলির ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে । তা' ছাড়া মাধবচন্দ্র উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে মকদ্দমা অচিরে ফাঁসিয়া যাইবে । মাধব পুনরায় কহিলেন, “আপনি কখনপূর্বে কহিয়াছিলেন, আমার হৃদয় আছে ; সততা না থাকিলে হৃদয় থাকিতে পারে না । যদি ইহা প্রকৃতই আপনার অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে আমাকে বিশ্বাস করিতে আপত্তি

কি ? আমি মথুর বাবুর কারণ আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি জামিন রাখিতেছি, আমি নিজেও জামিন হইতেছি ; তাঁহাতেও বিশ্বাস না হয়, মথুর বাবুকে মুক্তি দিয়া আমাকে নজরবন্দী রাখুন ।”

গৃহের যাবতীয় ব্যক্তি চমৎকৃত হইলেন । হরিদাস বাবু সজল নয়নে কহিলেন, “দেবতার পুত্র দেবতাই হয় । স্বর্গীয় কর্তা পরের জন্ত সর্বস্ব দান করিয়াছেন, আর আজ তুমি বাবা, পরের জন্ত প্রাণ দিতে আসিয়াছ । আশী বৎসর বয়সে যাহা দেখি নাই, তুমি আজ তাহা দেখাইলে । আর কি বলিব বাবা, এই বুড়ার অন্তরের আশীর্বাদ, তুমি যেন এই রকমই চিরদিন থাক ।”

কোতওয়াল সাহেব অগ্রসর হইয়া মাধবের দক্ষিণ হস্ত খানি নিজের হস্তঘর মধ্যে গ্রহণ করিলেন, কহিলেন, “আপনার নিকট আমি পরাজয় স্বীকার করিতেছি—”

হাজত ঘর হইতে মথুরমোহন কহিলেন, “আমিও ভাই, তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছি—আমায় ক্ষমা কর ।”

কোতওয়াল কহিলেন, “মাধব বাবু, আপনি জামিন নামায় দস্তখত করুন, আমি মথুরমোহনকে আপনার অনুরোধে মুক্তি দিতেছি ।” পরে জমাদারের প্রতি আদেশ করিলেন, “জমাদার, হাজত ঘর খুলিয়া, দাও— দুইজনকেই ছাড়িয়া দাও ।”

মথুরমোহন মুক্তি লাভ করিয়া একটু কুণ্ঠিত ভাবে মাধবের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন । হরিদাস বাবুর নয়নে তখনও জল ; তিনি বস্ত্র প্রান্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে মুছ হস্ত সহকারে কহিলেন ; “কোতওয়াল সাহেব, আপনার লক্ষ্মীরা যে ঘর খালি করিয়া চলিল ।”

কোতওয়াল সহাস্তে উত্তর করিলেন, “বিষ্ণু-আগমনে তাঁহারা সলজ্জ হইয়া প্রস্থান করিলেন ।”

মাধব হাসিতে হাসিতে কক্ষত্যাগ করিলেন । তাঁহার পশ্চাতে মথুর ও রাজমোহন অপরাধীর ছায় চলিলেন । কোতওয়াল, হরিদাস প্রভৃতি মাধবের সম্বন্ধনার্থে তাঁহার পশ্চাদ্ভ্রমণ করিলেন । তাঁহারা সকলে বাহিরে রোয়াকের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় ডোমেরা শব বহিয়া আনিয়া রোয়াকের নীচে প্রাক্রণে রক্ষা করিল । সকলেই তদুপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন । রাজমোহন তাহা দেখিবামাত্র ভয়ে আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িল । তাহার মুখের পরিবর্তিত ভাব কোতওয়াল সাহেবের নয়নাকর্ষণ করিল । তিনি রাজমোহনের সমীপবর্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ; “এ দেহ কাহার, চিনিতে পার রাজমোহন ?”

সম্বোধিত ব্যক্তি রোয়াকের উপর বসিয়া পড়িল ; এবং হস্তদ্বারা নয়ন আবৃত করিয়া কহিল, “না—না—আমি কিছু জানি না ।” তাহার কটির বসন শিথিল হইয়া পড়িল । কোতওয়াল দেখিলেন, তাহার পরিহিত বস্ত্রের নীচে এক থানা গামছা কোমর বেঁধেন করিয়া বাঁধা রহিয়াছে । তাঁহার ইঙ্গিত পাইবামাত্র জমাদার অগ্রসর হইয়া গামছা খানি খুলিয়া লইল । রাজমোহন কোনরূপ আপত্তি করিল না—আপত্তি করিবার সামর্থ্যও তাহার ছিল না ।

মথুর অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “দেখুন দেখি, গামছায় কি আছে ? আমার দুই হাজার টাকার নোট বিশ্বনাথের কাছে ছিল ।”

গামছা খুলিয়া গুণিয়া দেখা গেল, দুই হাজার টাকার নোট ঠিক রহিয়াছে । দুই এক থানা নোটের পিঠে মথুরমোহনের স্বাক্ষরও রহিয়াছে দেখা গেল । হরিদাস বাবু কহিলেন, “হঁা বাবা রাজমোহন, তুমি এতটা এগিয়ে পড়েছ ? বেশ বাবা, বেশ । তা’ একটা ধাপে পা তুললে আর একটা ধাপের দিকে পা ত আপনিই এগিয়ে পড়ে ।”

কথা কয়টা রাজমোহনের কাণে গেল কি না জানি না ; সে কহিল,

“তোমারই নোট মথুর বাবু, তুমি লও—আমি অপরাধ স্বীকার করিতেছি—”

কোতওয়াল । কি স্বীকার করিতেছ ?

রাজ । আগে আমাকে এ স্থান হইতে সরিয়ে লও, অথবা ঐ টাকে—
ঐ দেহটাকে স্থানান্তরিত কর ।

কোত । করিতেছি—আগে বল ।

রাজ । আমি বিশ্বনাথকে মারিয়াছি—টাকার লোভে তাহাকে মারিয়াছি ।

এইরূপ একটা উক্তি অনেকেই প্রত্যাশা করিতেছিলেন ; তবু তাহা শুনিবামাত্র সকলেই চমকিয়া উঠিলেন । রাজমোহন বলিতে লাগিল, “আমি মাধব বাবুর খুড়ার উইল চুরি করিয়া গৃহে গুপ্ত স্থানে রক্ষা করিয়াছিলাম । আমার স্ত্রী তাহা কোনরূপে জানিতে পারিয়া উইল খানি অপহরণ করিয়াছিল এবং মাধব বাবুর নিকট প্রেরণ করিয়াছিল । গত রাত্রিতে বিশ্বনাথ যখন উইলের মূল্য দুই হাজার টাকা লইয়া আমার কাছে আসিল, তখন আমি উইল খুঁজিয়া পাইলাম না । স্ত্রীকে সন্দেহ করিয়া ধরলাম—তাহাকে পদাঘাত করলাম—তাহার অঙ্গ ‘আঙুনে পোড়াইয়া দিলাম ; অবশেষে—”

মাধব আর তথায় অপেক্ষা করিলেন না—দ্রুত পদে প্রস্থান করিলেন ।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ ।

মাধব বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, উইলের মর্কদ্দমা কারণ তাঁহাকে কিছু দিন এক্ষণে সদর মোকামে অবস্থান করিতে হইবে । এই দীর্ঘ কাল মাতঙ্গিনী তাঁহার সাহচর্য্যে একাকিনী বাস করিতে পারেন না । অতঃপর তিনি হরিদাস বাবুর সাহায্যে ছইজন দাসী সংগ্রহ করিলেন এবং মাতঙ্গিনীর পরিচর্যায় নিযুক্ত করিলেন । তিনি নিজের বৃহৎ বজরা খানি মাতঙ্গিনীর ব্যবহারার্থে ছাড়িয়া দিয়া একখানি নাতি বৃহৎ বজরা ভাড়া লইলেন এবং তাহাতে স্বয়ং অবস্থান করিতে লাগিলেন । ছইখানি বজরা সহরের প্রান্তভাগে নির্জন স্থানে পাশাপাশি বাঁধা রহিল ।

মথুর তাঁহার বজরায় মাধবকে লইয়া যাইবার জন্ত যথেষ্ট যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাধব সে প্রস্তাবে সন্মত হইলেন নাই । মথুর নানাবিধ উপায়ে মাধবের মনস্তষ্টি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল—শৃগালের সেবা গ্রহণ করিতে সিংহের প্রবৃত্তি হয় নাই ।

পরদিবস উইলের মর্কদ্দমা আপীল আদালতে উঠিল । মাধব সদল বলে যথা সময়ে আদালতে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু অপর পক্ষের কাহাকেও দেখা গেল না । মথুর বাবু অদৃশ্য ; তিনি পূর্ব রাত্রিতেই গৃহান্তিমুখে প্রস্থান করিয়াছিলেন । ললিতচন্দ্র সুযোগ পাইয়া ভীষণ তর্জন গর্জন আরম্ভ করিয়া দিলেন । হরিদাস বাবুও ছাড়িলেন না, ছই চারি কথা বলিবার প্রয়াস পাইলেন ; কিন্তু ললিতচন্দ্র তখন উনপঞ্চাশৎ

পবনে বহিতেছিল—বৃদ্ধের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সে ঝঞ্জা-প্রবাহে বিলীন হইয়া গেল। হাকিমের তখন একটু নিজাকর্ষণ হইয়া আসিয়াছিল, ললিত-বাবুর চীৎকারে তাঁহার এবস্থিধ নৈমিত্তিক কার্য্যে সবিশেষ ব্যাঘাত ঘটায় তিনি পুনঃ পুনঃ ললিতচন্দ্রকে নিরস্ত হইবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, অপর পক্ষ যখন নিরুদ্দেশ তখন তাঁহার বক্তৃতার কোন প্রয়োজনই আর নাই। কিন্তু ললিতচন্দ্র তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিবার এবস্থিধ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না; কেন না, তখন তাঁহার অনেকগুলি মক্কেল আদালতে উপস্থিত ছিল। অবশেষে অন্যান্ত উকীলেরা তাঁহাকে কোমর ধরিয়া বসাইয়া দিলেন।

উইলের মকদ্দমায় মাধব সম্পূর্ণ রূপে জয়লাভ করিয়া রাধাগঞ্জ প্রত্যাবর্তন করিতে উদ্ভূত হইলেন। হরিদাস বাবু বিদায় লইতে আসিয়া কহিলেন, “হাকিমের সমক্ষে রাজমোহন অপরাধ স্বীকার করেছে।”

মাধব। তা'র নামোল্লেখ আর করবেন না।

হরিদাস। তা' হলে মকদ্দমার তদ্বির করব না ?

মাধব। না।

হরিদাস বাবু নমস্কার করিয়া বিদায় হইলেন। মাধবও নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। দুইখানি বজরা একত্রে চলিল। দাসীরা মাতঙ্গিনীকে রাধাগঞ্জে পহুছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

অনুকূল শ্রোত ও বাতাস পাইয়া বজরা অতি বেগে চলিল এবং পর দিবস অপরাহ্নে রাধাগঞ্জে পহুছিল। মাতঙ্গিনী আসিয়া দেখিলেন, হেমাঙ্গিনী শয্যা-শায়িতা। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ওয়ে কেন হেম, তোর কি অসুখ করেছে ?”

হেমাঙ্গিনী চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন; কহিলেন “কে দিদি এসেছ ? তবে আর আমার অসুখ নেই।”

মাতঙ্গিনী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, কি হয়েছে রে ?”

হেমঙ্গিনী উত্তর না করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন ; এবং অগ্রজার চরণের উপর পতিতা হইয়া মাথা কুটিতে কুটিতে কহিলেন, “দিদি, আর তোমায় ছেড়ে দেব না ।”

অগ্রজা কমিঙ্গসীকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিলেন, “তুই পাগল !”

হেম । অন্ধকারে আলো চাইলে কি লোকে পাগল হয় ? তুমি যে আমাদের ঘরের আলো ।

মাত । আর তুই বুঝি এই সুন্দর মুখখানা নিয়ে অন্ধকার ?

হেম । দিদি আমি ত আর ছোট নেই ।

মাত । তুই কি খুব বড় হয়েছিস ?

হেম । হাঁ দিদি, এই দেখ না ।

বলিয়া তিনি পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচু হইয়া দাঁড়াইলেন । অল্প সময় হইলে মাতঙ্গিনী হাসিয়া ফেলিতেন, কিন্তু এক্ষণে হাসি আসিল না । মাতঙ্গিনী বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ পূর্বক নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন । তিনি বুঝিলেন, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে যে গুপ্ত কথা লুকায়িত ছিল, তাহা হেমঙ্গিনী, বালিকা হইলেও জানিতে পারিয়াছে ; শুধু তাঁহার হৃদয়ের কথা নয়, আর এক জনের হৃদয়াভ্যন্তরেও উঁকি মারিয়া দেখিতে সমর্থ হইয়াছে, এরূপ মাতঙ্গিনী বুঝিলেন । কণ-কাল চিন্তার পর তিনি কহিলেন, “হেম, আর এখানে থাকিব না—মার কাছে যাব ।”

হেম । ঈস্ ! আমি যেতে দিলে ত ।

মাত । ছেলে মানুষী করিস্ না হেম !

হেম । হাঁ দিদি, রাজমোহন বাবু কোথায় ?

মাতঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন ; কহিলেন, “জানি না ।”

হেমাঙ্গিনী বিস্মিত হইলেন ; বুঝিলেন, ভিতরে কি একটা আছে ; কিন্তু সে সংবাদ মাতঙ্গিনীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারিবেন না বুঝিলেন । তখন তদসংক্রান্ত কোনও প্রশ্নাদি না করিয়া কহিলেন, “দেখ দিদি, আমি তোমাকে ঠিক কথা বলে দিচ্ছি,—তুমি যদি যাও, আমি তোমার পায়ে রক্ত গঙ্গা হ’য়ে মরব ।”

এমন সময় লুপ্তিতাঞ্চলা মাসীমাতা ও অসিতা করুণা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । মাসীমাতা কহিলেন, “বাছা আমার, তুমি নাকি জলে ডুবে গিয়েছিলে ? আহা দেখি ।”

মাতঙ্গিনীর আলুলায়িত কুন্তল মধ্যে মাসীমাতা অঙ্গুলি সঞ্চালন পূর্বক কহিলেন, “চুল গুলো এখনও ভিজ়ে রয়েছে—এই চুলের কাঁড়ি ।”

মাতঙ্গিনী হাসিয়া কহিলেন, “সে যে অনেক দিন হয়ে গেছে মাসিমা ! চুল কবে শুকিয়েছে ।

মাসী সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিলেন, “নদীগুলো রাজ্যের জল নিয়ে ছুটেছে, হতভাগাদের জালায় কেউ যেন চাপ করবে না—নৌকায় চড়বে না ।”

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, “আমি ত মরি নি, মাসি মা, তবে আর নদীকে গাল দেও কেন ?”

মাসী । তুমি যেন সাঁতার জান, তাই কোন রকমে বেঁচে গেছ ; আমি হ’লে কি হত বল দেখি ?

করুণা । হ’ত আর কি ? ডুবে যেতে—হাজির কুমীরে খেত ।

মাসী-মাতা এরূপ পরিণামের কথা শুনিয়া বড়ই অপ্রসন্ন হইলেন ক্রোধের সহিত কহিলেন, “তোকে হাজির কুমীরে থাক্—”

এমন সময় কনক ও তাহার জননী আসিয়া দর্শন দিলেন ।

অভ্যাগতদ্বয় হয় ত অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা করিবেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া মাতঙ্গিনী গাত্রোখান করিলেন এবং কনকের হস্ত ধারণ পূর্বক গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন । জননীও, কন্যা ও মাতঙ্গিনীর অনুবর্তিনী হইলেন ।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ ।



মথুর বাবু স্বয়ং কিছু প্রকাশ না করিলেও তাঁহার অনুচরেরা হরি-গঞ্জের আশ্রয় ঘটনা অতি স্বল্পকাল মধ্যে গ্রামময় রাষ্ট্র করিল ; কিন্তু অতি সাবধানতা সহকারে—পরস্পর পরস্পরকে সতর্ক করিয়া দিল, কথাটা যেন কোনমতে প্রকাশ না পায় । অতএব কথাটা প্রকাশ হইতে বিলম্ব হইল না । দুই এক দণ্ডের মধ্যে গ্রামের সকলেই জানিল, রাজমোহন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে । ইহাও কেহ কেহ শুনিয়া যে, তাঁহাকে ফাঁসীকাষ্ঠে দোহলায়মান অবস্থায় অবস্থান করিতে রহিম মোগ্লা দেখিয়া আসিয়াছে । , করিম মাঝির নিকট কেহ কেহ শুনিয়াছে যে, রাজমোহনের কবর ও শ্রাদ্ধ কার্যাদি সম্পন্ন করিয়া তাহার জরু মাতঙ্গিনী রাধাগঞ্জে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন ।

এ সকল সংবাদ কনক ও তাহার মাতার নিকট যথাকালে পৌঁছিল । কনকপ্রসূতি তচ্ছ্রবণে গ্রীবা ও চক্ষুভঙ্গী দ্বারা বিস্ময়াদি প্রকাশ করিলেন ; এবং উক্ত সংবাদ অন্তর্ভুক্ত প্রচার করিবার বাসনা এতই বলবতী হইল যে, তাঁহার উদর মধ্যে যন্ত্রণাদায়ক শব্দ আরম্ভ হইল । দুই চারি জন প্রতিবেশিনীর নিকট ক্রুদ্ধকণ্ঠে সংবাদটা প্রচার করিয়া তিনি কিঞ্চিৎ

শান্তি অনুভব করিলেন । যখন দেখিলেন, তাঁহার পরিচিতাদিগের মধ্যে বড় একটা কেহই সংবাদটা অবগত নহেন; তখন তিনি মাতঙ্গিনীর আঙ্গমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । অপরাহ্নে যখন জননীর শ্রুতিগোচর হইল, ছোটবাবুর বজরা আসিয়া রাধাগঞ্জের ঘাটে লাগিয়াছে; তখন তিনি সত্বশ্রু-প্রণোদিত হইয়া মাতঙ্গিনীর সাক্ষাতভিলাষে কণ্ঠাসহ যাত্রা করিলেন । জননী পথ মধ্যে স্থির করিয়া লইলেন যে, তিনি মাতঙ্গিনীর বৈধব্যহেতু প্রচুর পরিমাণে অশ্রু বর্ষণ করিবেন এবং পুলিশের লোকেরা কিরূপে নিরীহ ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া শাস্তি দেয়, তাহারও দুই চারিটা দৃষ্টান্ত বিবৃত করিবেন । কণ্ঠা সংকল্প করিলেন যে, রাজমোহনের অসম্ভাবিত বিরোধানে মাতঙ্গিনী নির্ধর অত্যাচারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, ইহা তাঁহাকে অবগত করাইয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ প্রকাশ করিবেন । মাতঙ্গিনী তাঁহাদের বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র উপলব্ধি করিলেন, তাঁহাদের হৃদয় মধ্যে কি মহান্, কি গরিষ্ঠ উদ্দেশ্য সঞ্চালিত হইতেছে; কিন্তু সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে তিনি সমর্থ হইলেন নাই, কেন না, রাজমোহন যে ইহ জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা মাতঙ্গিনী অবগত ছিলেন না । তিনি ইহাও অবগত ছিলেন না যে, রাজমোহন হত্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন । তিনি এইটুকু মাত্র সনাতনের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজমোহন চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু মাধবের কৃপায় ও কৌশলে তিনি অচিরে মুক্তিলাভ করিয়াছেন । হরিগঞ্জে অবস্থানকালে অথবা প্রত্যাবর্তন সময়ে পথমধ্যে তিনি মাধবের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইলেন নাই । তাঁহার সমভিব্যাহারিণী দাসী দুইজন তাহাদের আহার ও বেতন সম্বন্ধীয় ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই অবগত ছিল না । সুতরাং সনাতন-প্রদত্ত সংবাদ ভিন্ন অন্য কোন সংবাদ মাতঙ্গিনী বিদিত ছিলেন না ।

তথাপি মাতঙ্গিনী আশঙ্কা করিলেন, কনক ও তাহার জননী তাঁহাকে কোন অপ্রিয় সংবাদ প্রদান করিতে আসিয়াছেন । তাঁহাদের সে সুযোগ প্রদান না করিয়া নিজেই কহিলেন, “তোমাকে অনেক কথা বলিবার আছে কনক দিদি, কিন্তু আজ আমার সময় নাই—তুমি আর একদিন আসিও ।”

কনক । কেন না, তোর আবার কাজ কি ?

মাতঙ্গিনী । হেমের অসুখ ।

এমন সময় কনক-প্রসূতি চক্ষু মুছিতে মুছিতে তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন । তিনি সজল-নয়নে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহস্থ কাহাকেও কাঁদিতে না দেখিয়া উৎসাহ অভাবে আঁধি-বারি সংবরণ করিয়া লইয়াছিলেন । এক্ষণে তিনি কাঁদিবেন, কি হাসিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া মাঝা-মাঝি একটা ভাব লইয়া কনকের পশ্চাতে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । নয়ন বারি বর্ষণ করিতে প্রস্তুত, কণ্ঠ চীৎকার করিতে সমুদ্রত ; এ দিকে ওষ্ঠদ্বয় হাস্য করিবার জন্য বিষুক্ত অবস্থায় অপেক্ষা করিতেছে । তিনি ত্রস্ত নয়নে দেখিয়া লইলেন, মাতঙ্গিনীর বাম প্রেক্ষুষ্ঠে সধবার চিহ্ন “লৌহ” বর্তমান রহিয়াছে । তৎক্ষণাৎ নয়ন ও কণ্ঠকে বিদায় দিয়া দস্ত ও ওষ্ঠকে তলব দিলেন । কিন্তু ললাট সীমস্তক শূন্য ! অচিরে দস্ত অস্তহিত হইল—জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ গো, তোমার কপালে সিঁছর নেই কেন ?”

মাতঙ্গিনী । ধুরে গেছে—আমি যে ডুবে গিছলুম, তা’ বুঝি জান না ?

কনক । ও মা, সত্যি নাকি ! তা’র পর ?

মাতঙ্গিনী । তা’র পর আর কি ; যমের সঙ্গে তুমুল লড়াই করে এখানে চলে এসেছি ।

কনক । আর রাজমোহনবাবু ?

মাতঙ্গিনী । তিনিও রক্ষা পেয়েছেন ।

কনক-জননী । পুলিশে নাকি তা'কে ধরে রেখেছে ?

মাতঙ্গিনী । ধরেছিল পরে ছেড়ে দিয়েছে ।

কনক-প্রসূতি দেখিলেন, তিনি যে সৌধ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেল ; কেমন যেন একটা নৈরাশুর ছায়া তাঁহার বদনমণ্ডলে প্রকটিত হইল । নয়নাঙ্গ প্রভৃতি যে চারিটা পদার্থ এতক্ষণ আজ্ঞা অপেক্ষায় সজাগ ছিল, তাহারা এক্ষণে বিদায় লইল । জননী মহাশয়া উপায়ান্তর নাই দেখিয়া সহানুভূতি প্রদর্শনে তৎপর হইলেন ; কহিলেন, “পুলিসের কাণ্ডই এই রকম—চোর ছ্যাঁচোড়, খুনে ডাকাত ধরতে পারে না, কেবল নিরীহ লোক নিয়ে টানা-টানি করে ।”

মাতঙ্গিনীর মনে হইতে লাগিল, বক্ত্রীর চক্ষু দুইটা যেন জলিতেছে, আর সেই জ্বালাময় চক্ষু দ্বারা সে যেন তাঁহার অন্তস্থল স্পর্শ করিতেছে । তিনি কনকের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার স্বামীর খবর কিছু পেলে ?”

কনক । কুলীনের আবার স্বামী কোথা ?

মাতঙ্গিনী । একটা ছিল ত জানি ।

কনক । সেটা নাকি দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেছে—তার কোন বার্তাই নাই ।

মাতঙ্গিনী । আবার একটা বিয়ে করতে গেছে না কি ?

কনক । বিয়ে করে রাখবে কোথা ?—ঘর দোর সব পুড়ে গেছে ।

কনক-প্রসূতি কিঞ্চিৎ অন্তমনস্ক ছিলেন ; সহসা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁগা, কথাটা তবে মিছে ?”

মাতঙ্গিনী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন কথাটা ?”

কনক-জননী কহিলেন, “এই জামাইয়ের কথাটা ।”

বক্ত্রী, রাজমোহনকে জামাই নামে সময় সময় অভিহিত করিত, মাতঙ্গিনী তাহা অবগত ছিলেন । এক্ষণে পুনরায় তাহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবা মাত্র মাতঙ্গিনীর বদন বৈশাখী মেঘের গায় গম্ভীর হইল । বক্ত্রী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, “লোকগুলোর মুখে আশুন—জিব খসে যাঃক, পরের ভাল কখন দেখতে পারে না; বলে কি না, জামাই নাকি খুন করেছে, আর পুলিশে নাকি তাকে ধরে ফাঁসী দিয়েছে ।”

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া বক্ত্রী কতকটা সোয়াস্তি অনুভব করিলেন এবং তাহার উদরের স্ফীততা ও যন্ত্রণা বহুল পরিমাণে প্রশমিত হইল । কিন্তু মাতঙ্গিনীর বদনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহার মনোমধ্যে একটা আতঙ্ক সঞ্চারিত হইল; শশবাস্তে কহিলেন, “লোকে কি না বলে ! এই যে কনকের নামে কত কি করেছে; তার অপরাধ কি না সে কুলীনে পড়েছে । তা’ তুমি কিছু মনে করো না মা !”

মাতঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাঁহার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল । কিছু কহিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাসনা দমন করিয়া তিনি দ্বারের উপর নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন । কনক কেমন একটা অশান্তি অনুভব করিল; সে তাহার মায়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কক্ষ বাহিরে আসিল এবং মাতঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, “আমরা তবে এখন আসি ।”

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন না । কনক ও তাহার জননী নিঃশব্দে তঙ্করের গায় প্রস্থান করিল । মাতঙ্গিনী একই ভাবে দ্বার-পথে উর্দ্ধ-দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান রহিলেন । সময় বহিয়া চলিল, মাতঙ্গিনীর তদপ্রতি লক্ষ্য নাই । অন্ধকার ছুটিয়া আসিয়া পৃথিবী অধিকার করিল । মাতঙ্গিনী তথাপি স্থির, নিষ্পন্দ—চিত্রলিখিত মেঘ মধ্যে নিত্য দীপ্ত

সৌদামিনীর শ্রায় অন্ধকারকবলগত গৃহ মধ্যে দণ্ডায়মান রহিলেন । অনেকক্ষণ পরে তাঁহার বদন হইতে নিঃসৃত হইল, “মা দুর্গা, আমাকে রক্ষা কর ।” করুণা কক্ষে দীপ দিতে আসিতেছিল, মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল ; অগ্রসর হইয়া কহিল, “এখানে একা কেন, ঠাকুরাণ ? তোমার ঘরে আলো দিইছি—পরিস্কার করে বিছানা পেতে রেখেছি—”

“করুণা, ছোটবাবু কোথায় ?”

“তাঁর ঘরে ।”

মাতঙ্গিনী, মাধবের কক্ষাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, দ্বারসমীপে সমুপস্থিত হইয়া হেমের নাম ধরিয়া দুইবার ডাকিলেন । উত্তর আসিল না, কিন্তু অলঙ্কার-শিঞ্জিত শ্রুত হইল । মাতঙ্গিনী অগ্রসর হইয়া দ্বার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন ; মাধব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন বটে, কিন্তু মুখ ফিরাইয়া রহিলেন । মাতঙ্গিনী সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাধব বাবু, আমাকে কি সধবার লক্ষণ পরিত্যাগ করিতে হইবে ?”

মাধব চমকিয়া উঠিলেন ; হেমাতঙ্গিনী অন্তরাল পরিত্যাগ পূর্বক অর্দ্ধাবশুষ্ঠনে মাধবের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইলেন । মাতঙ্গিনী উত্তরনা পাইয়া পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মাধব বাবু, সত্য বল—আমাকে কি বিধবার বেশ পরিগ্রহণ করিতে হইবে ?”

“না ।”

“সত্য বলিতেছ ?”

“হঁা ।”

অধীরতা প্রশমিত হইল ।

মাতঙ্গিনী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তিনি কোথায় ?”

মাধব নিরুত্তর ।

অধীরতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল ।

“সত্য বল—তোমার নিকট সত্য কথা পাইব বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—তিনি এক্ষণে কোথায় আছেন ?”

“জেলে ।”

“অপরাধ ?”

“তা’ শুনে কি হবে দিদি ।”

“আমি কিছু কিছু শুনেছি ।”

মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল চিন্তার পর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “নরঘাতকের দণ্ড কি ?”

মাধব নিরুত্তর রহিলেন । মাতঙ্গিনী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রাণদণ্ডই কি ব্যবস্থা হয়েছে ?”

মাধব । এখনও দণ্ডাদেশ হয় নি—প্রাণদণ্ড নাও হ’তে পারে ।

মাতঙ্গিনী । নরঘাতক বলিয়াই কি তুমি তাঁহাকে ঘণাভরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ ?

মাধব । কতকটা তাই বটে । যতদিন তিনি আমার উপর অত্যাচার করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে আমি ক্ষমা করিয়াছি । যখন তিনি মনুষ্য-সমাজের উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে ক্ষমা করিবার আমি কে ?

মাতঙ্গিনী । তাই বলিয়া মানুষকে ঘণা করিবারই বা তোমার অধিকার কি ?

মাধব চমকিয়া উঠিলেন ।

মাতঙ্গিনী পুনরপি কহিলেন, “আর যদি ঘণা করিতে হয় তবে আমাকে কর ।”

মাধব । তোমাকে !

মাতঙ্গিনী । হাঁ আমাকে—আমিই এই নরহত্যার জন্ত দায়ী ।

মাধব পুনরায় চমকিয়া উঠিলেন । তিনি আনতবদনে জীবনের সমস্ত ঘটনা পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন ।

মাতঙ্গিনী সেই চিন্তাশ্রোতে বাধা দিয়া কহিলেন, “মাধব বাবু, দয়া বা স্বর্ণা মনের—বিচারের নয় ।”

মাধব । আমি তাঁহাকে দয়া করিয়াই বা কি করিব ? তিনি এক্ষণে দয়া সাহায্যের বহির্ভূত ।

মাতঙ্গিনী । কেন ?

মাধব । তিনি সকল অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন ।

মাতঙ্গিনী । আমিও তবে আমার অপরাধ স্বীকার করিয়া আসিব—আমাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা কর ।

মাধব । আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি দিদি, অর্থ ও চেষ্টার যতটা হয় আমি ততটা করিব ।

মাতঙ্গিনী । তথাপি আমি নিশ্চিত থাকিতে পারিব না—আমি তাঁহার কাছে যাইব ।

মাধব । গিয়া কি করিবে ?

মাতঙ্গিনী । গিয়া কি করিব জানি না, কিন্তু আমাকে যাইতেই হইবে । শ্রদ্ধাভক্তির উপর বল প্রয়োগ করিতে না পারি, নিজের দেহ ও কর্ণের উপর কতকটা পারি । মাধব বাবু, আমার উপায় করিয়া দাও ।

মাধব নিরুত্তর রহিলেন । মাতঙ্গিনী পুনরায় কহিলেন, “বহুকাল পূর্বে আমাদের গৃহে একজন সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন । তখন আমরা দুই ভগ্নী অনুচ্চা বালিকা মাত্র । পিতার অরুরোধে সন্ন্যাসী আমাদের ভাগ্য গণনা করিয়াছিলেন । তিনি কহিয়াছিলেন, আমাদের দুই ভগ্নীর অদৃষ্টে বৈধব্য যোগ নাই । মাধব, স্থির জানিও, সন্ন্যাসীর কথা নিষ্ফল হইবার নয়,

আমিও তাহা সাধ্যমত নিষ্ফল হইলে দিব না। মন আমাদের মত দুর্বল মনুষ্যের অধীন না হইলেও জীবনটা আশুভাগত—”

এমন সময় করুণা একখানি পত্র লইয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার মুখের উপর ঘোমটা যথেষ্ট পরিমাণে টানা ছিল, তথাপি সে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘ অবগুণ্ঠন দীর্ঘতর করিল। পত্রখানি মাধবের শিরোনামাক্রান্ত ; কিন্তু করুণার এমত সাহস হইল না যে, সে তাহা মাধবের হস্তে প্রদান করে—মাতঙ্গিনীর হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিয়া করুণা অতি সলজ্জ অবস্থায় প্রস্থান করিল।

মাতঙ্গিনী দেখিলেন, শিরোনামা তাঁহার খুল্লতাত ভ্রাতার হস্ত লিখিত। তিনি মাধবকে কখনও পত্র লেখেন না ; এক্ষণে সহসা তাঁহার হস্তলিখিত পত্র দৃষ্টে মাতঙ্গিনী কেমন একটু আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি কম্পিত-হস্তে মাধবকে পত্র প্রদান করিলেন। মাধব পত্র পাঠান্তে অতি বিষন্ন হইলেন ; মাতঙ্গিনী উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সংবাদ ?”

“সংবাদ বড় ভাল নয় ; তোমার পিতা শয্যাশায়ী, তোমাদের দুই জনকে দেখিতে চাহিয়াছেন।”

মাতঙ্গিনী ক্ষণকাল নিস্তব্ধতার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, “রোগ কঠিন ?”

“হাঁ ?”

“বেঁচে আছেন ?”

“সম্ভবত আছেন।”

হেমঙ্গিনী হর্ষ্যতলে বসিয়া পড়িলেন ; মাতঙ্গিনী গৃহপ্রাচীর অবলম্বন পূর্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। মাধব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের অভিপ্রায় কি ?”

উভয়ই নিরুত্তর রহিলেন । অশ্রুপ্রবাহে হেমাজিনীর গণ্ডবক্ষ প্রাবিত হইতেছিল । মাতঙ্গিনীর নয়ন বিগুফ, কিন্তু অরক্তিম—বদন অরুণিত—ওষ্ঠ কম্পিত । মাধব সরিয়া আসিয়া গবাক্ষ সন্নিধানে দাঁড়াইলেন এবং বহির্কর্তী অন্ধকার পানে চাহিয়া রহিলেন ।

• মাতঙ্গিনী ক্ষণপরে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “উচিতানুচিত বুঝিবার শক্তি এখন আমার নাই ; তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর । আমার মন পিতার নিকট যাইবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, কিন্তু আমার কর্তব্য-জ্ঞান, আমার বুদ্ধি বিবেচনা স্বামীর নিকট যাইবার জন্ত ইঙ্গিত করিতেছে । তুমি যাহা ভাল বুঝ, তাহাই কর ।”

মাধব কহিলেন, “এটা স্মরণ রাখিও, তাঁহার পুত্র নাই—তুমিই তাঁহার শ্রাদ্ধাধিকারী ।

মাতঙ্গিনী আর আত্মসংযমে সমর্থ হইলেন না—অঁধিবারি ধৈর্য্য-প্রাবিত করিয়া, নয়নের রুদ্ধ কপাট ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া আসিল । তিনি অলিত-চরণে কম্পিত দেহে কক্ষ ত্যাগ করিলেন ।



অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ ।

সেই রাতেই মাধব, মাতঙ্গিনী ও হেমঙ্গিনী সহ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন । সনাতন ও কনক ছাড়া আরও দুই চারিজন দাসদাসী সঙ্গে চলিল । যাত্রা করিবার পূর্বে মাধব একজন কর্মচারীকে সবিশেষ উপদেশ ও প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া সদর মোকামে হরিদাস বাবুর নিকট প্রেরণ করিলেন ; তাহাকে কহিয়া দিলেন, অর্থব্যয়ে কাতর হইও না, চেষ্টার ক্রটি করিও না—যেমন করিয়া হউক রাজমোহন বাবুকে রক্ষা করিতে হইবে ।

ক্রতগামী নৌকায় আরোহণ করিয়া মাধব স্বল্পকাল মধ্যে বহুদূরে গিয়া পড়িলেন ; তখন জলপথ ত্যাগ করিয়া রেলের উঠিলেন । কলিকাতা রাজধানীতে মাধবের একখানি সুন্দর বাড়ী ছিল ; দুই জন ভৃত্য তথায় অবস্থান করিত ও গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ করিত । মাধব যখন অষ্টপ্রহর অবিরাম ভ্রমণের পর তথায় উপনীত হইলেন, তখন নিশা প্রভাত প্রায় । মাধব ক্ষণকাল বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া মাতঙ্গিনী ও হেমঙ্গিনী সহ শকট-রোহণে স্বপুত্রালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন ।

স্বপুত্রের অবস্থা বড় শোচনীয়—বাঁচিবার আশা নাই । তথাপি মাধব বড় বড় চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসা করাইলেন । কিন্তু মনুষ্যের বিদ্যা ও চেষ্টা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না—নির্দিষ্ট সময়ে আয়ু-ভাণ্ড শূন্য করিয়া তিনি মহাপ্রস্থান করিলেন ।

বিধবা আশ্রয়শূন্য হইলেন ; সম্বলের মধ্যে রহিল দুইটা কন্যা ও

একখানি ক্ষুদ্র কুটার । বৃদ্ধ সামাগ্র চাকুরী করিতেন—কায়ক্লেশে দিন-পাত হইত ; সুতরাং কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই । আত্মীয়-স্বজন দুই চারিজন ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বিপদ দর্শনে সাবধানতা সহকারে দূরে অপসৃত হইয়াছেন ।

• মাধব তখন আশ্রয় ও সম্বল হইয়া দাঁড়াইলেন । শ্রাদ্ধাদি কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করত স্বাগুড়ীকে লইয়া মাধব স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করিলেন ।

স্বাগুড়ীকে নিজের গৃহে রাখিলেন না ; যে গৃহ রাজমোহনের বাসার্থে নির্দিষ্ট ছিল, সেই গৃহে মাধব তাঁহাকে রাখিলেন । মাতঙ্গিনী জননীর নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন । পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে দাস-দাসী নিযুক্ত হইল । মাধব ও হেমাম্বিনী সতত যাতায়াত করিয়া তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিতেন ।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইবার পর সহসা একদিন সংবাদ আসিল, জজ সাহেব, রাজমোহনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ প্রদান করিয়াছেন । মাধবের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—বিষাদের কালিমায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল । কিন্তু সেই কালিমায় মধ্যেও একটা আলোক দেখা গেল । মাধব তদৃষ্টে শিহরিয়া উঠিলেন—হৃদয় মধ্যে অন্বেষণ করিয়া যেখানে যাহা কিছু পাইলেন, তদ্বারা সেই আলোক জ্যোতিকে নির্ঝাপিত করিতে যত্ববান হইলেন ।

রাজমোহনের প্রতি দণ্ডদেশের সংবাদ সত্বরই গ্রাম মধ্যে প্রচার হইল এবং কনক-প্রসূতির অনুগ্রহে স্বল্পকাল মধ্যে মাতঙ্গিনী ও স্বদীয়া জননীর কর্ণগোচর হইল । জননী গৃঢ় বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন না ; তিনি ইংরাজ বিচারের প্রচুর নিন্দা আরম্ভ করিলেন । কিন্তু কনকের মাতা অন্তায় কার্য্য কোন কালে সহ করিতে পারেন না, তিনি অঙ্গাদির অভিনয়-

সহ তীব্র প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন ; কহিলেন, “তোমার জামাইয়ের
‘শুণ ত জান না—’”

মাতঙ্গিনীর সহনাতীত হইল। তিনি কুপিতা হইয়া কহিলেন,
“কনক, তোমার মাতাকে গৃহে লইয়া যাও।”

বক্তৃতার প্রারম্ভে এবিধ বাধা প্রাপ্ত হইয়া কনক-প্রসবিনী জলিয়া
উঠিলেন এবং জামাতা সম্বন্ধীয় বক্তৃতাটি সংবরণ করিয়া লইয়া
প্রস্থানোত্তম হইলেন ; গমনকালে কহিয়া গেলেন, “বাপ্‌রে দেমাক
দেখ! যা’র মিন্‌সে ফাঁসী কাঠে গলা বাড়িয়েছে, তার আবার তেজ !”

কনক, বক্তৃতির হস্ত ধারণ পূর্বক প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বক্তৃতার
বেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই—গৃহে গিয়াও বক্তৃতা মহাশয়া অদৃশ্য ব্যক্তি-
বর্গকে সম্বোধন করিয়া নানারূপ অভিনয়াদি আরম্ভ করিলেন। পরে
গ্রাম্য মহিলাবর্গের মধ্যে কেহ এ সংবাদ অবগত আছেন কি না, তাহার
অনুসন্ধান লইবার জন্ত যাত্রা করিলেন।

পরদিবস সংবাদ আসিল, রাজমোহন জন্মের শোধ একটীবার
মাতঙ্গিনীকে দেখিতে বাসনা করিয়াছেন। তিনি কহিয়া দিয়াছেন,
জীবনে আর সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই—জীবনে তাঁহাকে আর পীড়ন
করিবেন না, বা তাঁহার নিকট কোনরূপ প্রার্থনা করিবেন না—তিনি
শুধু একটীবার মাত্র মাতঙ্গিনীর দর্শন-প্রয়াসী।

মাতঙ্গিনীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার জীবনের
প্রথম অক্ষোপরি যবনিকা পতনোত্তম। দ্বিতীয় অঙ্কে কি আছে?
মনোমুগ্ধকারী চিত্র মানসনয়নে ভাসিয়া উঠিল। চিত্র-নিম্নে দেখিলেন,
মাধবের পবিত্র সংসার-দ্বারে অশান্তি করাঘাত করিতেছে, আর মূর্ত্তিময়
রক্তবর্ণ পাপ টিপি টিপি অগ্রসর হইতেছে। মাতঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিলেন ;
তিনি চিত্রকে পদদলিত করিয়া জীবনের প্রথম অঙ্কে জড়াইয়া ধরিতে

শ্রমাস পাইলেন । তিনি হরিগঞ্জে স্বামী-দর্শনে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন । মাধবের ইচ্ছা ছিল না, মাতঙ্গিনী, রাজমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জেলখানার ভিতর গমন করেন ; কিন্তু মাতঙ্গিনীকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দৃষ্টে তিনি আপত্তি করিতে সাহস পাইলেন না । অতঃপর মাধবের বড় বজ্রধার উঠিয়া মাতঙ্গিনী হরিগঞ্জ অভিমুখে যাত্রা করিলেন । সঙ্গে তাঁহার জননী ও ছইজন দাসদাসী চলিল । মাধব, সনাতনকেও সঙ্গে দিলেন ; তাহাকে বিদায় কালে কহিয়া দিলেন, “দিদির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তোমার উপর রহিল, সনাতন-দা ।”

মাতঙ্গিনীকে লইয়া বজ্রা নির্ঝিলে হরিগঞ্জে পহুছিল । তথায় হরিদাস বাবু সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন । মাতঙ্গিনী শিবিকা-রোহণে জেলখানার দ্বার পর্য্যন্ত আসিলেন ; তথায় শিবিকা হইতে নামিয়া পদব্রজে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া যাইতে হইল । সঙ্গে সনাতন রহিল ; তাহাকে ভিতরে যাইতে দিতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু হরিদাস বাবু কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে হুকুম আনিয়া সে সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন । হরিদাস বাবু শূন্য শিবিকা লইয়া বাহিরে রহিলেন । সনাতন মাতঙ্গিনীসহ ভিতরে প্রবেশ করিল ; একজন প্রহরী হুকুমপত্র লইয়া আগে আগে চলিল ।

যে গৃহের ভিতর রাজমোহন আবদ্ধ ছিল, সেই কক্ষদ্বারের নিকট প্রহরী আসিয়া দাঁড়াইল । তথায় দ্বিতীয় প্রহরী বন্দুকস্বন্ধে প্রহরা দিতেছিল । প্রহরীদ্বয় মধ্যে কিঞ্চিৎ বাক্যালাপ চলিল । তৎপরে প্রথম প্রহরী মাতঙ্গিনীকে লইয়া নিকটবর্তী একটি অপ্রশস্ত কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিল । সনাতন ছায়াবৎ মাতঙ্গিনীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল ।

যে ঘরের ভিতর তাহারা প্রবেশ করিল, তাহা লৌহ শলাকা দ্বারা

দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে । শলাকা গুলি স্থূল, উচ্চ ও দৃঢ়ভাবে প্রোথিত । এক ভাগ হইতে অপর ভাগে যাইবার পথ নাই ; কিন্তু স্থূল-কায় মনুষ্য-হস্ত প্রবেশের যথেষ্ট পথ ছিল । কক্ষের কোথাও একটা গবাক্ষ নাই, কেবল দুই ভাগে দুইটা দ্বার । আলোক ও বাতাস বড় একটা আসিতে পাইত না ।

আগন্তুকদ্বয়কে ভিতরে রাখিয়া প্রহরী বাহিরে গেল ; কিন্তু সতর্ক রহিল । মাতঙ্গিনী অর্দ্ধাবগুঠনে স্বামী-দর্শন প্রতীক্ষায় গৃহ-প্রাচীর অবলম্বন করত দণ্ডায়মান রহিলেন । সনাতন গৃহের এক কোণে অন্ধকারের ভিতর অবস্থান করিয়া সতর্ক নয়নে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল । ক্ষণ মধ্যে দ্বিতীয় ভাগের দ্বার খুলিয়া গেল—রাজমোহন কয়েদীর বেশে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল ।

মাতঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন ; মুহূর্তকালের জন্ত নয়ন উঠাইয়া রাজমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন—নয়ন সত্ত্বর আপন হইতেই অবনত হইয়া পড়িল । যে আকুলতা মাতঙ্গিনী মনের প্রতি বল প্রয়োগ পূর্বক সৃষ্টি করিয়া লইয়া স্বামী সন্দর্শনে আসিয়াছিলেন, তাহা মুহূর্ত মধ্যে অন্তর্হিত হইল । মাতঙ্গিনী নিঃসম্বল হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন ।

রাজমোহন কক্ষের অপর ভাগে অবস্থান করিয়া মাতঙ্গিনীর যতটা নিকটে আসিতে পারে ততটা নিকটে আসিল ; তথাপি উভয়ের মধ্যে ব্যবধান অনেকটা রহিল । রাজমোহন একবার কক্ষের চতুর্দিকে ফিপ্রনয়নে দৃষ্টিপাত করিল । কিন্তু সনাতনের মূর্তি তাহার দৃষ্টিভূত হইল না । রাজমোহন কহিল, “মাতঙ্গিনি, তুমি আসিবে, তাহা জানিতাম । সকলে আমায় ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তুমি পার না ।”

মাতঙ্গিনী অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন । রাজমোহন কহিল, “মাতঙ্গিনি, জীবনে আর আমাদের সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই ; তাই

তোমাকে একটীবার দেখিতে চাহিয়াছি। যখন আসিয়াছ, তখন একটু নিকটে এস—ভাল করিয়া তোমাকে দেখিতে দাঁও।”

মাতঙ্গিনী দুই-চারি পা আঙু হইয়া লোহার বেড়ার ধারে দাঁড়াইলেন। রাজমোহন একটু বাগ্রতার সহিত তাঁহার হস্তধারণ করিল; কহিল, “মাতঙ্গিনি, তুমি আমার বড় প্রিয়—প্রাণাধিক প্রিয়! তোমাকে আমি রাখিয়া যাইতে পারি না, আমার সঙ্গে যাইবে?”

“কোথায়?”

“যেখানে আমি যাইতেছি—সুদূর দ্বীপান্তরে।”

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন না। রাজমোহন দুই হস্তে তাঁহার বাহুদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধারণপূর্বক কহিল, “বল মাতঙ্গিনি, যাবে?”

মাতঙ্গিনী হস্তে বেদনা অনুভব করিলেন, কিন্তু কোনরূপে তাহা প্রকাশ না করিয়া অবনত-বদনে উত্তর করিলেন, “তুমি যেখানে লইয়া যাইবে, সেইখানে যাইব।”

রাজমোহন হাসিয়া কহিল, “তথায় তোমাকে লইয়া যাইবার আমার কোনও অধিকার নাই, মাতঙ্গিনি—আমি তোমাকে পরীক্ষা করিতে ছিলাম। কিন্তু মাতঙ্গিনি—” বলিতে বলিতে রাজমোহনের হাসি অন্তর্হিত হইল, চক্ষুতে একটা অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ প্রকটিত হইল; কহিল,—“কিন্তু মাতঙ্গিনি, আমার রূপময়ী মাতঙ্গিনি, তোমাকে ত একা অসহায় অবস্থায় রাখিয়া যাইতে পারি না। এস প্রিয়ে, এস প্রাণাধিকে, তোমার জীবনের শেষ করিয়া রাখিয়া যাই।”

বাক্যের অবসান হইতে না হইতে রাজমোহন দুইহস্তে মাতঙ্গিনীর কণ্ঠ ধারণ করিল এবং তাঁহাকে সবলে শূণ্ণে উত্থিত করিল। রাজমোহনের হস্তপেষণে মাতঙ্গিনীর মৃগালবৎ কোমলকণ্ঠ চূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। তাঁহার হস্তপদাদি শূণ্ণে বিক্লিপ্ত হইতে লাগিল।

তদৃষ্টে রাজমোহন কহিল, “এ দৃশ্যও দেখিতে পারি মাতঙ্গিনি, কিন্তু তুমি যে মাধবের উপভোগ্যা হইয়া জীবিত থাকিবে তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না । মাত—”

বাক্য শেষ হইবার পূর্বেই রাজমোহনের কণ্ঠ কে একজন আশুরিক বলে চাপিয়া ধরিল ; বাক্য আর শেষ হইল না—রাজমোহনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল—হস্তপদাদি বলশূন্য হইল । রাজমোহন দেখিল, সনাতনের ঘূর্ণ্যমান রক্তবর্ণ চক্ষু তাহাকে গ্রাস করিতে সমুদ্রত হইয়াছে । আত্মরক্ষা করিবার মানসে রাজমোহন তখন মাতঙ্গিনীকে পরিত্যাগ করিয়া সনাতনকে ধরিবার চেষ্টা করিল । মাতঙ্গিনীর অবসন্ন দেহ নিরবলম্ব হইয়া ভূপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িল । সনাতন তখন মাতঙ্গিনীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া প্রহরীকে ডাকিল ।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

বিধাতার বিধানে মাতঙ্গিনী সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু মাতঙ্গিনীর চিকিৎসার্থে মাধবকে অনেক যত্ন ও অর্থব্যয় করিতে হইয়াছিল । মাতঙ্গিনীকে আর সে কুটীরে পাঠাইলেন না—নিজের গৃহে রাখিলেন । রাজধানী হইতে একজন বশস্বী চিকিৎসক আনয়ন করিলেন । চিকিৎসক মহাশয় রাধাগঞ্জে দুই তিন দিন অবস্থান করত অতি প্রফুল্লচিত্তে বস্তা বাঁধিয়া টাকার মোটসহ দেশে প্রত্যাগমন করিলেন । যাইবার সময় মাধবকে চুপি-চুপি উপদেশ দিয়া গেলেন, “ঔষধ নিয়মমত খাওয়াইবেন,

কিন্তু তাহাতে যে অরটুকু যাইবে এমত মনে হয় না । আমার বিবেচনায় রোগিনীকে ইজিপ্টে অথবা অষ্ট্রেলিয়াতে বায়ু পরিবর্তন করিতে লইয়া গেলে ভাল হয় ।”

মাধব ভূগোল ও মানচিত্রের আলোচনা করিয়া দেখিলেন, ইজিপ্ট অথবা অষ্ট্রেলিয়াতে যাইতে হইলে মধুমতী অপেক্ষা বৃহৎ জলাশয় অতিক্রম করিতে হইবে ; এবং সে কার্য তাঁহার বজরার দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভবপর নয় । মাধব বৃহত্তর বজরার অনুসন্ধান গমন না করিয়া অনেক গবেষণার পর বৈষ্ণনাথধামে শুকপথে যাওয়া স্থির করিলেন ; এবং এই সঙ্কল্পের কথা মাসীমাতার নিকট গোপনে ব্যক্ত করিলেন । মাসীমাতা মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া এই আনন্দের সংবাদ পুরমহিলাদিগের নিকট অতিগোপনে পুনর্ব্যক্ত করিলেন । কথিত আছে, রমণীর কটাক্ষে বিদ্যৎ বিচরণ করে ; কিন্তু তাঁহাদের জিহ্বাগ্রে তড়িলতা অথবা অন্য কোন দেবী অধিষ্ঠান করেন কিনা তাহা পুরাণাদি মন্বন করিয়াও জানা যায় নাই । বিদ্যালতার গতিকেও পরাস্ত করিয়া মাধবের পশ্চিম যাত্রার সংবাদ রমণী-কণ্ঠে রাধাগঞ্জময় সত্বর প্রচারিত হইল ।

তখন সুপ্তগ্রাম সহসা জাগিয়া উঠিল । পথে-ঘাটে মহিলাদিগের সভা সমিতি অধিষ্ঠিত হইল । বৈষ্ণনাথধাম কোন্ দিকে এবং তথায় কোন্ কোন্ দেবতা বিরাজ করিতেছেন তাহা লইয়া ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক চলিল । কোনও ভামিনী কহিলেন, বৈষ্ণনাথধাম শ্রীক্ষেত্রের সন্নিকটে দ্বারকার সানুদেশে । কোনও মসীবরণা সূলাঙ্গী ইহার প্রতিবাদ করিলে, প্রথমোক্তা ভামিনী মহোদয়া সাতিশয় কুপিতা হইয়া কহিলেন, তিনি বৈষ্ণনাথের নিগূঢ় বৃত্তান্ত তাঁহার খুলতাত দেবরপুত্রের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন ; এবং উক্ত দেবরপুত্রের মামার শ্যালকনন্দন বৈষ্ণনাথধামে সশরীরে ও সজ্ঞানে প্রকৃতই গমন করিয়াছিলেন । এবম্বিধ নজিরের

আলোচনায় প্রতিবাদকারিণী নিরুত্তর হইয়া পড়িলেন । তখন বৈষ্ণনাথ-
ধামের দিগ্‌নির্গম সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ না থাকায় মহিলাবৃন্দ
তদস্থানাধিষ্ঠাত্রী দেব-দেবীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন ।

কোন দম্ভহীনা পিঙ্গলবরণা প্রোঢ়া শীকরকণা চতুর্দিকে বিকীর্ণ
করিতে করিতে কহিলেন, “শুনেছি সেখানে নাকি বৈষ্ণনাথ ঠাকুর
আছেন, আর তাঁর নাকি বেলপাতা ও গঙ্গাজল দিবে পূজা হয় ।”

কোনও কোতুকপ্রিয়া নবীনা অশেষ গাভীর্য্য সহকারে উত্তর
করিলেন, “না মাসী-মা, শুনেছি সেখানে নাকি জালানন্দ ঠাকুর আছেন,
আর ছাতু দিবে তাঁর পূজা হয় ।”

মুখামৃতবর্ষিণী ওষ্ঠ সম্প্রসারণপূর্ব্বক কহিলেন, “আজকালকার
ছুঁড়িদের জালায় কথা কইবার যো নেই ; ঠাকুরের পূজা হয় গঙ্গাজলে,
ছাতুতে কেন হবে লা ?”

বর্ষণস্নাতা নবীনা কহিলেন, “তুমি মাসী-মা, সেখানে গিয়া একবার
স্তব পাঠ করিলে গঙ্গাজলের আর দরকার হইবে না ; গো-মুখী-নিঃসৃত
গঙ্গাজলে বৈষ্ণনাথ পরিপ্লাবিত হইবেন ।”

—এইরূপ তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাদিতে দুই তিন দিবস অতিবাহিত
হইল । তৎপরে মাতঙ্গিনীর সহগামিনী হইয়া তীর্থ ভ্রমণের একটা
সাধ, আঁকাঙ্ক্ষা রমণীজন-হৃদয়ে উপজিত হইল । মাতঙ্গিনীর গৃহে যতই
উদ্যোগ আয়োজন চলিতে লাগিল, ততই গ্রাম্যমহিলাদিগের আঁকাঙ্ক্ষা
বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । অবশেষে আকুল বাসনা বলবতী হইয়া যখন
তাহাদের উন্নত করিয়া তুলিল, তখন তাহারা হেমাঙ্গিনী ও মাত-
ঙ্গিনীর অনুগ্রহ লাভাশায় ছোটবাবুর পুরমধ্যে নিত্য যাতায়াত আরম্ভ
করিয়া দিল ।

ছোটবাবু তখন বৈষ্ণনাথকেত্রে উপযুক্ত বাড়ী স্থির করিবার উদ্দেশ্যে

জনৈক কর্মচারীকে প্রেরণ করিয়া উদ্ভিগ্ন-চিত্তে কালক্ষেপ করিতে-
ছিলেন। যে সময়ের কথা এই আখ্যায়িকায় বর্ণিত হইতেছে সে সময়
বৈষ্ণবনাথে বড় বেশী বাড়ী নির্মিত হয় নাই ; যাহা হইয়াছে, তাহাও
মনোরম নয়। এ দিকে মাসীমাতা ধরিয়াছেন, যখন *তীর্থক্ষেত্রে
যাওয়াই হইতেছে, তখন তাঁহার তুলসীর মালা ছড়াটা গোবিনজীর
চরণে স্পর্শ করিয়া আনিতে হইবে। গোবিনজী যে কোন্ দেশে অবস্থান
করিতেছেন তাহার অনুসন্ধান লইবার প্রয়োজন মাসীমাতা অনুভব করেন
নাই। শ্রদ্ধ ঠাকুরাণীর বাসনা, তিনি এই সুযোগে একবার জগন্নাথ-
দেবকে দর্শন করিয়া আসেন। হেমাঙ্গিনী পাহাড় দেখিবার অভিলাষিনী
হইয়া ভর্তাকে ধরিয়াছেন, যে দেশে গাছে গাছে ময়ূর, পাহাড়ে পাহাড়ে
হরিণ চরিয়া বেড়াইতেছে, সেই দেশে চল। কিন্তু যাহার জন্ত এই
বিপুল অনুষ্ঠান, তিনি দেশ ভ্রমণের সম্পূর্ণ বিরোধী। মাতঙ্গিনী একদা
মাধবকে কহিয়াছিলেন, তাঁহার জন্ত অকারণ অর্থ শ্রদ্ধ করিবার প্রয়োজন
নাই ; যাহা ব্যয় হইয়াছে তাহারই জন্ত তিনি অতিশয় কাতর। দৃশ্যতে
যে অর্থরাশি অপহরণ করিতে সমর্থ হইত না, তাহা তিনি নিজ চিকিৎসায়
ও অন্তবিধ ব্যয়ে গ্রাস করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আর কিছুতেই তাঁহার
কারণ মাধবকে আর এক কপর্দকও ব্যয় করিতে দিবেন না।

মাধব যখন দেখিলেন, মাতঙ্গিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তখন তিনি অশ্রুধের
ভাণ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। গ্রাম্য চিকিৎসক আসিয়া মাধবের
ইঙ্গিতানুসারে কহিলেন, ছোট বাবুর রোগ ঔষধে প্রতিকৃত হওয়া সম্ভবপর
নহে—বায়ু বা স্থান পরিবর্তনের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। এ কৌশল বুঝিতে
মাতঙ্গিনীর বিলম্ব হইল না ; কিন্তু বুঝিয়াই বা কি হইবে ? প্রকাশভাবে
তিনি আর কোন প্রতিকূলতা করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

তখন আয়োজনের ধুম লাগিয়া গেল। পুরমহিলারা সকলেই ধরিলেন,

তাঁহারা সহযাত্রী হইবেন । দাসদাসী দ্বারবান সকলেই কোমর বাঁধিল ; বলিল, “আমরা না গেলে ঝাবুকে দেখিবে কে ।” কেহ কেহ সনাতনের পদসেবা আরম্ভ করিয়া দিল । গ্রামের যাবদীয় বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, তরুণী তীর্থ ভ্রমণের উমেদারি আরম্ভ করিয়া দিলেন । কেহ হেমাঙ্গিনীকে কেহ বা মাতঙ্গিনীকে ধরিলেন ; কেহ বা মাসী-মাতার গুণকীর্তন করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন । যে পাচিকা ঘৃত আহরণ সম্বন্ধে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া মাসী-মাতার নিকট তর্কশাস্ত্রের অবতারণা করিতেন, এক্ষণে তিনি মীমাংসাশাস্ত্র-মতাবলম্বী হইয়া মাসী-মাতা অধিক ঘৃত প্রদান করিতে আসিলে তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন এবং কহিতেন, “গৃহস্থ বাড়ীতে এত ব্যয় করিলে চলিবে কেন ? আমি অল্পে সারিয়া লইব ।”

এমন কি মাধবের খুল্লতাত-পত্নী ধৈর্য্য ধারণে অসমর্থ হইয়া হেমাঙ্গিনীর নিকট দূতী প্রেরণ করিয়া জানাইলেন যে, তিনিও তীর্থ-ভ্রমণেচ্ছ । হেমাঙ্গিনী জ্যোষ্ঠা ভগিনীর সহিত পরামর্শ করিয়া দূতীকে কহিয়া দিলেন যে, “খুড়ীমাকে বল গে, আমি ছেলেমানুষ, ও-সব কিছু জামিনা ; তবে বাবুর বড় ইচ্ছে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যান ।” খুড়ী-মা এ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখিতে দিলেন না,—তিনি মথুরের আশ্রয় পরিত্যাগ পূর্বক সবেগে মাধবের গৃহে আগমন করিলেন । এবং মাধবের বিচ্ছেদে তিনি কতদূর কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা প্রচুর অশ্রুবর্ষণে পরিব্যক্ত করিলেন । খুড়ী-মাতার অঙ্গাদি কিঞ্চিৎ স্থূল এবং তাঁহার অশ্রুবর্ষণের ক্ষমতাও অনন্ত-সাধারণ । অদূরে দণ্ডায়মানা দাসীরা যখন দেখিল, বারি-প্রবাহে ক্ষিতিতল পরিপ্লাবিত হইতেছে, তখন তাহারা একবাক্যে মানিয়া লইল, তিনি ছোট বাবুর বিচ্ছেদে বড়ই কাতরা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং উকীল মোক্তারেরা যে, এই বিচ্ছেদের মূল কারণ, ইহাও তাহারা

স্বীকার করিয়া লইল। মাসী-মাতা এতদৃষ্টে বড়ই ঈর্ষান্বিতা হইয়া পড়িলেন ; কিন্তু ভগবান্ তাঁহার প্রতি এতই বিরূপ যে, দক্ষ চক্ষু অশ্রু-বর্ষণে কিছুতেই সম্মত নহে। এ স্থলে প্রতিযোগিতা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তিনি কার্যের অছিলায় স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মাতঙ্গিনীর নিকট যাঁহার নিয়ত যাতায়াত করিয়া তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সফল প্রাপ্ত হইয়া নাই। ব্যয়-বাহুল্য ভয়ে 'মাতঙ্গিনী সকলকেই নিরস্ত করিয়াছিলেন। কনক ও স্বদীয়া জননী, মাতঙ্গিনীর হুঃখে প্রচুর অশ্রুপাত করিয়া তাঁহার হৃদয় সিক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সকল যত্ন বিফল হইয়াছিল। মাতঙ্গিনী কহিয়াছিলেন, 'আমি গৃহের কর্তা বা কর্ত্রী নই—যে নিজে হুঃখিনী পরাশ্রয়ী, সে অপরকে আশ্রয়দানে অসমর্থ।' কিন্তু তাঁহারা সে সকল কথা কাণে তুলেন নাই—যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

সদানন্দময়ী হেমাঙ্গিনীকে যে ধরিয়াছিল, সেই সিদ্ধকাম হইয়াছিল। তিনি সকলকেই বলিতেন, তুমি যাবে বই কি। তাঁহার আনন্দের ভাণ্ডার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল ; তিনি সেই উচ্ছ্বসিত আনন্দে সংসারকে প্লাবিত করিবার জন্ত ব্যস্ত।

একদিন অপরাহ্নে মথুরমোহন আসিয়া মাধবচন্দ্রকে কহিলেন, "দেখছি গোটা গ্রাম তোমার সঙ্গে যাচ্ছে ; বৈষ্ণবের মাঠগুলা ভাড়া নিয়েছ ত ?"

মাধব উত্তর করিলেন, "ব্যাপার তাই দেখছি। আগে ভেবেছিলাম, শুধু বাড়ীতেই বুঝি চাষি বন্ধ করতে হবে ; এখন দেখছি গ্রামে চাষি বন্ধ করবার প্রয়োজন।"

মথুর হাসিয়া কহিলেন, "দেখ ভায়া, আমাদের গাঁয়ের কখন কেউ দেশ ছেড়ে বিদেশে যাই নি। তাঁর উপর আবার তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ

—মাগীদের ঘোমটা খোলবার এমন সুযোগ সচরাচর ঘটে না । ঠাকুর দেখবার যত না ইচ্ছে হোক, এই যে ঘোমটা খুলে ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারবে, এইতেই মাগীগুলো ম'লো ।”

মাধব । • আমি যাচ্ছি চিকিৎসার্থে, এ সব বোঝা ত বইতে পারব না । দেখছি চুপি চুপি পালাতে হবে ।

মথুর । সে যো নেই । তোমার চেয়ে পাড়ার মেয়েরা বেশী খবর রাখে কোন্ দিন, কোন্ লগ্ন পুরুত মশায় যাত্রার কারণ স্থির করে দিয়েছেন । তোমার ক'থানা নৌকা ভাড়া হ'য়েছে তা'ও তারা জানে ।

মথুর হাসিতে হাসিতে বিদায় হইলেন ; মাধব চিন্তাকুল হৃদয়ে অন্তঃ-পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । তাঁহার শয়ন কক্ষের সম্মুখস্থ দালানে আসিয়া দেখিলেন, হেমাঙ্গিনী তথায় এক মিছিল বাহির করিয়াছে । গ্রামের ও গৃহের প্রায় অর্দ্ধ শত যুবতী তথায় সমবেত হইয়াছে ; আর হেমাঙ্গিনী তাঁহার দারুনির্মিত হরিণটি সেই সুন্দরীবৃন্দ মধ্যে হর্ষোপরি স্থাপন করিয়া পরিচয় দিতেছিলেন, কিরূপে হরিণ হরিণী বৈষ্ণনাথের পল্লীতে পল্লীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে । কিরূপ লক্ষ্যে লক্ষ্যে তাহারা বিচরণ করে তাহার একটা মহলা দিয়া হেমাঙ্গিনী দারুর্মূর্তিকে মধ্যে মধ্যে নাচাইতেছিলেন ; রূপসীদিগের হৃদয়ও তদসঙ্গে নর্তিত হইতেছিল, এবং তাহাদের সৃষ্টি-বাহিনী বদন সুধা সেই লোকললাম বৈষ্ণনাথধামস্থ সজীব হরিণীর রসাস্বাদনে আকুল হইয়া ছুটিতেছিল । যখন হরিণীর রসাস্বাদনে শ্রোত্রীবর্গের উদর পরিপূরিত হইয়া উঠিল, তখন হেমাঙ্গিনী ময়ূরীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন । শ্রোত্রীদিগের মধ্যে কেহ কখন প্রাণযুক্তা ময়ূরী দর্শন করেন নাই ; তবে তাঁহারা শারদীয়া পূজাকালে ধনুর্ধারী কার্তিকেয়ের

পদনিম্নে শিখাপুচ্ছধারী মৃন্ময় ময়ূর দৃষ্টে ময়ূরের চিত্র অনেকটা মানসপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী সে সকল কাল্পনিক চিত্র মনোমধ্য হইতে বর্জন করিতে উপদেশ দিয়া জটায়ুর উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এবং দশানন-প্রতিদ্বন্দ্বী জটায়ুকে হস্তীর সহিত আকার সম্বন্ধে তুলনা করিয়া তাহার ক্ষুদ্র বপুর কিঞ্চৎ আভাস প্রদান করিলেন। অবশেষে জটায়ুকে ময়ূরের পিতৃপুরুষ বলিয়া পরিচয় প্রদান করত কহিলেন, “এবং বিশ্ব আভিজাত্যালঙ্কৃত ময়ূর বৈষ্ণনাথস্থ গৃহরাজির ছাদে আলিসায় নিত্য পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।” দুর্ভাগ্যবশতঃ হেমাঙ্গিনীর বক্তৃতা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই মাধব আসিয়া দর্শন দিলেন। মাধবকে দেখিবামাত্র সেই জগদ্বিজয়িনী রমণী জাতির রথী মহারথীরা অস্ত্রাদি সংগোপন পূর্বক মুহূর্তে অদৃশ্য হইলেন। হেমাঙ্গিনী তাঁহার কক্ষ মধ্যে বিদ্যাত্বৎ ছুটিয়া পলাইলেন ; বিদ্যাত্বৎ, মাথায় নিবিড় মেঘ লইয়া মুহূর্তে অদৃশ্য হইল। পড়িয়া রহিল, শুধু সেই কাঠের হরিণটা ; তাহার লজ্জা সরম নাই, তাই সে রহিল।

মাধব কক্ষে প্রবেশ করিয়া মৃদু হাস্যসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হচ্ছিল রঞ্জিণী ?”

মাধব, হেমাঙ্গিনীকে আদর করিয়া সময় সময় রঞ্জিণী বলিয়া ডাকিতেন। রঞ্জিণী উত্তর করিলেন, “না, তা’ হবে না।”

“কি হবে না ?”

“না, তা’ হবে না।”

মাধব হাসিতে হাসিতে হেমাঙ্গিনীকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হবে না, বল ?”

হেমাঙ্গিনী বক্ষমধ্যে মুখ লুকাইয়া কহিলেন, “তুমি ভেবেছ এদের নিয়ে যাবে না, তা’ হবে না—সকলকে নিয়ে যেতে হবে।”

মাধব । এই গাঁ শুদ্ধ লোক ?

হেমাজিনী । যারা যেতে চায় ।

মাধব । যেতে চায় ত সকলেই ।

হেমাজিনী । তবে সকলকেই নিয়ে যেতে হবে ।

মাধব । সর্বনাশ ! সে যে অনেক টাকার ব্যাপার ।

হেমাজিনী । তা' হো'ক ।

মাধব । তা'হলে গোটা বৈষ্ণনাথ সহর ভাড়া নিতে হবে ।

হেমাজিনী । তা' হোক ।

মাধব । গোটা জেলার নৌকা যোগাড় করতে হবে ।

হেমাজিনী । তা' হো'ক ।

মাধব হাসিয়া কহিলেন, “তবে তাই হো'ক ।”

হেমাজিনী সরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ নাড়িয়া কহিলেন, “না, তুমি হাসছ যে — সত্যি করে বল ।”

মাধব । আমি কাঁদিয়া কহিতেছি, তোমার ছল ও ফুল দুইজনেই যাইবে ; আর তোমার কাঠের হরিণটা যখন সাজিয়াছে, তখন সে-ও যাইবে ।

এমন সময় বাহিরে মাতঙ্গিনীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল । হেমাজিনী ব্যস্ত হইয়া মাধবের বাহুপাশ ছিন্ন পূর্বক গৃহকোণে লুকায়িত হইলেন ।

ইদানীং মাধব, মাতঙ্গিনীর বড় একটা দর্শন পাইতেন না ; মাতঙ্গিনী স্বেচ্ছাপূর্বক আত্মগোপন করিয়া থাকিতেন । কদাচিৎ কখন বিশেষ প্রয়োজন পড়িলে মাধবের সম্মুখে আসিতেন, নতুবা নয় । মাতঙ্গিনীর কক্ষে মাধব কোনও প্রয়োজনে প্রবেশ করিলে মাতঙ্গিনী বিরক্তি প্রকাশ করিতেন । সুতরাং মাধব তথায় যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ।

মাতঙ্গিনী চরণ-চুষনেচ্ছু আলুলায়িত রুক্ষ কেশভার বিস্তার করত একখানি সুবর্ণ প্রতিমার গায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন । মাধব চমকিয়া উঠিলেন ; সে প্রতিমা—সে বিষাদমাখা সৌন্দর্য্যরাশি কখন দেখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারিলেন না । কাষিক ও মানসিক ক্লেশহেতু তাঁহার দেহ কিঞ্চিৎ শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, বর্ণজ্যোতিও কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়াছিল—স্থল-পদ্বিনী যেন মধ্যাহ্ন ভানুতাপে ক্লিষ্টা, বিবর্ণা । শুষ্কপ্রায় পুষ্পের বিষাদ তাঁহার দেহময় পরিব্যাপ্ত ; কিন্তু সেই বিষাদের মধ্যেও একটা মাধুর্য্য, একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা, একটা অক্ষুট চীৎকার জাগিতেছিল । নদীকূলবাসিনী চাতকীর হৃদয়েও একটা তৃষ্ণা, একটা বাসনা নিরন্তর জাগিতে থাকে ; তবে মাতঙ্গিনীর অপরাধ কি ?

মাতঙ্গিনী তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছিলেন ; কহিলেন, “ই্যারে হেম, তুই কি গ্রামশুদ্ধ লোক সঙ্গে নিয়ে যাবি ?”

হেম গৃহকোণে লুক্কায়িত থাকিয়া মুখে কাপড় চাপিয়া খুব হাসিল ; এবং মাথা নাড়িতে নাড়িতে অতি মৃদুকণ্ঠে কহিল, “হাঁ, নিয়ে যাব !”

অবশ্য তাহার উক্তি কাহারও কর্ণগোচর হইল না । মাতঙ্গিনী পুনরায় কহিলেন, “তুই যে গোটা পাড়া মাতিয়ে তুলেছিস—”

হেম (পূর্ববৎ অক্ষুটস্বরে) ।—খুব করেছি ।

মাত । এত লোক নিয়ে যেতে কত খরচ তা’ জানিস ?

হেম (পূর্ববৎ) ।—আমার জানবার দরকার নেই ।

মাত । তুই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে আর ত ।

হেম । (পূর্ববৎ) ।—ইস, তোমার বকুনি খেতে যাচ্ছি কিনা ।

মাত । দেখ্ হেম, তুই এখন বড় হয়েছিস, সব দিক্ বুঝতে হয় ; রোগ সারতে পশ্চিমে যাওয়া,—এত লোক সঙ্গে থাকলে রোগ সারবে কি করে ?

হেম বিস্ময়িত নয়নে শূন্যাকাশ পানে চাহিয়া রহিল ; এ কথাটা ত পূর্বে তাহার মনে হয় নাই ।

মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে অপমৃত হইলেন—মাধবের পানে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না—সুন্দরী প্রতিমার গায় মুহূর্তকালের জগ্ন দর্শন দিয়া অন্ধকারক্রোড়ে অদৃশ্য হইলেন ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

বৈজনাথে আসিয়া হেমাঙ্গিনী যাহা দেখিবার আশা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিতে পাইলেন না । হরিণীর পরিবর্তে অসংখ্য শাখামৃগ দেখিলেন এবং ময়ূরের পরিবর্তে অগণিত শৃগাল তাঁহার নয়নগোচর হইল । হেমাঙ্গিনী বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িলেন । তবে এইটুকু তাঁহার সান্ত্বনা যে, যাহাদের সম্মুখে তিনি হরিণের মিছিল বাহির করিয়াছিলেন, তাহারা কেহ সঙ্গে আসে নাই । আসিবার মধ্যে কেবল ছল ও ফুল—তাঁহার দুইটা প্রিয় বয়স্যা । খুল্লশ্বশুর সতর্কতায় তাহাদেরও আসা ঘটিল না, কিন্তু যাত্রাকালে হেমাঙ্গিনী এক অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিয়া শ্বশুর সতর্কতা নিষ্ফল করিয়াছিলেন । যাত্রার দিবস সন্ধ্যাকালে হেমাঙ্গিনী তাঁহার বয়স্যাছয়কে খট্টাঙ্গ নিয়ে লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন ।

গৃহত্যাগ কালে অন্ধকারের ভিতর তাহাদের লইয়া চুপি চুপি শিবিকা-
 রোহণ করিয়াছিলেন। বাহকেরা তিন জন আরোহী লইতে পাছে
 কোন আপত্তি করে এই আশঙ্কা করিয়া হেমাঙ্গিনী শিবিকারোহণের
 পূর্বেই দুই দিকে দুইটা টাকা ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং কোন
 গোল হয় নাই। নৌকারোহণের পর যখন হেমাঙ্গিনীর চাতুর্য্য ধরা
 পড়িয়াছিল, তখন জ্যোষ্ঠাগ্রজা হাসিয়া আকুল হইয়াছিলেন—মাধব
 অন্তরাল হইতে ঈষৎ হাস্য সহকারে হেমাঙ্গিনীকে একটা কিল
 দেখাইয়াছিলেন। হেমাঙ্গিনী তদন্তরে অপরের অলক্ষ্যে বৃদ্ধাস্থুষ্ঠ প্রদর্শন
 করিয়াছিলেন। অতঃপর তুল ও ফুল সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। কনক
 ও তাহার জননীও আসা ঘটিত; কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় যাত্রার পূর্ব
 দিবস কনকের ভাগ্যচক্র আবর্তিত হইতে হইতে তাহাকে চক্রনিম্নে
 নিক্ষেপ পূর্বক নিষ্ঠুরভাবে পেষণ করিল। গৌরহরি নামধেয় জনৈক
 প্রতিহিংসা-গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। এই
 ব্যক্তি যখন দেখিল, মথুর অব্যাহতি লাভ করিয়া পুনরায় নির্বিঘ্নে
 সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন, তখন সে তাঁহাকে হত্যা করিতে
 কৃতসঙ্কল্প হইল। সুযোগও ঘটিল। একদা নিশীথে মথুর ঠাঁহার
 উদ্যান-বাটীতে কোনও প্রণয়িনীকে লইয়া বিলাসে উন্মত্ত ছিলেন;
 ভৃত্যাদি কেহই নিকটে ছিল না। এমন সময় গৌরহরি ছুরিকা-হস্তে
 তথায় প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল আলোকে দেখিল, প্রণয়িনী আর কেহ
 নয়—তাহারই অপহৃত্তা স্ত্রী। যে স্ত্রীকে সে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মনে
 করিয়া গৃহে আনয়ন পূর্বক ঘরনী করিয়াছিল, সেই স্ত্রীই এক্ষণে মথুরের
 অন্ধশায়িতা। গৌরহরি দেখিল, তাহার অতি আদরের বনিতা মথুরের
 কর্ণলগ্না হইয়া সহাস্ত্রে আলাপাদি করিতেছে। তদর্শনে সে জ্ঞানশূণ্য
 হইয়া স্ত্রীকে আক্রমণ করিল এবং তাহার দেহের শতস্থানে ছুরিকাঘাত

করিল । মথুর ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন এবং অচিরে লোকজন-সহ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দুর্কৃত্তকে আয়ত্ত করিলেন । তখন হতভাগিনী জীবলীলা সংবরণ করিয়াছে ।

পরদিবস পুলিস আসিয়া গৌরহরিকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল । পথের দুইধারে বহু নরনারী সমবেত হইয়াছিল । তন্মধ্যে কেহ কেহ গৌরহরিকে চিনিতে পারিয়াছিল । কোতূহলী কনক ও তাহার গর্ভধারিণী পথপার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া নরঘাতীকে দেখিতে আসিয়াছিল এবং তাহার উদ্দেশে যথেষ্ট গালিবর্ষণ করিতেছিল । তারপর যখন পুলিস, গৌরহরিকে লইয়া কণ্ঠা ও জননীসম্মুখস্থ পথ অতিবাহন করিয়া চলিল, তখন তাহারা বিস্ফারিত নয়নে তাহাকে দেখিতে লাগিল ; দেখিতে দেখিতে কনক কম্পিত দেহে ভূপৃষ্ঠে বসিয়া পড়িল । যাহারা দুর্কৃত্তকে চিনিয়াছিল, তাহারা পরিচয় দিল, এই নারীঘাতক পাষণ্ড, কনকের স্বামী । কনক এইরূপে নির্ম্মম-হৃদয়া নিয়তির ঘূর্ণায়মান রথচক্রতলে পতিত হইয়া নির্দয়ভাবে পিষ্ট হইল ।

কনক ও তাহার জননী, মাতঙ্গিনীর অনুগামিনী না হইলেও গ্রামের চারিজন অনাধিনী বৃদ্ধা তীর্থদর্শনে মাধবের সহগমন করিয়াছিল । মাধব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের সঙ্গে লইয়াছিলেন । তদ্ব্যতীত তাহারা যখন অশ্রুপ্লাবিত নয়নে মাধবকে আশীর্বাদ করিয়াছিল, তখন তাঁহার নয়ন সজল হইয়াছিল ।

কিছুদিন বৈঘ্যনাথে অবস্থান করিয়া মাধব দলবল সহ বিশ্বেশ্বর দর্শনে গমন করিলেন । হেমাঙ্গিনী এত বড় তীর্থক্ষেত্রেও হরিণাদির দর্শন পাইলেন না । দেখিলেন, কেবল অন্ধকারময় বর্ষা, আর তদধিক অন্ধকারময় গৃহনিচয় । বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মূর্তি দর্শনে তাঁহার বিশেষ কোন ভক্তি ও আনন্দের উদ্রেক হইল না । তদপরিবর্তে তিনি

যদি পাহাড় পর্বত অথবা ময়ূর হরিণ দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি অধিকতর আনন্দিত হইতেন । তিনি অন্নপূর্ণা-চরণে প্রণতা হইয়া কামনা করিলেন, “মা, আমাদের যেন ময়ূর-হরিণের দেশে শীগ্গির যাওয়া হয় ।”

• দয়াময়ী অন্নপূর্ণার চরণে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায় ; তিনি হেমাঙ্গিনীর এবস্থিধ সক্রম প্রার্থনা অর্পণ রাখিতে পারিলেন না । মাধবের ইচ্ছা হইল, তিনি কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্বক বৃন্দাবনে কিছুকাল বাস করেন । তাঁহার খুল্লতাতপত্নী ও জননী-ভগিনীর বাসনা হইল, তাঁহারা যমুনা-সরস্বতী-সঙ্গতা গঙ্গা দর্শন করিয়া সেই মহাতীর্থ প্রয়াগক্ষেত্রে মস্তক মুগুন পূর্বক অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করেন । এবস্থিধ ধর্ম অর্জনপথে মাধব স্বয়ং অন্তরায় হইলেন । তিনি ইহা এককালে পছন্দ করিতেন না যে, তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে কতকগুলি মুণ্ডিতমস্তক পরিব্রাজক প্রতিনিয়ত বিচরণ করে । মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুদিগের প্রতি তাঁহার এবস্থিধ বিদ্বেষ থাকা প্রযুক্ত মাসীমাতা প্রভৃতির বেণীমাধব দর্শনে যাওয়া ঘটিল না । তা' ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল,— প্রয়াগে উপযুক্ত বাসা পাওয়া গেল না ।

তখন মাধব সদলবলে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন । মাসীমাতা লোক পরম্পরায় শ্রুত ছিলেন, ব্রজধামের ধূলিরাশির উপর লুণ্ঠিত হইলে অশেষ পুণ্য অর্জিত হয় । মাসীমাতা যখন শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা বৃন্দাবনে সমুপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া লাল ধুলার উপর প্রচুর পরিমাণে গড়াগড়ি দিয়া লইলেন । ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরা মাসী-মাতার অঙ্গ ও বস্ত্র লোহিতবর্ণ ধূলিকণায় একরূপভাবে সংলিপ্ত হইয়া উঠিল যে, তাঁহার আত্মীয়েরাও তাঁহাকে আর চিনিয়া উঠিতে পারিলেন না । এমন কি তিনি যখন খুড়ী-মাতার অঙ্গে অঙ্গ

দিয়া পথ অতিবাহিত করিয়া চলিতেছিলেন, তখন তিনি তদ্বর্ভূক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ভিখারী নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। প্রতিকার মানসে মাসী-মাতা, করুণার দিকে চাহিলেন; তথায় সহানুভূতি প্রাপ্ত না হইয়া অধিকতর অবমানিত হইলেন। করুণা কহিল, “সরে যা’ মাগী, ভিখারী গুলোর আলায় তীর্থিঠাই পথ চলবার যো নেই।”

মাসীমাতা তখন সক্রুণ নয়নে হেমাঙ্গিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। হেমাঙ্গিনী তদৃষ্টে হাশ্রবেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া ধূলার উপর বসিয়া পড়িলেন। মাসীমাতা যৎকালে ব্রজরজঃ গ্রহণ মানসে ধূলার উপর গড়াগড়ি দিতেছিলেন, তৎকালে হেমাঙ্গিনী দূরে দণ্ডায়মানা থাকিয়া তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মাসীমাতা ধূলিমাখা কার্য সমাপ্ত করিয়া গাত্রোত্থান করিলে হেমাঙ্গিনী যখন তাঁহার পরিবর্তিত মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হাশ্রবস এতই সবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার বাক্যোচ্চারণের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। তারপর যখন দাসদাসী সম্মিলিত হইয়া মাসীমাতাকে কেহ উন্মাদিনী, কেহ বা ভিখারিণী বোধে অবজ্ঞা করিতেছিল, তখন হেমাঙ্গিনীর এমত শক্তি ছিল না যে, তিনি অঙ্গুলি সঞ্চালনে তাহাদিগকে নিষেধ করেন। ছইচারি জন ব্রজবাসী, মাধবের সঙ্গে ছিলেন; তাঁহারা কোন কালে মাসীমাতাকে দেখেন নাই। তাঁহারা মাধবের অনুগ্রহ লাভাশায় দাসদাসীকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং বিদ্যাপতির ভাষায় মাসীমাতাকে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা করিলেন। সেই সকল অপরিচিত শকাবলী যতই হেমাঙ্গিনীর কর্ণগত হইতে লাগিল, ততই হাশ্রতরঙ্গে তাঁহার বক্ষঃপঞ্জর আহত হইয়া ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিল। অবশেষে সনাতন, মাসীমাতার পরিচয় দিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছনার কবল হইতে মুক্ত করিল। তখন হাসিটা এতই সংক্রামক হইয়া পড়িল যে, দাসদাসীরাও বিচঞ্চল

হইয়া উঠিল ; এমন কি মাধবও ওঠে বসন চাপিয়া ক্ষণকাল বাকরহিত অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিলেন ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।



বৃন্দাবনক্ষেত্র হইতে কিছু দূরে যমুনা-উপকূলে মাধব বাসের জন্ম এক সুরম্য ভবন প্রাপ্ত হইলেন । ভবনের চতুঃপার্শ্বে বিস্তীর্ণ উদ্যান । এই উপবন মধ্যে স্থানে স্থানে মনুষ্যহস্তনির্মিত ক্ষুদ্র গোবর্ধন, মনুষ্যখাত ক্ষুদ্রকায়া নদী, গোচারণ ভূমি, কুঞ্জবন, পুলিন প্রভৃতি বৃন্দাবনেশ্বরের লীলাক্ষেত্রানুরূপ ভক্তনয়নমনোরঞ্জন দৃশ্যাবলী প্রকটিত রহিয়াছে । বিক্রমি আছে, বঙ্গদেশীয় কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি সংসার পরিত্যাগ পূর্বক এই স্থানে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন । উদ্যান তাঁহারই রচিত । গৃহ ও বহুদূর বিস্তৃত ভূমিখণ্ড তিনি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন । এই উপবনের সম্মুখে যমুনা, পিছনে নিবিড় অরণ্য । যে বন কাটিয়া বৃন্দাবন-নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এই অরণ্য তাহার অবশিষ্টাংশ মাত্র । দূরে—বহুদূরে কাননের পিছনে পর্বতমালা ; তার মাথার উপর নীলাকাশ । বনফুলের সৌগন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত—অসংখ্য পাখীর গানে আকাশতল মুখরিত । মাধনার উপযুক্ত স্থান বটে । কিন্তু হৃদয়াভ্যন্তরের কোলাহল না থামিলে অরণ্যপর্বতবেষ্টিত নির্জন স্থান লইয়া কি হইবে ?

হেমাস্বিনী এই বন-উপবন, পর্বত-আকাশ দৃষ্টে পরম পুলকিত হইলেন ; কহিলেন, তিনি এ স্থান ছাড়িয়া কোথাও আর যাইবেন না । জটায়ুর বংশধরেরা এখানে দলে দলে পরিল্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন

দেখিয়া হেমাজিনীর আনন্দের পরিসীমা রহিল না ; তবে তাহাদের আকার হস্তী অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন ।

চতুর্দিকের দৃশ্যাবলী দেখিয়া বিষাদিত মাতঙ্গিনীর চিত্তও অনেকটা প্রফুল্ল হইল । তাঁহার শরীরও অনেকটা সবল ও সুস্থ হইল । কিন্তু অশান্ত মন তাঁহাকে সময় সময় পীড়া দিতে লাগিল । মন একবার বন্ধনভ্রষ্ট হইলে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা বড় কঠিন ; তবে মাতঙ্গিনীর চেষ্টার ক্রটি ছিল না, কিন্তু এক প্রবলা প্রতিরোধিনী শক্তি তাঁহার সকল চেষ্টা বিফল করিতেছিল ।

মাসীমাতা বিশেষ সতর্ক ছিলেন ; পুলিন দূরে যাউক, তিনি শয্যাতেও আর গড়াগড়ি দিতেন না । খুড়ীমাতা পরের জন্ত মাধবকে একটা পয়সাও ব্যয় করিতে দিতেন না, কিন্তু নিজের জন্ত অর্থব্যয় প্রয়োজন হইলে মাধবকে তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক সহপদেশ প্রদান করিতেন ।

করুণা তুলসীর মালা কণ্ঠে ধারণ করিল ; এবং তদুদ্দেশ্যে অনুকরণ করিতে সনাতনকে অনুরোধ করিয়াছিল । তদুত্তরে সনাতন কহিয়াছিল, “আমার তুলসীর মালা মাধব, আমার গোবিন-জি মাধব, আমার ধর্ম মাধব ; আমি মাধব ছাড়া আর কিছু চাহি না ।”

বৃন্দাবনে কিছুকাল অবস্থান করিবার পর শীতঋতু অনুচরবর্গসহ বৃন্দাবনেশ্বরকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন । প্রকাশ দেবদর্শন, কিন্তু উদ্দেশ্য প্রজাপীড়ন । সপরিবার মাধবের উপরেও যথেষ্ট অত্যাচার আরম্ভ হইল । তাঁহার সঙ্গে উপযুক্ত বস্ত্রাদি ছিল না ; সুতরাং তাঁহাকে দুর্বল বিবেচনা করিয়া শীত-মহারাজের অনুচরেরা তদুপ্রতি ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করিল ।

একদা প্রভাতে অরুণোদয়ের কিছু পূর্বে মাধবের শৈত্যপ্রযুক্ত নিদ্রা-ভঙ্গ হইল । দেখিলেন, তাঁহার গাত্রবস্ত্র অপহৃত হইয়াছে ; তৎপরিবর্তে

কক্ষস্থ যাবদীয় পরিধেয় বস্ত্র তাঁহার অঙ্গোপরি স্তূপীকৃত রহিয়াছে । হেমাঙ্গিনীর অবস্থাও প্রায় তদ্রূপ,—তিনি শয্যোত্তরচ্ছদ-নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন । মাধব সাতিশয় বিস্মিত হইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন । তখন গৃহের অপর কেহ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে নাই । দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে হেমাঙ্গিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল ; তিনি শয্যাত্যাগ পূর্বক নিঃশব্দে স্বামীর পশ্চাদ্বর্তিনী হইলেন ।

মাধব বাহিরে আসিয়া গাত্রবস্ত্রের বা তস্করের কোনরূপ অনুসন্ধান পাইলেন না । ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ পূর্বক চতুর্দিকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । হেমাঙ্গিনী ইত্যবসরে স্বীয় কক্ষ হইতে নিজ্জান্ত হইয়া জননীর কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন । দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবন্ধ ছিল ; হেমাঙ্গিনী লঘুহস্তে দ্বারে করাঘাত করিলেন । জননী তখন শয্যোপরি উপবিষ্ট থাকিয়া হরিনাম জপ করিতেছিলেন । হেমাঙ্গিনীর করশব্দে জননীর ধ্যান ভঙ্গ হইল । তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন । হেমাঙ্গিনী নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ পূর্বক জননীর শয্যায় মাতঙ্গিনীর পার্শ্বে শয়ন করিলেন । মাতঙ্গিনী কনিষ্ঠাকে বাহুপাশে বদ্ধ করিয়া সম্মেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন, কি হয়েছে রে ?” হেমাঙ্গিনী কোনও উত্তর না করিয়া নিদ্রাভিভূতার স্থায় পড়িয়া রহিলেন । সহসা বাহিরে মাধবের কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল ; তিনি কহিতেছিলেন, “এই যে আমার লেপ্, এ ঘরে কে আনল ?”

হেমাঙ্গিনী তখন আপাদমস্তক বস্ত্রে আবৃত করিয়া ফেলিলেন । মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে রে ?”

হেমাঙ্গিনী । হঁ, আমি বুঝি ?

মাতঙ্গিনী । তুই কি করেছিস্ ?

হেমাঙ্গিনী । হঁ—ভারি ত—হঁ—

মাধব দ্বারাস্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ই্যা দিদি, আমার লেপ মাসীর ঘরে এল কি রূপে ?”

মাতঙ্গিনী । মাসীকে জিজ্ঞাসা কর ।

মাসীর নামোচ্চারিত হইতে না হইতে তিনি তথায় সমুপস্থিত হইলেন । হেমাঙ্গিনী তখন শয্যা পরিত্যাগ পূর্বক খট্টাঙ্গ-নিম্নে লুক্কায়িত হইয়াছে । মাতঙ্গিনী বিস্মিত হইয়া হেমাঙ্গিনীর বস্ত্র ধারণ পূর্বক টানাটানি আরম্ভ করিলেন । মাসীমাতা এ দিকে ঘটনার ইতিবৃত্ত কহিতে লাগিলেন । তিনি কত রাত্রি পর্য্যন্ত হরিনামের মালা জপ করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া রজনী প্রভাত পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ ঠাকুরের কত সংখ্যা জপ করিয়াছেন, তাহা বিবৃত করিলেন । সকল কথা শুনিয়া মাধব বুঝিলেন, তাঁহার মাসীমাতা অসাধারণ ধর্ম্ম-ভাবাপন্ন এবং সমস্ত রাত্রিই তিনি সমাধিস্থ অবস্থায় যাপন করিয়াছেন । অতঃপর ঘটনা সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর অবগত হইলেন যে, অনাথিনী বৃদ্ধা চতুষ্টয়া মাসীমাতার কক্ষে হর্ম্ম্যতলে প্রায় অনাবৃত দেহে শয়ান ছিল । বৃদ্ধারা শীতে কাতর হইয়া মধ্য মধ্য নানাবিধ কষ্ট-ব্যঞ্জক শব্দ করিতেছিল । মাসীমাতা তাহাদের হরিনাম করিতে উপদেশ দিয়া নিজে গাত্রবস্ত্র দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছাদন করতঃ সমাধিগত হইয়াছিলেন । সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার প্রতীতি হইয়াছিল যে, হেমাঙ্গিনী কক্ষে একবার আসিয়াছিল এবং কক্ষের দীপ নিৰ্কাপিত করিয়া দিয়াছিল । দীপ নিৰ্কাপিত হইলে হেমাঙ্গিনী কি করিয়াছিল, না করিয়াছিল, তাহা সমাধিস্থ মাসীমাতা অবগত হইতে পারেন নাই । তবে কক্ষে হেমাঙ্গিনী ব্যতীত অপর কেহ প্রবেশ করে নাই, ইহা তিনি তুলসীর মালা হস্তে লইয়া কহিতে পারেন ।

এবম্বিধ বিবরণ শ্রবণান্তে মাধব ও মাতঙ্গিনীর বিশ্বাস হইল যে,

হেমাস্নিনীই মাধবের গাত্রাবরক অপহরণ-পূর্বক বৃদ্ধাদের প্রদান করিয়াছিলেন। মাতঙ্গিনীর হৃদয় স্নেহ ও করুণায় ভরিয়া গেল; আত্মগানি যে ছিল না, এরূপ বলা যায় না। তিনি হেমাস্নিনীকে পালক-তল হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। হেমাস্নিনীর তখন অদ্ভুত বেশ,— মুখময় ধূলি ও উর্গা, চিবুকের স্থানে স্থানে চূণ, পরিধেয় বসনে কয়েকদিনের সঞ্চিত জঞ্জাল। তাঁহার এইরূপ অপরূপ মূর্তি দর্শনে মাতঙ্গিনীর এমন কি তাঁহার জননীরও হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মাধবের কর্ণেও সে হাস্যধ্বনি পৌঁছছিল। কি একটা ঘটনাছে মনে করিয়া তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তদৃষ্টে মাতঙ্গিনী ও তাঁহার জননী হাসিতে হাসিতে দ্রুতপদে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

এদিকে হেমাস্নিনী তাঁহাদের হাসির কারণ কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। তিনি যখন দেখিলেন, তাঁহার অতি নির্লজ্জ স্বামী তাঁহার স্বশ্রুর উপস্থিতি সত্ত্বেও কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি ক্ষিপ্ততার সহিত গৃহকোণে লুক্কায়িত হইলেন। মাধব গৃহমধ্যে এক বিন্দুও হাস্যরস দেখিতে পাইলেন না। ডাকিলেন, “হেমাস্নিনি !”

হেমাস্নিনী চমকিয়া উঠিলেন। মাধব যদি রঙ্গিনী বলিয়া ডাকিতেন, হেমাস্নিনী তাহা হইলে সহজে গৃহকোণ পরিত্যাগ করিতেন না, কিন্তু মাধবের ডাকের ভঙ্গীতে তিনি একটু চমৎকৃত, একটু বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া অনাবৃত বদনে মাধবের দিকে ফিরিলেন। মাধব দেখিলেন, তাঁহার মুখময় আবর্জনা। তিনি নিজ বসন দ্বারা মুখখানি সযতনে মুছাইয়া দিয়া স্নেহে পুনরায় ডাকিলেন, “হেমাস্নিনি !”

হেমাস্নিনী চক্রবৎ প্রফুল্ল মুখখানি মাধবের প্রতি তুলিয়া চাহিয়া রহিলেন। মাধব কহিলেন, “হেমাস্নিনি, তুমি এতদিন আবর্জনার আচ্ছন্ন ছিলে, অথবা আমারই দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল—আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই।”

হেমাঙ্গিনী কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার কৃতকর্মের জন্য তিনি তিরস্কৃত হইতেছেন ; মস্তক অবনত করিয়া কহিলেন, “হুঁ, তা’ আমি কি করব—”

“তুমি বেশ করেছ রঙ্গিণি !”

হেমাঙ্গিনী নীলোৎপলতুলা চক্ষু দুইটী তুলিয়া সবিস্ময়ে মাধবের প্রতি চাহিলেন। মাধব মৃদু-হাস্যে তাঁহাকে বক্ষের উপর টানিয়া লইয়া সেই নীলনয়নদ্বয়ের উপর দুইটী চুম্বন দান করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।



শীতঋতু সকলকে পীড়ন করিয়া যথাকালে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। প্রস্থানের বাসনা ছিল না, কিন্তু বসন্ত আসিয়া বড়ই ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিল ; তথাপি শীত-মহারাজ অন্ধকার রাত্রির আবরণে লুকাইয়া ঝোপে-ঝোপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। বসন্ত তখন তাঁহার দূত কোকিল ও দূতী মাধবীলতাকে প্রেরণ করিয়া শীত-মহারাজকে বিভাড়িত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাদের সামর্থ্য যখন কুলাইল না, তখন সেনাপতি মলয়-মারুৎ স্বয়ং আসিয়া রণে যোগদান করিলেন ; এবং অচিরে নগদেহ কৃশকায় শীতকে গলা টিপিয়া দেশ হইতে দূরীভূত করিলেন। শীত যাইতে যাইতে ফিরিয়া দেখিতে লাগিল এবং পুনরায় সদলে আসিবে বলিয়া শাসাইয়া গেল।

শীতকে তাড়াইয়া বসন্ত হাস্যমুখে সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং অনুচরবর্গকে চতুর্দিকে প্রেরণ করত প্রকৃতিপুঞ্জের সংবাদ গ্রহণ

করিতে লাগিলেন । অনুচরেরা চতুর্দিক পরিভ্রমণ করত সংবাদ দিল, প্রস্থিত শত্রুর প্রতাপে প্রজাপুঞ্জ নীরস ও বিগুফ, বৃক্ষরাজি পত্রপুষ্পশূণ্য, পক্ষিকুল সমাহত নির্জিত । ঋতুরাজ তচ্ছবণে ব্যথিত হইয়া প্রকৃতি-পুঞ্জের দুঃখ নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইলেন । যাহার মুখে হাসি নাই, তাহার ওষ্ঠে হাসি আনিয়া দিলেন ; যে বিরহিনী বহুকাল হইতে প্রবাসী স্বামীর পত্র পান নাই, তাঁহাকে পত্র আনিয়া দিলেন ; যে অভিমানিনী অলঙ্কার অভাবে স্বামীর সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার মান ভঙ্গ করত অলঙ্কার ও হাসি উভয়ই আনিয়া দিলেন ; যে তরু-পল্লব বিগুফ ও পত্রশূণ্য, তাহাকে মুঞ্জরিত করিলেন ; যে বৃক্ষক পুষ্পশূণ্য, তাহাকে কুসুমিত করিলেন ; চূত মুকুলকে আহ্বান করিয়া গ্রামে গ্রামে সৌগন্ধ্য বিতরণ করিতে আদেশ করিলেন ; ভৃঙ্গরাজকে ডাকিয়া আনিয়া দলবলসহ পুষ্পোদ্যান অধিকার করিতে উপদেশ দিলেন ; পিককুলকে আহ্বান করিয়া সঙ্গীত-ঝঙ্কারে আকাশ-প্রান্তর মুখরিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন । প্রিয়সখা কন্দর্পদেবকে আমন্ত্রণ করিয়া গৃহে গৃহে কুসুমশর প্রক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিলেন । এইরূপে বসন্তরাজ দেশে দেশে আনন্দ, আশা, জীবন বিতরণ করিতে লাগিলেন ।

কিন্তু বৃন্দাবনের যে গৃহে মাধব সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় ঋতুরাজ বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না । তরুদেহ পল্লবিত ও কুসুমিত করিলেন বটে, কিন্তু মাতঙ্গিনীর ওষ্ঠে হাসি ফুটাইতে পারিলেন না । যত দিন যাইতে লাগিল, ততই মাতঙ্গিনীর হাসি লুকাইয়া আসিতে লাগিল । উদ্যানময় ফুল ফুটিয়া চতুর্দিক যতই সৌরভে আমোদিত করিতে লাগিল, পিককুজনে আকাশ-প্রান্তর যতই মুখরিত হইতে লাগিল, মাতঙ্গিনীর হৃদয় ততই অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল । দুর্কিসহ চিন্তারাশি লইয়া তিনি বিষাদময়ী প্রতিমার গায় অরণ্যে উদ্যানে

নদীতটে পরিভ্রমণ করিতেন ; কিন্তু কোথাও শান্তি পাইতেন না ।
 আত্মহত্যার চিন্তা সময় সময় তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইত ; কিন্তু সে
 চিন্তা অধিককাল মনের ভিতর স্থান পাইত না । অরণ্য দেহ সঞ্চালনে
 তাঁহাকে ডাকিয়া কহিত, ‘এস, সংসার ছাড়িয়া আমার পুণ্যময় রাজ্যে
 আশ্রয় গ্রহণ করিবে এস’ ; নদী তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠাইয়া আকর্ষণ-
 নিমজ্জিতা মাতঙ্গিনীর কাণে-কাণে কহিত, ‘আর একটু সরিয়া এস,
 আমি তোমার স্মৃতি মুছাইয়া দেব—তোমার সকল জালা নিবাইয়া দেব ।’
 মাথার উপর পাখী চীৎকার করিয়া কহিত—‘না, না, ফিরে এস—
 স্মৃতি ধুয়ে গেলে কি নিয়ে থাকবে ?’ মলয়ানিল কাণে-কাণে বলিত,
 ‘এমন সুন্দর পৃথিবী ছাড়িয়া কোথায় যাইবে ?’ বিচঞ্চল কদম্ব-শাখা
 হেলিয়া ছলিয়া নিষেধ করিয়া বলিত, ‘মরিও না—মাধবের ঘৃণা লইয়া
 মরিও না ।’

মাতঙ্গিনী মরিতে পারিলেন না—বারংবার চেষ্টা করিয়াও মরিতে
 পারিলেন না । তখন মাতঙ্গিনী সঙ্কল্প আঁটিলেন, তাঁহার জননীকে
 লইয়া দেশে ফিরিবেন—রাধাগঞ্জ আর কখন আসিবেন না । রাজ-
 মোহনের অপেক্ষায় গৃহে অবস্থান করিবেন ; রাজমোহন অথবা মৃত্যু
 যিনিই অগ্রে আগমন করুন, মাতঙ্গিনী তাঁহার অপেক্ষায় রাধাগঞ্জ হইতে
 বহুদূরে অবস্থিত নির্জন গৃহে অবস্থান করিবেন ।

জননীর নিকট মাতঙ্গিনী তাঁহার সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিলেন ।
 জননী প্রতিবাদ করিবার যুক্তি খুঁজিয়া না পাইয়া অবশেষে সন্মত
 হইলেন ; এবং তল্লি তল্লা বাঁধিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন ।
 হেমাতঙ্গিনী কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ বাধাইবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু মাধবকে
 নীরব ও নির্বিকার থাকিতে দেখিয়া বড় একটা সুবিধা করিয়া উঠিতে
 পারিল না ; শ্রান্ত মেঘের ঞ্চায় কাঁদিয়া কাটিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল ।

মাধব ইচ্ছা করিয়াছিলেন তিনিও বৃন্দাবন পরিত্যাগ পূর্বক স্বদেশাভিমুখে গমন করিবেন ; কিন্তু তাঁহার খুল্লতাত-পত্নী প্রতিবাদিনী হইলেন । তিনি গোষ্ঠের পূর্বে বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না । মাসীমাতারও অভিপ্রায় তদনুরূপ । অগত্যা মাধবকে বৃন্দাবনে আরও কিছুদিন অবস্থান করিতে হইল ।

মাতঙ্গিনীর সঙ্গে সনাতন ও একজন দাসী যাইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল । মাধবের অনুগ্রহে অর্থাভাব ঘটিবার কোনরূপ সম্ভাবনা ছিল না । মাধব তাঁহার শ্বশুর নিকট কহিয়াছিলেন, রাধাগঞ্জে রাজমোহনের অনেক জমিজমা আছে ; তাহার উপসত্ত্ব তিনি মাসে মাসে মাতঙ্গিনীর নিকট প্রেরণ করিবেন । স্মতরাং দারিদ্র্য-রাঙ্কসী আসিয়া কোন কালে যে মাতঙ্গিনীর পিতৃগৃহে উৎপাত করিতে সমর্থ হইবে, এরূপ সম্ভাবনা রহিল না ।

বৃন্দাবন পরিত্যাগের দিন যতই নিকটবর্তী হইয়া আসিতে লাগিল, ততই একটা বিষাদ গাঢ়তর হইয়া গৃহখানিকে পরিবেষ্টন করিল । মাধব সেই বিষাদরাশিকে উদ্ভিন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার সকল যত্ন তমোময় শীতল গৃহমধ্যে দীপ জালিবার প্রয়াসের ত্রায় বিফল হইল । মাধব অন্তরে বুঝিয়াছিলেন, মাতঙ্গিনী রাধাগঞ্জে আর ফিরিবেন না—ফিরিবার উদ্দেশ্য থাকিলে তিনি মাধবের সংসর্গ অগ্নিবৎ জ্ঞান করিয়া পরিবর্জন করিতেন না । যে ফাগুসের আবরণ মধ্যে অনল এতদিন জলিতেছিল, সে ফাগুস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অনল আরও গর্জিয়া উঠিয়াছে ; মাতঙ্গিনী তাই সতয়ে পলায়ন করিতেছেন ।

যে দিবস রাত্রিশেষে মাতঙ্গিনী ব্রজধাম পরিত্যাগ পূর্বক স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেই দিবস সন্ধ্যার অনতিপূর্বে মাতঙ্গিনী যমুনাতটে বাঁধাঘাটের উপর উপবিষ্টা রহিয়াছেন । সূর্য্যদেব ;

কিঞ্চিৎ পূর্বে অন্তর্মিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কররেখা তখনও আকাশপটে মেঘমালার অঙ্গে চিত্রিত রহিয়াছে । কদম্ব, বট প্রভৃতি গগনস্পর্শী বৃক্ষরাজি মস্তক তুলিয়া দিনমণির চরণ-সিন্দুর ললাটে ধারণ করিতেছে ।* যমুনা উজান বহিবে কিনা ভাবিতেছিল, কিন্তু সে বংশীধ্বনি শুনিতে না পাইয়া বিষাদভরে ফিরিয়া চলিল; যাইতে যাইতেও বারংবার ফিরিয়া দেখিতে লাগিল তাহার অঙ্গ কালো হইয়াছে কিনা; দেখিল, যখন কালো রূপের পরিবর্তে লালরূপ তাহার হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত... হইয়াছে, তখন মৃহকণ্ঠে কাঁদিতে কাঁদিতে বহিয়া চলিল ।

মাতঙ্গিনী বর্ণময় চক্রবাল পানে চাহিয়া নিম্পন্দদেহে উপবিষ্টা ছিলেন । ক্রমে বর্ণ মুছিয়া গেল, মেঘের কৃষ্ণ কঙ্কালমাত্র পড়িয়া রহিল । মাতঙ্গিনী তখন নয়ন ফিরাইয়া অদূরবর্তী কদম্ববৃক্ষ প্রতি চাহিলেন; ক্রমে তাহাও নিবিয়া গেল । মাতঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আকাশপানে নেত্রপাত করিলেন; আকাশে কিছুই নাই—সব অন্ধকার । দুই একটা নক্ষত্র উঠিতেছিল; কিন্তু জগতোদ্ভাসক আলোকের পর ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ মাতঙ্গিনীর নয়নমনাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না । তখন তিনি নিরবলম্ব হইয়া পদতলবাহিনী স্রোতঃস্বতীর প্রতি নেত্রপাত করিলেন । স্রোতঃস্বতীও তখন অদৃশ্য—শুধু একটা কুলুকুলু ধ্বনি—চিরজাগ্রত বাসনার বাক্যর শ্রুত হইতেছিল । মাতঙ্গিনী অঁধি মুদিয়া তাহাই শুনিতে লাগিলেন ।

সহসা পিছনে কে কহিল, “দিদি, তুমি এখানে !”

মাতঙ্গিনী চমকিয়া উঠিলেন; কণ্ঠস্বরে চিনিলেন, বক্তা মাধব । তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না, কোন উত্তরও করিলেন না । মাধব নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন—একবার অন্ধকারময় স্তব্ধ আকাশ পৃথিবী পানে চাহিলেন; পরে কহিলেন, “দিদি, কবে আবার রাধাগঞ্জে আসিবে ?”

মাতঙ্গিনী উত্তর করিলেন, “সেখানে আর না ।”

মাধব । কেন দিদি ?

মাতঙ্গিনী । আসবার প্রয়োজন ত আর নেই ।

মাধব । কেন, আমরা কি কেহ নই ?

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিলেন ।

মাধব কহিলেন, “যেখানে থাকিয়া সুখী হও, সেইখানে থাকিও ।

আমার—আমার দুঃখ থাকিল, তোমাকে আমি সুখী করিতে পারিলাম না ।”

মাতঙ্গিনী কম্পিতচরণে উঠিয়া দাঁড়াইলেন । মাধব তাঁহার হাত ধরিয়া সোপানোপরি বসাইলেন ; নিজেও নিকটে বসিলেন । মাধবের করস্পর্শে মাতঙ্গিনীর দেহ কাঁপিয়া উঠিল ; মাধবও কম্পমান্ । এক বৃন্তস্থিত দুইটা ফুলের একটা কাঁপিলে অপরটাও কাঁপিয়া উঠে । উভয়ে নীরবে উপবিষ্ট রহিলেন ।

সহসা মাধব ডাকিলেন, “মাতঙ্গিনী—”

মাতঙ্গিনীর বক্ষস্পন্দন শুরু হইল ।

এমন সময় অদূরে হেমাঙ্গীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল ; তিনি ডাকিতে-
ছিলেন, “দিদি, তুমি কোথা ?”

উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন । মাতঙ্গিনী সহসা কোনও উত্তর করিয়া উঠিতে পারিলেন না । মাধব ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া কহিলেন, “দিদি এইখানে ।”

হেমাঙ্গিনী দাঁড়াইলেন । অন্ধকার ভেদ করিয়া সম্মুখে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন ; মাধবের গুল্লবস্ত্র, অনাবৃত বক্ষের বর্ণজ্যোতিঃ তাঁহার নয়নে পড়িল । মাধবের পশ্চাতে—অন্ধকারময় কক্ষমধ্যে চন্দ্র কররেখার
গায় মাতঙ্গিনীর সমুজ্জ্বল মূর্তিও দৃষ্ট হইল । হেমাঙ্গিনী কিংকর্তব্য-

বিমূঢ়া হইয়া ক্ষণকাল স্থিরা সৌদামিনীবৎ দণ্ডায়মানা রহিলেন । মাধব কহিলেন, “যাও, দিদির কাছে যাও ।”

মাধব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । হেমাঙ্গিনী ক্ষিপ্ৰচরণে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া মাতঙ্গিনীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন । এবং জ্যোষ্ঠাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন । মাতঙ্গিনী চমৎকৃত হইয়া কনীষসীকে বক্ষের উপর টানিয়া লইলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হয়েছে রে ?”

অগ্নানকুসুম হেমাঙ্গিনী উত্তরস্বরূপ জ্যোষ্ঠাকে চুম্বন করিলেন ; বলিলেন, “দিদি, এখানে তবে থাকবে ?”

মাতঙ্গিনী অন্ধকারমধ্যে ক্রকুঞ্চিত করিলেন এবং বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া কহিলেন, “না ।”

“কেন দিদি ?—বৃন্দাবনেশ্বরের সকলেই ত পূজা করে ।”

“তুই কি বলছিস্ ?”

“বাল্যকাল হইতে আমরা পিতার স্নেহ, মাতার আদর ভাগাভাগি করিয়া লইয়া আসিয়াছি । এখন—এখন কেন আমরা তা’ পারিব না ?”

সহসা পশ্চাতে অদূরে এক বিকট হাস্যরব সমুথিত হইল । উভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন । হাস্য তত উচ্চ নয়, কিন্তু অতি উৎকট । যে হাসিয়াছিল, সে ভগ্নীদ্বয়ের সমীপবর্তী হইল । উভয়ে অস্পষ্ট নক্ষত্রালোকে দেখিলেন, আগন্তুক সন্ন্যাসীবেশধারী ; তাহার হস্তে করঙ্ক, মস্তকে জটাভার । আগন্তুক কহিল, “ঠিক বলেছ হেমাঙ্গিনী, এখন কেন আমরা ভাগাভাগি করতে পারি না ।”

কথা কয়টা শেষ করিয়াই আগন্তুক আবার হাসিল । হাসি অতি বিকট । মাতঙ্গিনীর মনে হইল, যেন এক তাণ্ডব হাসিতে আকাশ পৃথিবী ভরিয়া গেল ।—নদী হাসিল, মলয়ানিল হাসিল, বৃক্ষপত্র হাসিল—

তাহার চতুর্দিকে যেন একটা বিকট হাসি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ।
মাতঙ্গিনী কাঁপিয়া উঠিলেন ।

কণ্ঠস্বরে উভয়ে চিনিলেন, আগন্তুক রাজমোহন । হেমাঙ্গিনী ধীরে
ধীরে পশ্চাদপসরণ পূর্বক পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ।
মাতঙ্গিনী নীরবে নিষ্পন্দদেহে উপবিষ্ট রহিলেন । রাজমোহন কহিল,
“তোমাকে দেখিতে অনেক দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছি, মাতঙ্গিনি !
ইংরাজের কারাগার আমার ধরিয়া রাখিতে পারিল না—অনন্ত সমুদ্র
আমাকে বাধা দিতে সমর্থ হইল না । রাধাগঞ্জ আসিয়া শুনলাম, তুমি
এখানে আসিয়াছ ; আমি ছদ্মবেশে পদব্রজে তোমার অনুসরণ করিয়া
এখানে আসিয়াছি ; মাতঙ্গিনি, তুমি আমার বড় প্রিয় ।”

মাতঙ্গিনী নিরুত্তর রহিলেন । রাজমোহন পুনরপি কহিলেন,
“এতকাল পরে ফিরিয়া আসিলাম, তোমার কি একটা কথা বলিবারও
নাই মাতঙ্গিনি ?”

মাতঙ্গিনী ফিরিয়া দেখিলেন, হেমাঙ্গিনী তাহার পার্শ্বে নাই ; বুকের
ভিতর কেমন একটা ভয়ের সঞ্চার হইল । কহিলেন, “আসিয়াছ ভালই
হইয়াছে, আমাকে লইয়া দেশে চল ।”

রাজমোহন আবার বিকটকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল । মাতঙ্গিনী কাঁপিয়া
উঠিলেন ; এবম্বিধ হাসি তিনি মানুষের কণ্ঠে কখন শুনে নাই । তিনি
ব্রহ্মভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ।

রাজমোহন কহিল, “এস তবে মাতঙ্গিনি, দেশে চল ।”

বাক্য সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজমোহন করক ও কৃত্রিম কেশভার
নদীজলে নিক্ষেপ করিল ; এবং দুই পদ অগ্রসর হইয়া মাতঙ্গিনীর হস্ত-
ধারণ করিল । মাতঙ্গিনীর কণ্ঠ হইতে ভীতিব্যাঞ্জক অক্ষুটধ্বনি নির্গত
হইল । রাজমোহন তদপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া শিরোচ্ছাদক উত্তরীয় বসন

দ্বারা মাতঙ্গিনীর দেহের সহিত নিজের দেহ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল । কার্য্য শেষ করিয়া কহিল, “ভয় কি মাতঙ্গিনী ? চল একত্রে দেশে যাই ।”

মাতঙ্গিনী কহিলেন, “মরিতে অনিচ্ছা নাই ; কিন্তু একটা কথা শুন—”

রাজমোহন বাধা দিয়া কহিল, “শুনিবার এক্ষণে অবসর নাই মাতঙ্গিনী !—আমাকে ধরিতে দুই শত সিপাহী চতুর্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে । এ দিকে হেমাঙ্গিনীর ইঞ্জিতানুসারে মাধব ও সনাতন ছুটিয়া আসিতেছে—ওই শুন পদশব্দ—”

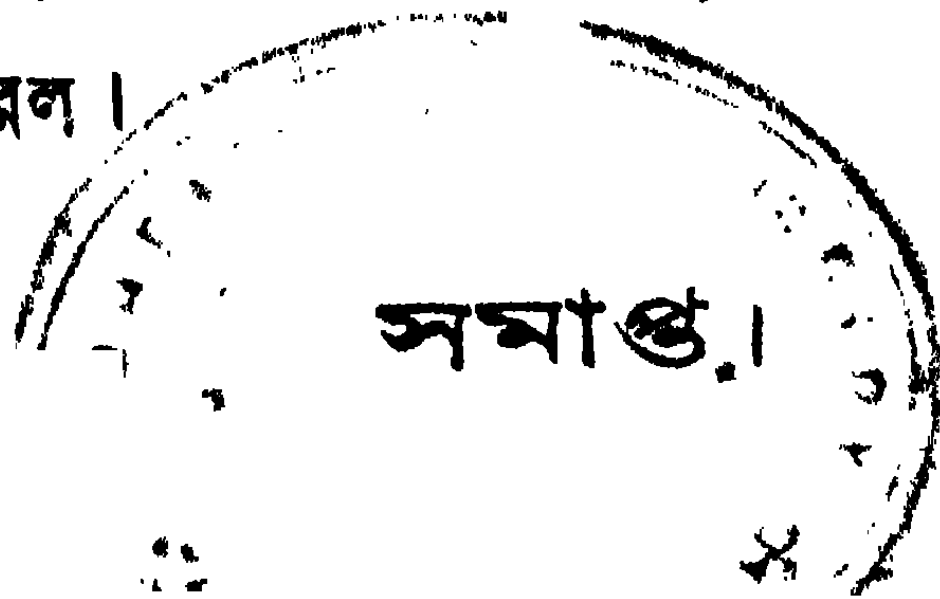
বলিতে বলিতে রাজমোহন, মাতঙ্গিনীকে লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল । আবক্ষ জলে আসিয়া কহিল, “একত্রে মরিলে আবার পরজন্মে একত্র হইতে পারিব । তোমাকে মাতঙ্গিনী, আমি ইহলোকে, পরলোকে কোন লোকেই ত্যাগ করিতে পারিব না ।”

বীচিমালা যখন মাতঙ্গিনীর চিবুক স্পর্শ করিল, তখন রাজমোহন কহিল, “ইহলোক ত গেছেই, এক্ষণে পরলোকই আমার সম্বল । বল মাতঙ্গিনী, তুমি পরজন্মে আমার হইবে ।”

মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া উঠিলেন । রাজমোহন পুনরপি কহিল, “এই পবিত্র জলে দাঁড়াইয়া বল মাতঙ্গিনী, তুমি পরজন্মে আমার হইবে ।”

মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া কহিলেন, “না, না—ওগো আমার ছেড়ে দেও ।”

‘এই যে দিচ্ছি’ বলিয়া রাজমোহন, মাতঙ্গিনী-সহ গভীর জলমধ্যে দেহ নিমজ্জিত করিল ।



গ্রন্থকার প্রণীত বা প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক

বীরপূজা	উপন্যাস	মূল্য দেড় টাকা	৩য় সং	যন্ত্রস্থ
বঙ্গ-সংসার	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
বাস্তালীর বল	ঐ ঐতিহাসিক	ঐ	ঐ	ঐ
রাজা গণেশ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
নীরদা	ঐ	মূল্য আট আনা	ঐ	ঐ
রাণী-ব্রজসুন্দরী	ঐ—ঐতিহাসিক—	মূল্য দুই টাকা		
বঙ্কিম-জীবনী	(বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত)	মূল্য তিন টাকা		

৩য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

মহিলা সাধারণ পুস্তকালয়

নির্ধারিত দিনের পরিচয় পত্র

বর্গ সংখ্যা

পরিগ্রহণ সংখ্যা

এই পুস্তকখানি নিয়ে নির্ধারিত দিনে অথবা তাহার পূর্বে
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা মাসিক ১ টাকা হিসাবে
জরিমানা দিতে হইবে

নির্ধারিত দিন	নির্ধারিত দিন	নির্ধারিত দিন	নির্ধারিত দিন
১৫/৫/৫৫			

এই পুস্তকখানি ব্যক্তি গতভাবে
প্রতিনিধির মারফৎ নির্ধারিত দিনে
অথবা অন্য পাঠ্যক্রম কার্যক্রমে

